পঞ্চদশ খণ্ড।

সচিত্র মাসিক পত্র।

বালকবালিকাদিগের উপযোগী।

কলিকাতা,
১৬নং রঘুনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট "মুকুল আফিস"
হইতে প্রকাশিত।
১৩১৬।

মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

পঞ্চদশ খণ্ড।

সচিত্র মাসিক পত্র।

বালকবালিকাদিগের উপযোগী।

কলিকাতা,
১৬নং রঘুনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট "মুকুল আফিস"
হইতে প্রকাশিত।
১৩১৬।
মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

মুকুল

চার্লস্‌ ডারউইন

ART PRESS

মুকুল

১৫শ ভাগ। | বৈশাখ, ১৩১৬। | ১ম সংখ্যা।

চার্লস ডারউইন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ যে সকল মহৎ লোকদের জন্মের শত বার্ষিকী বলিয়া স্মরণীয়, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এবারে আর একজনের কথা বলিতেছি। তাঁহার নাম উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে চির দিন জড়িত থাকিবে। জগতে যে সকল মনস্বী ব্যক্তি মানবের চিন্তাস্রোত বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন। ইঁহার নাম চার্লস রবার্ট ডারউইন। তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল বিজ্ঞান নহে, মানব চিন্তার সকল বিভাগে মহা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তোমরা এখন সে তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। যখন বড় হইবে, তখন নিশ্চয়ই তাহা জানিবে। এখন এই টুকু বলি, যে তাহাকে ক্রমবিকাশবাদ বলা হয়। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, যে পৃথিবীতে যত জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি আছে, সকল ভিন্ন জাতীয়; তাহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সৃষ্ট হইয়াছে। ডারউইন বহু পরীক্ষায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব কি বৃক্ষ মূলে এক জাতীয়ই ছিল; ক্রমে নানা কারণে তাহাদের মধ্যে অল্প অল্প প্রভেদ হইয়াছিল; তাহার পর সেই প্রভেদ বংশ পরম্পরায় বাড়িয়া গিয়া শেষে তাহাদের মধ্যে এমন পার্থক্য হইয়াছে, যে তাহাদিগের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয় না। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ, এখন তাহাদের মধ্যে কত পার্থক্য। এক জাতির লোক অপর জাতিকে আপনা হইতে পৃথক মনে করে, কিন্তু ডারউইন সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, যে এই সকল পার্থক্য ক্রমে ক্রমে সংঘটিত হইয়াছে, মূলে তাহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। কেবল তাহাই নয়, তিনি দেখাইয়াছেন, যে মানুষ এবং বানর এক জাতীয় জীব। এই প্রকারে বাঘ এবং বিড়াল, এক প্রকারের জীব, ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে তাহারা ভিন্ন জাতীয় হইয়াছে। যখন ডারউইন প্রথম এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন লোকে তাহা বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু এখন সকল চিন্তাশীল লোকেই ডারউইনের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। কেবল জীব সৃষ্টি নহে, মানবের চিন্তার বিকাশে, মানব সমাজের উন্নতিতে সর্ব্বত্র

'ক্রমবিকাশের' নিয়ম কার্য্য করিতেছে, বলিয়া স্থির হইয়াছে। তোমরা জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারিবে। এখন তোমাদিগকে আবিষ্কর্ত্তার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি।

১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ডের অন্তপাতী স্রুজবেরী নগরে চার্লস ডারউইনের জন্ম হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এব্রাহাম লিঙ্কন ও চার্লস ডারউইন একদিনেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মানব জাতিকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ডারউইনের পিতা এক জন বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন এবং তাঁহার পিতামহ ইরাস্মাস্ ডারউইন এক জন চিন্তাশীল সুকবি ছিলেন। তাঁহার পৌত্র বহু গবেষণায় যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি কবিকল্পনায় প্রায় তাহা ধরিতে পারিয়াছিলেন। ডারউইনের পিতা এবং পিতামহ উভয়েই প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। ডারউইনদের বংশটাই প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিল; তাঁহাদের বংশ হইতে অনেক বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন। চার্লস্ বাল্যকালে লেখাপড়ায় তত ভাল ছিল না। সেইজন্য তাঁহার পিতা বলিতেন, যে সে বংশের কলঙ্ক হইবে। আমরা অনেক সময়ে এই প্রকার বিচারই করিয়া থাকি। আমরা যাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া উপেক্ষা করি, তাহাদের মধ্যে হয়ত এমন সকল শক্তি লুক্কায়িত আছে, যাহা উপযুক্ত উৎসাহ এবং সুবিধা পাইলে বিকশিত হইয়া কত কল্যাণ সাধন করিতে পারে। ডারউইন লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন না। প্রচলিত প্রথা অনুসারে আট বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহাকে একটী স্কুলে পাঠান হইল, আর একটু বড় হইলে তাঁহাকে আর একটী স্কুলে পাঠান হইল; কিন্তু উভয় স্থানেই পাঠে তাঁহার বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। স্কুলে লাটিন গ্রীকই বেশী শিক্ষা দেওয়া হইত; কিন্তু চার্লসের তাহা ভাল লাগিত না; তাঁহার ছোট বোন তাঁহার চেয়ে বেশী শিখিয়া ফেলিল; শিক্ষকেরা এবং আত্মীয় স্বজনেরা এই জন্য তাঁহাকে উপেক্ষা এবং নিন্দা করিতেন। তাঁহার পিতাও পুত্রের জন্য চিন্তিতই হইয়া পড়িলেন। লাটিন গ্রীকে বেশী উন্নতি-না হইলেও চার্লসের বাল্যকাল বৃথা যায় নাই। তখন হইতেই ভগবান অলক্ষ্যে তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। বালক চার্লস শামুক, ঝিনুক, পোকা, প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে ভাল বাসিতেন। চার্লস যত বড় হইতে লাগিলেন, তাঁহার এই প্রবৃত্তি তত বাড়িতে লাগিল। তিনি মাঠে মাঠে বনে বনে বেড়াইয়া গাছ পালা, জীবজন্তু পরিদর্শন করিতেন; নূতন কোনও প্রকার গাছ, কি পোকা দেখিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তিনি প্রকৃতিকে বড় ভাল বাসিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাকী নির্জ্জন বনে বেড়াইতেন। জীবজন্তুর প্রতিও তাঁহার আশ্চর্য্য ভালবাসা ছিল। কোনও জন্তুকে কষ্ট দিতেন না। অপরে যদি জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার তিনি একটী সার্কাস দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে একটী কুকুরকে এক প্রকার কসরত দেখাইবার কথা ছিল। কুকুর তাহা করিতে না পারিয়া অতিশয় কাতর দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে তাকাইতে লাগিল। ডারউইন আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সঙ্গীর হাত ধরিয়া ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন। এই কস্‌রত শিখাইবার সময় কুকুরটীকে নিশ্চয় ভয়ানক যাতনা দেওয়া হইত। না পারিলে বোধ হয় ভয়ঙ্কর প্রহার করা হইত; তাই সে না পারিয়া প্রহারের ভয়ে কাতরতা প্রকাশ করিতেছিল। ডারউইন তাহা স্মরণ করিয়া সেখানে থাকিতে পারিলেন না, সেই হইতে আর তিনি সার্কাসে যাইতেন না।

স্কুলের পড়ায় বেশী উন্নতি হইল না বটে, কিন্তু চার্লস প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ রাজ্যের বিষয়ে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিয়া ডাক্তারী শিক্ষার জন্য তাঁহাকে এডিনবরা পাঠাইলেন। কিন্তু সেখানেও চার্লস সুবিধা করিতে পারিলেন না। এডিনবরার এক রসায়ন ভিন্ন আর কোনও বিষয়ে তিনি বিশেষ সাহায্য পান নাই। প্রাণিবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত; কিন্তু

ডারউইনের নিকট তাহা নীরস লাগিত। বিশেষতঃ তাঁহার কোমল-হৃদয় অস্ত্রচিকিৎসায় রোগীদের যন্ত্রণা দেখিতে পারিত না। সে সময়ে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। কঠিন এবং দীর্ঘকালব্যাপী অস্ত্র চালনায় রোগীদের বিষম যন্ত্রণা হইত। একবার একটী শিশুর শরীরে অস্ত্রচালনার সময়ে ডারউইন সহ্য করিতে না পারিয়া হাঁসপাতাল হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন। ডাক্তারী শিক্ষা বিষয়ে বেশী অগ্রসর হইতে পারিলেন না বটে; কিন্তু এখানেও তাঁহার প্রিয় প্রকৃতি চর্চ্চায় তিনি অনেক সাহায্য পাইলেন। সে সময় এডিনবরাতে অনেক যুবক ছিলেন, যাঁহারা ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি আলোচনা করিতেন, এবং ভবিষ্যতে এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রকৃতি রাজ্য বিষয়ে জ্ঞান পিপাসা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এডিনবরায় আসার ছয় মাস পরে পিনিয়ান সোসাইটী নামক একটী বৈজ্ঞানিক সভায় ডারউইন একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই জাতীয় অন্যান্য সভারও তিনি সভ্য হইয়াছিলেন, এবং এই সকল অধিবেশনে তিনি অনেক নূতন তথ্যের আলোচনা করিতেন। তাঁহার বন্ধু এবং পরিচিত গণের মধ্যে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বিখ্যাত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রশংসায় ডারউইন বিশেষ উৎসাহিত হইতেন।

এদিকে চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ উন্নতি না দেখিয়া তাঁহার পিতা পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। ডাক্তারী ব্যবসায়ে চার্লসের অনুরাগ নাই দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের পদের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। চার্লস সম্মত হইলেন, তাঁহাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হইল। তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। কেম্ব্রিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠে ডারউইনের কোনও পারদর্শিতা দেখা গেল না; অপর দিকে সেখানকার বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। অধিকাংশ সময়ে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে কাটাইতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে সম্মান করিতেন। সেই সময়ে কেম্ব্রিজে হেনস্লো নামক এক জন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের সকল বিভাগে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে ডারউইনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা করিয়া তাঁহারা একত্র বেড়াইতেন এবং সেই সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিতেন, এই সকল বৈজ্ঞানিকদের সংসর্গে আসিয়া তাঁহার বিজ্ঞান চর্চ্চার স্পৃহা আরও বলবতী হইল। এই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জীবজন্তুর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এক সুযোগও পাইলেন। এজগতে দেখা যায়, ভগবান মানুষের কোনও ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। ১৮৩১ সালে ডারউইন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। কিন্তু ডারউইনের বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য আকাঙ্ক্ষা। কেম্ব্রিজ পরীক্ষার পরে তিনি তাঁহাদের এক জন অধ্যাপকের সঙ্গে ওয়েলস্ দেশের ভূতত্ত্ব বুঝিবার জন্য সেখানে যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখেন, যে তাঁহার জন্য এক খানি পত্র রহিয়াছে। তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক হেন্স্লো তাহা লিখিয়াছেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চিলি, পেরু প্রভৃতি দেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এক খানি জাহাজ পাঠাইতেছিলেন। সেই কার্য্যে সাহায্যের জন্য তাঁহারা একজন উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক চাহিতেছিলেন। অধ্যাপক হেন্স্লো ডারউইনের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং তিনি যাইতে সম্মত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহাকে তিন চারি বৎসর বিদেশে জাহাজে থাকিতে হইবে, ডারউইন এই প্রকার কার্য্য চাহেন। সকল দেশের উদ্ভিদ, ভূস্তর, প্রাণীরাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা ডারউইনের নিকট অতিশয় লোভনীয় ব্যাপার। কিন্তু তাঁহার পিতা আপত্তি করিলেন। সুতরাং ডারউইন অনিচ্ছার সহিত অধ্যাপক হেন্স্লোর

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্র লিখিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মাতুলের পরামর্শে পর দিন তাঁহার পিতা সম্মতি দিলেন। ডারউইন তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে গিয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। এই ঘটনা হইতেই ডারউইনের ভবিষ্যৎ কার্য্য স্থির হইল। ইহার পরে চারি বৎসর তিনি জাহাজে নানা দেশের উপকূল ভ্রমণ করিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের নানা তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই কাজেই তিনি 'ক্রম বিকাশের সত্যে উপনীত হন। ১৮৩৬ সালের শেষ ভাগে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। দীর্ঘকাল সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। ইহার পরে যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই তাঁহাকে শরীরের জন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ডারউইন কোন দিন সেজন্য অভিযোগ করিতেন না। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন অল্প পরিশ্রম করিয়া অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ফিরিয়া গত চারি বৎসরে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রকাশ করা তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল। দুই বৎসর পরিশ্রম করিয়া ডারউইন তাঁহার দৈনন্দিন লিপি প্রকাশ করিলেন, এই পুস্তক প্রকাশ হওয়া মাত্র তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে তিনি ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন সত্য প্রকাশিত করিয়া বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ডারউইন যদি আর কিছু না করিতেন, কেবল এই পুস্তকের জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। দেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান সভা সমিতি হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। তিনি সেই সকল সভাতে অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। লণ্ডনে অনেক লোক আসিয়া তাঁহার সময় নষ্ট করে, বাধ্য হইয়া সভা সমিতিতে যাইতে হয়, কাজ করিবার অবসর পান না বলিয়া ডারউইন ১৮৪২ সালে ডাউন নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি আপনার গৃহে বসিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি বেশী পরিশ্রম করিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কার্য্য করিয়া তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডারউইনের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ, তাঁহার সত্যানুরাগ। তিনি কেবল সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান করিতেন। আপনার মতের সমর্থনের জন্য একেবারেই ব্যস্ত ছিলেন না। বহু পর্য্যবেক্ষণে যাহা পাইতেন, অবিকল তাহাই প্রকাশ করিতেন, তাহাতে যদি তাঁহার বহুকালের পোষিত মত সকল ভ্রান্ত বলিয়াও প্রমাণিত হইত, তবু তিনি বিচলিত হইতেন না। সত্যের অন্বেষণে তিনি নির্ভীক ছিলেন, লোকে তাঁহার কত অযথা নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াছিলেন, নাস্তিক বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, উপহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে, যে ডারউইন নাস্তিক হইয়াছিলেন; একথা ঠিক নহে। বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া ডারউইনের ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। তিনি লঘুভাবে কোনও কাজ করিতেন না। কোনও নূতন সত্য পাইলে বহু দিন ধরিয়া বার বার তাহা পরীক্ষা না করিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন না। ১৮৫৯ সাল তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক The Origin of the Species" প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি 'ক্রমবিকাশের' যে নিয়ম যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা মানবের চিন্তারাজ্যে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে, তাহা বলিয়াছি। মূল সত্যটী ১৮৩৮ সালে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়; কিন্তু হঠাৎ তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না বিশ বৎসর ধরিয়া তাহার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি যখন একেবারে নিঃসংশয় হইলেন, তখন তাহা পুস্তকাকারে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিলেন। যখন এই পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন সমগ্র সভ্য জগতে একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছিল। কত লোকে ডারউইনকে অভদ্রভাবে গালি দিয়াছিল। কিন্তু তিনি নীরবে সমুদয় সহ্য করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর

পরে আজ তাঁহার মত সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়াছে। ১৮৮২ সালের ১৮ই এপ্রেল রাত্রিতে তাঁহার নির্জ্জন বাসগৃহে হৃদরোগে ডারউইনের মৃত্যু হয়। জীবিত অবস্থায় লোকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান করে নাই। কিন্তু তিনি যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন সকলে তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। মহা সমারোহে প্রসিদ্ধ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে নিউটনের সমাধিপার্শ্বে তাঁহার নশ্বর দেহ প্রোথিত হইল। এক দিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভা অপর দিকে বালক সুলভ সরলতাগুণে ডারউইনের জীবন চিরকাল আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে।

টুবলু।

টুবলু ইঁদুরটি যখন মারা গেল, তখন তার ঢের বয়স হয়েছিল। একটা ধানের গাদার মধ্যে তার জন্ম হয়েছিল, সেই খানেই সে নড়ে চড়ে, খেয়ে দেয়ে দিব্য বেঁচে থাক্‌তে পারত, কিন্তু একদিন হঠাৎ কৃষক এসে ধানের গাদা নামিয়ে ফেললে, গাড়ী বোঝাই হতে লাগল।

সে রাতে সহসা জেগে উঠে ঘুমেভরা তিনের মত ছোট চক্ষু দুটি মিট মিট করতে করতে টুবলু মায়ের সঙ্গে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল, তা না হ'লে যে মরণ সম্মুখে! কতকগুলি বড় বড় মোটা সোটা ইঁদুর, তাঁরা পালের গোদা, গম্ভীরস্বরে তাকে স্থির হয়ে থাক্‌তে বল্লেন, তার পর বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল, "বন্ধুগণ, যুবক ও বৃদ্ধ সকল, হঠাৎ এই পলায়নের কারণ তোমাদের জানা উচিত, কাল রাতে আমি রান্না ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় কৃষকের সহিস সেখানে এল, তার পর তার প্রভুকে ডেকে নিয়ে বাহিরে গেল। আমিও তাদের পিছু পিছু গেলাম, যা ভয় করেছিলাম তাই স্বচক্ষে দেখ্‌লাম। ধানের গোলা খালি, এই ধান মাড়াই করে গোলা পূর্ণ করা হবে, হে ভাই সকল, কাল যদি লাঠি সোটা ও কুকুরের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করবার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে পলায়ন কর, পলায়ন কর।"

মায়েরা আর তিল বিলম্ব না করে আপন আপন বাচ্ছাদের আন্‌তে গেল, টুবলু দুয়োরের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, তৎক্ষণাৎ মায়ের সঙ্গ নিলে। বড় ছোট সব ইঁদুরদের সারি করে সাজান হল, তার পর দলপতি চারিদিকে ঘুরে দেখে এসে একবার খুব জোরে কিচি কিচি করে আগে আগে চল্‌তে লাগলেন, আর সবাই তাঁর অনুসরণ করলে। পথের বাধা বিপত্তি কিছুতেই তাহাদের আটকাতে পারলে না, সম্মুখে উচু প্রাচীর এসে পড়লে তার একদিক বেয়ে উঠে অন্য দিক দিয়ে তারা নেমে পড়ল, নদী সাঁতারে পার হয়ে গেল, ইঁদুরের মত বীর জন্তু কিছুতেই পিছুপা হয় না।

ক্রমে তারা একটা মাঠে এসে পড়ল, সেখানে এক জন কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছিল, সেত এই ইঁদুরের পাল দেখে একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালাল। এ রকম সুসজ্জিত ইন্দুর বাহিনী সে আর এর আগে কখন দেখেনি। যাবার সময় তাড়াতাড়িতে তার খাবারটা ফেলে চলে গেল, তাতে ইঁদুরদের খুবই সুবিধা হল, সারারাত হেঁটে হেঁটে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, খেয়ে দেয়ে, জিরিয়ে, বেশ চাঙ্গা হয়ে তারা আবার চলতে লাগল। সে দিন সন্ধ্যায় তাদের যাত্রা শেষ হল। টুবলুরাম তো খুব খুসী, মোটে তার বয়স একুশটি দিন, তার উপর এত দূর হেঁটে আসা, তার পক্ষে কেন, কারো পক্ষে একটা অসাধারণ ব্যাপার। তাদের নতুন বাসস্থান হল এক জন ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার ঘর, তার সঙ্গে মস্ত মস্ত নল লাগান ছিল, তার একটি রান্না ঘরে পৌঁছত, অন্য গুলির বাইরে রাস্তার সঙ্গে যোগ ছিল, সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়া খেয়ে আসা চলত। বাসাটি ইঁদুর জাতের পক্ষে স্বর্গ বল্লেই হয়, আর যাদের বাড়ী তাহার কি অবস্থা হল সেটা ধারণা করবার জন্যে কল্পনার সাহায্য আবশ্যক।

সন্ধ্যার কিছু আগেই তারা সেখানে পৌঁছেছিল সে রাতে গুছিয়ে বস্‌বার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। টুবলু নিজের কোণটি পছন্দ করে মাকে সেটা ঠিক করবার ভার দিয়ে নিজে একবার চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে আস্‌তে গেল। প্রথমে রান্নাঘরে গেল, আর মেজের গর্ত্তের মধ্যে দিয়ে অতি সতর্কে মাথাটি তুলে খযলনে দথে,

কেউ কোথাও নেই, তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল, একবার এ কোণা, একবার ও কোণা, উনুনের পাশে হাঁড়ি কুঁড়ি শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগ্‌ল, এমনই করে বেড়াতে বেড়াতে একবার বাইরে এসে দেখে, সর্ব্বনাশ! থাবা পেতে বাঘের মাসী একটী বেড়াল বসে আছে। তাই দেখে টুবলুর বুকের রক্ত যে জল হয়ে গেল, চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হয়ে এল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যে কেন কিচিকিচি ক'রলে, তা সে জান্‌তেও পারলে না। আর যাবে কোথা, বেড়ালটা একেবারে তার উপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল, দৌড় দৌড়, ছুট ছুট, হুড়ো হুড়ি, হুটোপুটি; উল্টোবাজী খাওয়া, বাবারে গর্ত্তটা, ভাগ্যি সামনে ছিল, টুবলুও তারি মধ্যে ঢুকে পড়ল, প্রাণটা বাঁচল, কিন্তু শরীরে এত জ্বালা, এত ব্যথা কেন? প্রাণটা বেঁচেছে, ল্যাজটি গেছে। তিন সপ্তাহ কাল টুবলুরামের নড়বার চড়বার শক্তি রইল না, তার পর যখন শরীরটা একটু মানুষের মত হল, তখন লজ্জায় আত্মীয় বন্ধুদের সামনে বেরন দায় হল, সমবয়সীরা দেখলে কত ঠাট্টা বিদ্রূপই করে, তাকে দলে নিতে চায় না। কিন্তু গুরুজনেরা যখন দেখলে টুবলুরাম কত নম্র, কত লজ্জায় কাতর, তখন তারা দয়া করে তাদের কাছে ডেকে নিয়ে এলেন। টুবলুচন্দ্র দলপতি মহাশয়ের বিশেষ প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। যখন কোথাও চুরি ডাকাতিতে যেতে হতো, টুবলুকে কখনও ফেলে রেখে যেতনা। এক দিন এমন করে ভাঁড়ার ঘরে ঘুরছে, দেখলে বাড়ীর গিন্নি থালায় করে এক গোছা লুচি রেখেছেন, ছেলেরা সকালে উঠে নলেন গুড় দিয়ে খাবে। কাজের ভিড়ে ভাল করে ঢেকে ঢুকে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাতে ত টুবলুরামদের খুব সুবিধেই হল, তারা পেট ভরে লুচি ফলার করলে। একটি ছোট বাক্স দেখে, টুবলুর লোভ দৃষ্টি সেই দিকে পড়ল, তার ভিতর কি আছে না দেখলে ত মন সুস্থির হয় না, টানাটানি করে বাক্সটি খুলে দেখে তাতে অনেক গুলি সাদা ছোট ছোট কাঠি সাজান আছে, দু একটি কাঠি খাবার চেষ্টা দেখলে তেমন সুবিধা নয়, কিন্তু এই টানাটানি ঘষাঘষি করতে করতে ফোঁস করে, দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, কাছাকাছি কতকগুলি ডালা কুলো ছিল, তাতেও আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল, এঁরা তো পলায়ন দিলেন, ভাগ্যি গৃহস্থরা দেখ্‌তে পেয়ে ছিলেন, তাড়াতাড়ি এসে তাঁরা নিবিয়ে দিলেন, তানা হলে সে দিন একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যেত। এ সব ব্যাপারে টুবলুর মা তাকে সর্ব্বদাই বলতো, "দেখিস বাছা, সাবধানে চলিস, যে রকম বাড়াবাড়ি করছিস, এক দিন একটা মহা বিপদ ঘটাবি! আমারতো ভয়ে ভয়ে প্রাণটা শুকিয়ে উঠ্‌ছে।" টুবলুবীর বল্‌তেন, "আমি এখন বড় হয়েছি, নিজেরে সামলাতে জানি, এখনও কি তোমার আঁচলের তলায় থাক্‌ব?"

আর এক দিন তারা সদল বলে গিয়ে তাদের বাড়ীর পাশের এক মুসলমানের আস্তাবল হতে কেমন করে মুরগীর ডিম চুরি করে এনেছিল, তা যদি শোন, তো অবাক হবে। মিঞা সাহেব আস্তাবলের একটা দেওয়ালে মাচা বেঁধে তারি উপর ডিমে তা দেবার জন্যে সারি সারি মুরগী বসিয়েছিলেন, এই সময় মুরগীরা বড় একটুকে ভয় পায়, তাই দলপতি মহাশয়ের হুকুম ছিল, কেউ যেন টুঁশব্দটি না করে! কেন না তাহলে মুরগী গুলি চেঁচিয়ে সহর মাথায় করত। চুপি চুপি এক একটি ইঁদুর এক একটি মুরগীর নীচে হতে একটি একটি ডিম সরিয়ে নিলে। গিন্নী মুরগীরা কিছু গোল করলে না, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় তারা জেনেছিল, গোল করে কোন লাভ নেই বরং লোকশান, কিন্তু নতুন বউরা সে সব কথা বোঝে না, তারা ধড়ফড় করে চারি দিকে উড়ে পড়ে আর চেঁচায়। ইঁদুরেরাও চালাক হয়েছিল, কার কাছে গেলে নির্ব্বিবাদে কাজ উদ্ধার হবে তা তারা জানত। যখন তারা বারটি ডিম সংগ্রহ করলে তখন সেগুলি কেমন করে নিরাপদে বাড়ী নিয়ে যাওয়া যায় তারি চেষ্টা হতে লাগল। সে কাজও অবিলম্বে সমাধা হল, টুবলুচন্দ্র চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের উপর একটা ডিম চার পায়ে আঁকড়ে ধরে রাখলে, আর একটা পালক মুখের মধ্যে দিয়ে আড়াআড়ি দাঁতে চেপে ধরে রাখলে, দুটো ইঁদুর দিকে ধরে তাকে আস্তে আস্তে টান্‌তে টান্‌তে নীচে নামিয়ে

নিয়ে গেল। পিঠে বড় লাগ্‌তে লাগল, ছালও উঠে গেল, কিন্তু ভবিষ্যতের লোভনীয় ভোজের কথা মনে করে সবই সহ্য হল। রাতের পর রাত নূতন নূতন ব্যাপার ঘটতে লাগ্‌ল তাতে টুবলু বুদ্ধি, সাহস, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণের বিশেষ পরিচয় দিতে লাগ্‌ল। দলপতি এ সময় ক্রমশঃ দুর্ব্বল আর বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন, এক দিন টুবলুকে ডেকে বল্লেন, "বাছা আমি মারা যাবার পর তুমি দলপতি হইও তোমার মত এ কাজের যোগ্য আর কাউকেও দেখ্‌ছিনে।" দু দিন পরে দলপতির মৃত্যু হল, তখন সেই লাঙ্গুলহীন টুবলু তাদের নেতা হল এবং তার নেতৃত্বে নিত্যি নতুন আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটতে লাগ্‌ল! গৃহস্থ বাড়ীর ভাণ্ডার ঘরই তাদের প্রধান আড্ডা, এ সময় শীত পড়ে আসছিল, বাড়ীর গিন্নী প্রায় প্রতিদিনই বাসী লুচি রাখতেন, সে সব খেয়ে ছড়িয়ে এঁরা একেবারে লণ্ড ভণ্ড করে রাখতেন, সিকের উপর তুলে রেখেও কোন সুবিধা হত না। এক দিন গিন্নী একটি বড় ভেটকি মাছ আঁশ ছড়িয়ে পেট চিরে পরিষ্কার করে টাঙিয়ে রেখেছিলেন, পরের দিন নিজের রন্ধন কৌশলের বিশেষ পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল, রাতারাতি টুবলুর দল সে মাছটিকে প্রায় সাঙ্গ করে রেখে গেল। প্রথমে সিকের টাঙান মাছ দেখে তারা প্রায় নির্ভরসা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু টুবলরামের মাথায় একটা ফন্দী এসে গেল। সাজান হাঁড়িগুলির উপর চড়েও যখন নাগাল পেলেনা, তখন সেই হাঁড়ির থামের উপর একটি ইঁদুরকে দাঁড় করিয়ে নিজে তার ঘাড়ে চড়লে, আর বেশী কষ্ট করতে হল না। সহজেই মাছটিকে সিকে কেটে নামিয়ে ফেলে প্রায় তার অর্দ্ধেকটা শেষ করে পালাল। সকালে উঠে গিন্নী যখন তাঁর অত সাধের মাছের দশা দেখ্‌লেন, তখন তিনি লক্ষ্মী ছাড়া ইঁদুর গুলোর ধ্বংশ পণ করলেন। মনে ভাবলেন দু দিন ইঁদুর গুলোকে সহজে খাবার সুবিধে দিয়ে তিন দিনের দিন তাদের মারবেন। সে দিন রাতে টুবলুর দল এসে দেখে থালাতে লুচি ক্ষীর সাজান, দেখে ত মহা খুসী, কিন্তু বুদ্ধিমান টুবলু এর ভিতরকার মৎলবটা বুঝতে পেরেছিল, সবাইকে বল্লে "দেখ আজ আর কাল তোমরা এ খাবার নির্ভয়ে খেতে পার কিন্তু পরশু এ পথেই এসনা, তাহলে বিপদে পড়বে," তারাও সেই মত কাজ করলে। তিন দিনের দিন গিন্নীঠাকুরুণ একটু সকাল সকাল উঠে ভাঁড়ার ঘরে গেলেন, মনে মনে আশা যে গিয়ে দেখ্‌বেন হতভাগা ইঁদুর গুলো সবংশে মরে পড়ে আছে, কিন্তু গিয়ে দেখলেন তাঁর সাজান খাবার তেমনি পড়ে আছে, খাবার দূরে থাক্ সে লুচি ক্ষীর কেউ শুঁকেও দেখেনি। তাঁর আদরের বেড়ালটি এত খানি ক্ষীর অমনি অনাদরে পড়ে আছে দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলে, প্রথমে বাড়ীর গিন্নীর সে দিকে দৃষ্টি পড়েনি, তার পর যখন দেখ্‌লেন তখন আর কোন উপায় হল না। মিনিট দশের মধ্যে বেড়ালটি মারা গেল, ক্ষীরের সঙ্গে তীব্র বিষ মেশান ছিল। এই বেড়ালই টুবলুর ন্যাজ কেটে নিয়েছিল। এখানেই টুবলুরামের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার শেষ হ'ল।

এর পর আমি একদিন বাগানে বসে আছি, সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, এমন সময় দেখ্‌লাম তিনটি ইঁদুর সেখান দিয়ে যাচ্ছে, মাঝেরটি সব চেয়ে বড় ও মোটা, নিরীক্ষণ করে দেখ্‌লাম, সেটি আর কেউ নয়, ন্যাজকাটা টুবলু, এখন বুড় হয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই অন্য দুজনে তাকে সাবধানে আস্তে আস্তে নিয়ে চলেছে। পর দিন মালী এসে দেখালে ভুলো কুকুরটা সেই অন্ধ ইঁদুরটিকে মেরে ফেলেছে।

গল্পটা যতই অদ্ভুত শোনাক, কিন্তু একেবারে মিথ্যে নয়, সত্য ঘটনা হইতেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

Andrew Lang's Animal Story Book হইতে গৃহীত।

সোনার প্রাণ।

(জর্ম্মাণ উপকথা)

কনরাড দরিদ্র। তাহার সন্তান অনেকগুলি, সাতটি ছেলে, একটি মেয়ে। কি করিয়া পরিবারের অন্নসংস্থান করিবে, ভাবিয়া সে আকুল হইয়াছিল। একদিন সে

সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কাজ করিতেছিল। কাজ করিতে করিতে কনরাড ম্লানমুখে স্ত্রীকে বলিল, "বল দেখি ছেলেদের উপায় কি হইবে? আমার অর্থ নাই যে, তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিই। উঁহারা মেয়ে হইলে এত ভাবনা হইত না। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখিতে হয় না।

এমন সময়ে কে দ্বারে আঘাত করিল। কনরাড দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া গেল। দ্বার মুক্ত হইলে এক শ্বেতশ্মশ্রু খর্ব্বকায় বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি পরিচ্ছদ হইতে হিমবিন্দু সকল ঝাড়িয়া ফেলিতে ছিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "বাপু আজি রাত্রির মত আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবে? বড় দুর্য্যোগ, ভয়ানক অন্ধকার, পথ খুঁজিয়া পাইলাম না।"

কাঙ্গাল কনরাড ও তাহার স্ত্রী সাদরে বৃদ্ধকে কুটীরে স্থান দিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা বৃদ্ধের আহারের আয়োজন করিতে পারিল না।

কনরাড বলিল, "আমি আহ্লাদের সহিত আপনাকে আহার দিতে পারিতাম, কিন্তু হায়, ঘরে কিছুই নাই। ছেলেদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহারা সব আলু খাইয়া ফেলিয়াছে।"

সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধেরও আহারের প্রয়োজন ছিল না। উভয়ে আপনাদিগের তৃণশয্যায় এক পার্শ্বে বৃদ্ধের শয্যা করিয়া দিল। তাহার পর শীঘ্রই সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধ গৃহস্থকে বলিলেন, "আমাকে একবার তোমাদের ছেলেগুলিকে দেখাও। তোমরা আমাকে বড় যত্ন করিয়াছ, আমি তোমাদের প্রত্যেক পুত্রকে একটি করিয়া উপহার দিয়া যাইব।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া স্বামী স্ত্রী তাঁহাকে ছেলেদের নিকট লইয়া গেল। সাতটি ছেলে শয্যার উপর সারি সারি ঘুমাইতেছিল। বৃদ্ধ তখন কাপড়ের মধ্য হইতে একটা সোনার ডাঁট' বাহির করিয়া মৃদুস্বরে কত কি মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাহার পর, লোকে যেমন মোম দিয়া নানাবিধ জিনিস তৈয়ার করে, তিনিও তেমনি সোনার সেই ডাঁট হইতে নানা প্রকার দ্রব্য গড়িলেন।

বড় ছেলের মাথায় একটি সোনার মুকুট রাখিয়া তিনি বলিলেন, "একদিন তুমি রাজা হইবে; দেখিও, কেহ যেন তোমার মুকুট চুরি না করে; সাবধান, তুমি যেন মুকুটটি হারাইও না।" দ্বিতীয় ছেলেকে একখানি সোনার তরবারি দিয়া বলিলেন, "এই তরবারি হস্তে পৃথিবী জয় কর।" তার পর তৃতীয় ছেলেটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি তোমায় বর দিলাম, তুমি গায়ক হইবে।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে একটা সোনার বীণা দিলেম। চতুর্থ ছেলেটির নিকট গিয়া বলিলেন, "তোমার বাহু দুইটী সবল এ বাহুযুগলের সাহায্যে পরিশ্রম করিও; তোমার প্রচুর অর্থ লাভ হইবে।" এই বলিয়া তাহাকে একটা সোনার হাতুড়ী দিলেন। পঞ্চম শিশুকে বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি বণিক হইবে।" এই বলিয়া তাহাকে এক তোড়া মোহর দিলেন। ষষ্ঠ শিশুকে বলিলেন, "তুমি নাবিক হইবে।" তাহাকে একটা সোনার তরণী দিলেন। তার পর তিনি সপ্তম বালককে বলিলেন, "তুমি কৃষক হইবে। নহিলে ইহারা সব খাইবে কি?" এই বলিয়া তিনি তাহাকে একটাসোনার লাঙ্গল দিলেন।

বৃদ্ধ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, কন্‌রাডের স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল, "আমার ছোট মেয়েটির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি; সে ঘরের ঐ কোণে ঘুমাইতেছে। ছেলেরা সব পাইল, সে কিছুই পাইল না। হে দয়াময় অপরিচিত, তাহাকেও দয়া করিয়া একটি উপহার দিন।" বৃদ্ধ গম্ভীরমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আগে মনে কর নাই কেন? এখন আর সময় নাই। সমস্ত সোনা আমি দিয়া ফেলিয়াছি। তা, তোমার ছোট খুকীকে দেখাও।" যে কোণে মেয়েটি শুইয়াছিল, কনরাডের স্ত্রী বৃদ্ধকে সেখানে লইয়া গেল। খুকীর সেই ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; সে অপরিচিতের মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। মেয়েটি এত সুন্দর, আর তাহার মা একটা উপহারের জন্য এমন মিনতি করিতে লাগিল যে, কিছু নাই বলিয়া বৃদ্ধ দুঃখিত হইলেন

বৃদ্ধ তাঁহার সব পকেট খুঁজিলেন কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে সোনার ডাঁটের একটা অতি সরু টুকরা পাওয়া গেল। বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ সোনার টুকরার পানে চাহিতে লাগিলেন। টুকরাটি এত ছোট, যে, তাহাতে একটা চামচে কি একটা অঙ্গুরীও নির্ম্মাণ করা যায় না। হঠাৎ বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! আমি এই সোনায় একটা ছোট সোনার হৃদয় গড়িয়া খুকীকে দিব;—সে তাহার ভাইদের চেয়েও ধনবতী হইবে।'

এই বলিয়া তিনি একটা সোনার হৃৎপিণ্ড গড়িয়া মেয়েটির বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তুমি কখনও এটিকে হারাইও না।"

পতি পত্নী দুই জনে এই সকল উপহারের জন্য বৃদ্ধকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তিনি উভয়ের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

বড় ছেলেটি, অনেক দূরদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা রাজ্য পাইল। নিকটে আর রাজা ছিল না। দ্বিতীয় বালকটি সাহসী সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেল। ঘরে বসিয়া গায়ক ছেলেটির যশোলাভ হইল না। সে রাজাদের দরবারে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে লাগিল। রাজদরবারে তাহার খুব আদর হইল; সেখানে তাহার সম্মান লাভ ঘটিল। নাবিক ছেলেটি একটা জাহাজের কাপ্তেন হইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল, এবং তাহার সহোদরের জন্য রাশি রাশি পণ্য লইয়া আসিল। তাহার ভাই একটা বড় বাণিজ্যপ্রধান নগরে বণিক হইয়াছিল। কেবল কারিকর ছেলেটি আর কৃষক ছেলেটি গ্রামে বাস করিতে লাগিল।

ছোট ভগিনীটি তাহার মাতা পিতার কাছে রহিল; পীড়া হইলে তাঁহাদিগের সেবা করিতে লাগিল। প্রথমে কন্‌রাড মরিল; তাহার পর কনরাড-গৃহিণীও মরিয়া গেল। পিতা মাতার মৃত্যুর পর বালিকা কুটীরেই রহিল। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের সাহায্য করিতে লাগিল।

এক দিন তাহার কারিকর ভাই তাহার কুটীরে আসিল। একটা ভারী হাতুড়ীর আঘাতে তাহার হাত ছেঁচিয়া গিয়াছিল। সে কাজ করিতে পারিলনা, বড় যাতনা পাইতেছিল। বোন তাহার হাত বাঁধিয়া দিল, আর এমন শুশ্রূষা করিতে লাগিল, যে, সে শীঘ্রই সারিয়া উঠিল। ইহার অল্প দিন পরে তাহার কৃষক ভাই আসিয়া তাহার দুঃখ কাহিনী বলিল। তাহার গোলা পুড়িয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বীজ-শস্য সব নষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মী বোন ভাইয়ের জন্য প্রতিবেশীদের নিকট শস্য ভিক্ষা করিতে লাগিল, সে আপদে বিপদে সকলকে সাহায্য করিত বলিয়া সকলেই প্রসন্নচিত্তে তাহাকে শস্য দিল। দরিদ্র কৃষক এই প্রকারে বিপদ হইতে মুক্ত হইল; আবার তাহার ভাগ্য ফিরিল।

এই ঘটনার পর অধিক দিন যাইতে না যাইতেই আর দুই ভাই তাহার নিকট দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিতে ও পরামর্শ লইতে আসিল। বাণিজ্য তরী ডুবিয়া যাওয়াতে সওদাগরের সমস্ত পণ্য নষ্ট হইয়াছিল।

মেয়েটী চমৎকার সুতা কাটিতে পারিত। অনেক বৎসর ধরিয়া সে শণের এমন চিকণ সুতা কাটিয়াছিল, যে সেগুলি খাঁটী রেশমের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। বোন দুই ভাইকে সেই সুতা দিল। তাহারা নগরে গিয়া সুতা বেচিয়া এত টাকা পাইল, যে, তাহারা আবার পূর্ব্বের মত ব্যবসায় চালাইতে লাগিল।

অনেক দিন তিন বড় ভাইয়ের কোনও খবর নাই। এক দিন রাত্রিতে এক জন দীন হীন ক্লান্ত পথিক কুটীরের দ্বারে আঘাত করিল। তাহার কাছে একটা শুষ্ক পত্রমুকুট ও একটা ভাঙ্গা বীণা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। মুকুট ও বীণা দেখিয়া বোন তার সেজ দাদাকে চিনিল। তাহার মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন, গান গাহিবার শক্তি তাহার আর ছিল না। বোন ভাঙ্গা বীণা এক জন নিপুণ কারিকরের কাছে লইয়া গেল। সে বীণাটি মেরামত করিয়া তাহাতে নূতন তার সাজাইয়া দিল।

আবার যখন বসন্ত আসিল, পাখীরা গান ধরিল, তখন পাখীর গানে গায়কের মনে আবার বীণা বাজাইয়া গান করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। সে বীণার তারে ঘা দিয়া

স্বর ভাঁজিতে লাগিল। দেখিল, বীণার ধ্বনি তেমনই মনোহর, কণ্ঠ তেমনই মধুর! না, বীণার ধ্বনি ও কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মনোহর, স্বর-সপ্তক পূর্ব্বাপেক্ষা গাম্ভীর্য্যময় ও পূর্ণোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। গায়ক ভগিনীকে ধন্যবাদ দিয়া পূর্ব্বের মত তাহাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু অধিক দিন তাহাকে একাকিনী থাকিতে হইল না। তাহার মেজ ভাই যুদ্ধে আহত হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর কত দিন কত রাত্রি অবিরাম সেবার পর সে আরোগ্য লাভ করিল।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা রাজার দুর্গতি অধিক হইয়াছিল। সে সোনার মুকুট হারাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল। প্রজারা রাজাকে তাড়াইয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়াছিল। কাজেই সেও ভগিনীর নিকট ফিরিয়া আসিল। বোন দাদার উপকার করিবার জন্য কত চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কি উপায়ে সে দাদার উপকার করিতে পারিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না, ভাই আবার রাজা হইতে চায়; বোনের ত রাজ্য নাই যে দিবে? তাই সে রাজ্য খুঁজিতে বাহির হইল।

অনেক পথ ভ্রমণ করিয়া সে একটা নূতন দেশে আসিয়া পঁহুছিল, এবং একটি সুন্দর উদ্যানের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। বাগানের দরজা খোলা ছিল। সে বাগানের ভিতর গেল, এবং এক বৃক্ষতলে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল, সম্মুখে এক জন পুরুষ, তাহার মাথায় সোনার মুকুট ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পুরুষটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কি চাও?" মেয়েটী ভয়ে ভয়ে বলিল, "রাজা! আমার এক ভাই আছেন, তিনি আপনার মত এক সময় রাজা ছিলেন, এখন তাঁর রাজ্যও গিয়াছে, মুকুটও গিয়াছে। আমি তাঁহার জন্য একটা নূতন রাজ্য খুঁজিতেছি।" রাজা কোমলতাময়ী এই সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "বেশ, সেটা শক্ত কাজ নয়; এই রাজ্যের পরে একটা রাজ্য আছে; সেখানকার প্রজারা এক জন রাজা খুঁজিতেছে। কিন্তু তোমার ভাইয়ের একটা সোনার মুকুট চাই ত?"

কন্যা প্রফুল্লমনে বলিল, "যদি কেবল তাহাই হয়, আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিব। যিনি তাঁহাকে সোনার মুকুট দিয়াছিলেন, তিনি আমাকে একটা সোনার ছোট হৃৎপিণ্ড দিয়াছিলেন। আমি সেইটী তাঁহাকে দিব; বোধ হয়, ইহাতে একটা সোনার মুকুট গড়িয়া লইতে পারিবেন।" এই কথা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন।

"তবে এত দিন ধরিয়া আমি যাহাকে খুঁজিতেছিলাম, তুমিই সেই কন্যা! তোমার কাছে সোনার প্রাণ আছে। আমি আর কাহাকেও আমার রাণী করিব না; সেই জন্য এত দিন প্রতীক্ষা করিয়া আছি। কতকগুলি কন্যা আমাকে বলিয়াছিল, তাহাদের সোনার প্রাণ আছে। কিন্তু কাছে আসিলে চাহিয়া দেখিয়াছি, তাহাদিগের হৃদয় খাঁটী সোনার নয়। তুমি আমাকে তোমার সোনার প্রাণ দাও। আমি তোমার হৃদয় এমন যত্ন করিয়া রাখিব, যে, তাহার কোনও অমঙ্গল হইবে না। আমি তোমার ভাইকে আমার পুরাণ মুকুট দিব; এখনও সেটি ঝক্ ঝক্ করিতেছে; তবে মুকুটটি একটু নুইয়া গিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া বালিকা আনন্দে রাজাকে আপনার সোনার প্রাণ দান করিল। রাজা আজীবন সেই সোনার প্রাণ যত্নে রাখিয়াছিলেন! কন্যার ভাই পুরাণ মুকুট পাইয়া পাশের রাজ্যে রাজা হইল।

ভগিনীর বিবাহের সময় সাত ভাই বিবাহ দেখিতে আসিল। বোনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য সাত ভাই রাশি রাশি বহুমূল্য উপহার আনিল। বালিকার গায়ক ভাই ভগিনীর বিবাহের সময় একটি অতি চমৎকার গান গাহিয়াছিল। বিবাহের নিমন্ত্রণ গৃহ হইতে আসিবার সময় তাহারই মুখে আমরা এই গল্পটি শুনিয়াছি।

(সাহিত্য হইতে পরিগৃহীত।)

জীবনের পথে।

১৩ই বৈশাখ ১৩-আজ আমার বয়স ঠিক তের বৎসর পূর্ণ হইল। আমি এত দিন যে নীতি বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতাম, এখন হইতে আর সেখানে

যাইব না, চৌদ্দ বৎসর আরম্ভ হইলে সেখানে ছেলে মেয়ে রাখিবার নিয়ম নাই। এই বিদ্যালয় ছাড়িয়া আসিতে আমি মনে বড় কষ্ট পাইয়াছি। যখন সকলের নিকট বিদায় লইতে গেলাম, তখন আমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি ইঁহাদের সকলের নিকট যত স্নেহ, উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল। আমাকে ভাল হইতে চেষ্টা করিতে দেখিলে ইহারা কত সুখী হইতেন এবং আমায় সস্নেহে কত উৎসাহ দিতেন, সে সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত সাধু সাধ্বীর পবিত্র জীবনের কথা আমি ইঁহাদের মুখে শুনিয়াছি। আজ বিদ্যালয় ছাড়িবার দিন মনে মনে সকাতরে তাঁহাদের সকলের আশীর্ব্বাদ চাহিলাম, সেই সকল সাধু সাধ্বীর আশীর্ব্বাদ ও জীবনের প্রভাবে আমার জীবন যেন পুণ্যে উজ্জ্বল হয়।

মা আজ আমাকে অনেক আদর করিয়াছেন, আমি যাহা যাহা খাইতে ভালবাসি তাহা রাঁধিয়াছিলেন, আর একখানি ডুরে শাড়ী ও এক জোড়া মাকড়ী দিয়াছেন। বাবা ডাকিয়া আমাকে অনেক ভাল কথা বলিয়াছেন, আর সুন্দর দোয়াত কলম ও এক খানা রামায়ণ দিয়াছেন। নীতি বিদ্যালয় হইতে আসিবার সময় তাঁহারা আমাকে এক খণ্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ ও এক খানি অহল্যা চরিত দিয়াছেন। এই বইগুলি আমি ভালবাসি, সর্ব্বদাই এইগুলি পড়িব, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতাটী বার বার মনে পড়িতেছে।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি
চেয়ে দেখ আকাশের পানে
পড়ুক বিমল বিভা পূর্ণরূপ রাশি
স্বর্গমুখী কমল নয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠ শুভ্র সূর্য্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মত
দাঁড়াও সায়াহ্ন মাঝে পবিত্র হৃদয়ে।

আমি এখন হইতে ভাল হইব। আমার দোষ অনেক, প্রধান রাগ, আর আমি বড় একগুঁয়ে। আমি এই সকল দোষ নিশ্চয়ই ছাড়িব।

২৫এ বৈশাখ। আবার কত দিন পরে লিখিতেছি! দেখিতে দেখিতে কতগুলি দিন চলিয়া গেল। এই কয় দিনে বিশেষ কিছু ঘটনা ছিল না। আমাদের ক্লাসে এক জন নূতন মেয়ে আসিয়াছে, নাম জয়ন্তী মিত্র। সে আমার এক বয়সী হইবে। শুনিলাম, সে নাকি পড়া শুনায় খুব ভাল; কি জানি, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। আমি ত এত দিন বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছি, এখন জয়ন্তী আসিয়া আমাকে সে স্থান হইতে তাড়াইবে না কি? তাহা কখনই হইবে না। জয়ন্তী আজ আসিয়া কালই যে আমার উপরে উঠিবে, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।

২৯এ বৈশাখ। জয়ন্তীকে আমি খুব ভাল করিয়া দেখিতেছি, তাহার ভাল নামটা সত্য কি না। আজ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে গিয়াছিলাম, ভাল লাগিলনা। দেখিলাম, সে কথা বলিতে ভালবাসেনা, একা একাই থাকে; পাড়াগেঁয়ে কি না, মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতে শিখে নাই। বড় অহঙ্কারী, আর ভাল পড়া শুনা? কই তাহা ত কিছুই দেখি না।

৩০ই আষাঢ়। আমার বড় রাগ ধরে। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আর পারিয়া উঠিনা। ব্যাকরণের নীরস সূত্রগুলি আমি কিছুতেই মনে রাখিতে পারি না। কাল রাত্রে পণ্ডিত মহাশয়ের পড়া করিতে গিয়া বই হাতে লইয়া সত্যসত্যই খানিকক্ষণ কাঁদিয়াছি। আমি কিছুতেই পারি না। এইরূপ কষ্টে পড়িতেছি, এমন সময়ে মা খোকাকে লইতে ডাকিলেন, আমি গেলাম। বাপ্রে! ছেলেটা এমন দুষ্টু হইয়াছে, যে কি বলিব, প্রথমেত মাকে ছাড়িয়া কিছুতেই আমার কাছে আসিতে চায় না, তাহার পর অনেক জোর করিয়া যখন মার কোল হইতে আনিলাম, তখন তার কান্না দেখে কে? প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল। আমি তাহাকে লইয়া বারাণ্ডায় বেড়াইতে লাগিলাম। কোন মতেই তাহার কান্না থামেনা। একেত আমার পড়া হয় নাই, তাহার পর যে কঠিন পড়া কি করিয়া করিব, তাহা ভাবিয়া বিষম ভয় ও উৎকণ্ঠা হইতেছে, এমন সময়ে খোকাটার এই উপদ্রব আমার

অসহ্য বোধ হইল, ইচ্ছা হইল, এক আছাড় মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাই। বাবা পাশের ঘরে পড়িতেছিলেন, তাই ভয়ে কিছু করিতে পারিলাম না, মনে মনে রাগে গর গর করিতে করিতে মার বিছানায় শুইয়া উহাকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম। কাজেই আমার আর পড়া করা হইল না। তাই আজ ক্লাশে পড়া বলিতে পারি নাই, পণ্ডিত মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার মুখে মুখে উত্তর দিয়াছি। রাগ হইলে আমার আর জিহ্বার উপর শাসন থাকে না। ক্লাস শুদ্ধ মেয়ে আমার ব্যবহার দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় আমায় একেবারে সকলের নীচে নামাইয়া দিলেন, সেই অপমান আমার মর্ম্মে বিঁধিয়া রহিল। আমার কান্না পাইল, কিন্তু আমি কাঁদি নাই, গম্ভীর হইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাম। জয়স্ত্রী দেখি, সকল প্রশ্নেরই বেশ উত্তর দিল; পণ্ডিত মহাশয় যে তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতেছেন, তাহা বেশ বুঝিলাম।

অম্বিকা বাবুর ক্লাশেও আমি পড়া পারি নাই। ইহাঁর পড়া করিতে আমি বরাবরই খুব ভালবাসি এবং ভাল করিয়া করি, আজিও খুব ভাল করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার মন পূর্ব্ব হইতেই খুব খারাপ ছিল, তাই আমি কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারি নাই, মুখ ভার করিয়া বসিয়াছিলাম। অম্বিকা বাবু আজ আমার ব্যবহারে বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছেন, আর দুঃখিতও যে হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি জানি, ইনি আমাকে খুব ভালবাসেন, আর আমিও ইঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করি এবং ইহার প্রিয়পাত্র হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করি। হায়! আমি কেবল এক রাগের দোষে আজ সকল নম্বর হারাইলাম। তাহার উপর সকলের নিকটে অতিশয় মন্দ মেয়ে বলিয়া অখ্যাতি হইয়া গেল, লজ্জায় এ মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা নাই। পণ্ডিত মহাশয়ইত যত নষ্টের গোড়া। আমাকে অত পড়া না দিলেত এমন হইত না। জানেনইত আমি পারিব না; আর এক দিন একটুকু পড়া পারিলাম না, এই অপরাধ আর তিনি ক্ষমা করিতে পারিলেন না? এতগুলি মেয়ের সম্মুখে স্বচ্ছন্দে আমায় অপমান করিলেন?

৫ই আষাঢ়। মা কালকার স্কুলের ঘটনা সমুদয় শুনিয়াছেন। আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকাইয়া লইয়া সমুদয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি কাল হইতেই মর্ম্মে মরিয়া আছি। তাহার উপর মার এই রকম জিজ্ঞাসা করা আমার একেবারেই ভাল লাগিলনা, আমি খানিক ক্ষণ কোন উত্তর দেই নাই, আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পারিলাম না। আমার মার উপর বড় রাগ এবং নিজের উপর তার চেয়ে রাগ ও ঘৃণা হইল, আমি জ্ঞান হারাইয়া মাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, "মা, আমি দেখিতেছি, আমি যত ভাল হইতে চাই, তুমি ততই আমায় বকিতে থাক, আমি কাল হইতে কত কষ্ট পাইতেছি, তুমি কি তাহা একবার ভাব? আমি পড়া কেন পারি নাই জিজ্ঞাসা করিতেছ, কি করিয়া আমার পড়া হয়, তুমি তা দেখ না! কত ঘরের কাজ আমাকে করিতে হয়, দেখ দেখি? তুমি আমার ঘাড়ে যত কাজ চাপাও, স্কুলের কোন মেয়ের মা তেমন করেন না। বিছানা পাতা, ঘর সাজান, আলনা গোছান, পান সাজা, খোকাকে দুধ খাওয়ান, কাপড় পরান, কোলে করা সকলই আমি করি, আবার বল পড়া হয় না কেন?" আমার এই কটু উত্তরে আমাকে মা কিছুই বলিলেননা, আমাকে কোলে বসাইয়া ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আমি মার কাঁধে মাথা রাখিয়া ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলাম। আমি কি দুষ্টু মেয়ে! আর আমার মা কেমন ভাল! এত রাগ করি, ও বকি, তবু মা আমাকে মিষ্ট ব্যবহার ছাড়া করেন না। ছি, ছি, আমার এই দুরন্ত স্বভাব লইয়া আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, ঘরে বাহিরে স্কুলে বাড়ীতে সকল স্থানেই মন্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ছি, ছি, আমি কি করিব? ছুটিয়া ছাতে গেলাম, যে দুষ্ট মেয়ে হইয়াছি, তাহাতে কাহাকেও এ মুখ আর দেখাইতে ইচ্ছা নাই। একা ছাতে বসিয়া আমার কুব্যবহারের কথা ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া আবার মার কাছে যাই? কি করিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিব? আমি আর কখনও এমন করিব না। আমি এখন হইতে মার সকল কথা

শুনিয়া চলিব। মা আমার ব্যবহারে না জানি কত ব্যথা পাইয়াছেন। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম, হয়ত আমার না দেখিয়া মা খুঁজিতে আসিবেন. তখন তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিব,কিন্তু মা আসিলেন না,ক্রমে সন্ধ্যা হইল দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, খোকা মার ঘরের জলের কুঁজো ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সমস্ত ঘরময় জল, তাহার মধ্যে বসিয়া কাঁদিতেছে, ভাঙ্গা খোলায় তাহার হাত পায়ের দুই এক স্থান অল্প কাটিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া খোকা হামা দিয়া আমার কাছে আসিসা সুন্দর ক্ষুদ্র দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল এবং আমায় ধরিয়া দাঁড়াইয়া কোলে উঠিতে ব্যগ্র হইল। আমি তাহাকে কোলে লইয়া দেখি, যে তাহার গায়ের জামা ভিজিয়া গিয়াছে, অনেক ক্ষণ ঠাণ্ডা জলে বসিয়া তাহার হাত পা হিমের মত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল, এই সে দিন এমন জ্বর ও কাশী ভুগিয়া উঠিয়াছে, ইহার উপর ঠাণ্ডা জলে এতক্ষণ বসিয়া যদি তাহার অন্য কোন কঠিন পীড়া হয়? আমি কাছে থাকিলে ত খোকা এমন কুঁজা ভাঙ্গিত না, আমার দোষেইত এমন হইল। আবার যদি খোকার জ্বর হয়, তবে ত সে অপরাধ আমারই হইবে। আমি কি দুষ্ট বোন, আমার এই স্নেহের ভাইটীর জন্য কি বা করি। তাহা লইয়া মাকে আবার কত কথা শুনাইলাম! ছি আমার স্বভাব বড় নীচ। আপনাকে এইরূপ ধিক্কার দিতে দিতে তাড়াতাড়ি খোকার গায়ের ভিজা জামা ছাড়াইয়া তাহার গা গামছা দিয়া মুছাইয়া তাহাকে অন্য জামা পরাইব, এমন সময় মা রান্না ঘর হইতে উপরে আসিলেন; মা দেখিয়াই সমুদয় বুঝিলেন, তিনি খোকার জামাটা আমার হাতে লইয়া ধীর ও গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কমল, তোমাকে আর খোকার কোন কাজ করিতে হইবে না, আমি যখন পারিব তখন কোলে লইব, অন্য সময়ে সে আপনিই মাটীতে বসিয়া খেলিবে; তোমার মত দিদির কাছ হইতে খোকা কাজ চায় না। তুমি ঘরের কাজ করিতে এত বিরক্ত হইয়াছ, কিন্তু তুমি যে ঘরে জন্মিয়াছ, সেই গৃহস্থ ঘরের বালিকাদের সকল গৃহকর্ম্মই উত্তমরূপে শিখিতে হয়। আমরা তোমায় লেখা পড়ায় যেমন উন্নত করিব তেমনি সকল গৃহকর্ম্মেও তোমাকে নিপুণ করিয়া তুলিব, ইহাতে অবহেলা করিলে স্ত্রীলোকের জীবনের মূল্য কি রহিল? সময়ে তোমাকে এক গৃহের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এখন হইতে শিক্ষা না থাকিলে তুমি সে ভার কিরূপে বহন করিবে? গুরুসেবা, শিশুপালন, গৃহের সকলের পরিচর্য্যা তুমি কিরূপে করিবে?" মার এই কথায় আমি আমার ভুল বুঝিলাম, বলিলাম, "মা তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার সকল কাজই করিব। খোকাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইও না, আমি এ কয়দিন কেবল ভুলই করিতেছি, তুমি আমায় দেখাইয়া দাও, কিসে আমার ভাল হইবে। আমি আর এমন থাকিব না।" এই বলিয়া মার পায়ে পড়িলাম। মা আমার এই ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আজ এই রূপে আমার মন হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল। আজ রাত্রিতে খাইবার পর বাবা আমাকে ইংরাজী বই লইয়া পড়িতে ডাকিয়াছিলেন, আমি বাবার কাছে ইংরাজী পড়িতে বড় ভালবাসি। আর বাবা ইংরাজী বই হইতে যে সকল ভাল ভাল গল্প বলেন, তাহা আমার শুনিতে বড় ভাল লাগে।

আকাশ মণ্ডল।

পরিষ্কার রাত্রিতে আকাশের দিকে নেত্র পাত করিলে সমস্ত আকাশকে অসংখ্য জ্যোতিঃকণা খচিত অতি বিস্তীর্ণ এক খানা চিত্রপটের ন্যায় দেখা যায়। যে সকল জ্যোতিঃকণা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে 'তারা' কহে। তারাগণের আলোক অতি ক্ষীণ। যখন আকাশে চন্দ্র উদয় হয়, তখন তাহার আলোকে পৃথিবী আলোকিত হয়; কিন্তু চন্দ্রের অভাবে অসংখ্য তারা একত্র মিলিত হইয়াও পৃথিবীকে তাহার শতাংশের একাংশ আলোকিত করিতে পারে না।

দিবসে আকাশ নির্ম্মল ও জ্যোতিঃকণাশূন্য দেখায় বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারে, যে তখন আকাশে তারা থাকে না; বস্তুতঃ তাহা নহে। আকাশ সর্ব্বত্র এবং সকল সময় তারা খচিত থাকে; কিন্তু দিবসে সূর্য্যের প্রখর

আলোকে তারার আলোক ঢাকিয়া যায়, সেজন্য তখন আকাশ সম্পূর্ণ তারা শূন্য দেখায়। রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালিলে অনেক দূর হইতে তাহার আলোক দেখা যাইতে পারে; কিন্তু দিবাভাগে তাহা অপেক্ষা অতি অল্প দূরে দাঁড়াইলেও ঐ আলোক দেখা যায় না, এবং যত দূরে সরিয়া যাওয়া যায়, ততই ক্রমশঃ প্রদীপ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়। আকাশের তারাসকলও সেইরূপ; তাহারা অনেক দূরে থাকাতে তাহাদের আলোক ক্ষীণ দেখায় এবং অন্য কোন তীক্ষ্ণ আলোকের কাছে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে একেবারেই দেখা যায় না। অন্ধকার রাত্রিতে যত তারা দেখা যায়, জ্যোৎস্না রাত্রিতে তাহা অপেক্ষা কম দেখা যায়; তাহার কারণ, তারার আলোকের তুলনায় চন্দ্রালোকের তীক্ষ্ণতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৎসরের কোন কোন সময় সন্ধ্যাকালে একটি তারাকে পশ্চিমাকাশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীপ্তি পাইতে দেখা যায়; ইহাকে 'সন্ধ্যাতারা' কহে। ইহার জ্যোতিঃ সকল সময় সমান থাকে না; যখন তাহা অত্যন্ত প্রখর হয়, তখন ঐ তারাকে সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বে মুক্ত নেত্রে দেখা গিয়া থাকে। আমি একবার বেলা তিনটার সময় আকাশে সন্ধ্যা তারা দেখিতে পাইয়াছি। আবার কোন কোন সময় একটী উজ্জ্বল তারাকে সূর্য্যোদয়ের আগে পূর্ব্বাকাশে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়, ইহাকে 'শুকতারা' বা 'প্রভাতী' তারা কহে। বস্তুতঃ 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' উভয়ই এক। তাহার গতি আছে এবং তাহা সূর্য্যের কাছে থাকিয়া কখনও সূর্য্যের আগে চলে এবং কখনও সূর্য্যের পশ্চাতে যায়। যখন সূর্য্যের আগে চলে, তখন তাহা সূর্য্যের আগে উদয় হয়, একারণ তাহাকে 'প্রভাতী তারা' বলে। কোন কোন সময় শুকতারাকে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎকাল পরেও আকাশে দেখা যায়। ইহা সকলেই জানে, যে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে সূর্য্যের তেজ মধ্যাহ্নের ন্যায় প্রখর হয় না, একারণ সূর্য্যোদয়ের পরে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কিছুক্ষণ সূর্য্যালোকের আপেক্ষিক ক্ষীণতা হেতু শুকতারা দিবালোকেও দেখা যাইতে পারে।

প্রদীপ যত স্থির এবং উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকুক না কেন, তাহাকে যতই দূরে গিয়া দেখা যাইবে, ততই ইহা প্রত্যক্ষ হইবে, যে তাহার আলোক ক্রমশঃ একটি জ্যোতিঃ-কণার আকার ধারণ করিয়া মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। আকাশের তারা সকলকেও সেইরূপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়; বস্তুতঃ দূরতাই ইহার একমাত্র কারণ।

সকল তারা সমান উজ্জ্বল দেখায় না। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা আকাশের তারাদিগকে উজ্জ্বলতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল তারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল, তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর তারা কহে; যাহারা তাহা অপেক্ষা অল্প উজ্জ্বল তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা কহে। এইরূপে সাধারণতঃ যত তারা মুক্তনেত্রে দেখা যায়, তাহাদিগকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্র ব্যবহার করিলে আকাশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী তারা দেখা যায় এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগও তদনুসারে অধিক হইয়া থাকে। আবার সকল মানুষের দৃষ্টি শক্তিও সমান নহে; কাহারও দৃষ্টি শক্তি এত তীক্ষ্ণ, যে তাহারা দ্বাদশ শ্রেণীর তারা পর্য্যন্ত মুক্তনেত্রে দেখিতে পায়। একজন জর্ম্মান দেশীয় পণ্ডিত ত্রয়োদশ শ্রেণীর তারা দেখিতে কোন কষ্ট বোধ করিতেন না। 'সাতভাই' নামে একটি তারা মণ্ডল আছে, তাহাতে সচরাচর ছয়টির বেশী তারা সকলে দেখিতে পায় না; কিন্তু ঐ ব্যক্তি ঐ মণ্ডলে চৌদ্দটি তারা অনায়াসে মুক্তনেত্রে দেখিতে পাইতেন। অপরদিকে এমনও লোক আছে, যাহাদের দৃষ্টি শক্তি এত ক্ষীণ, যে তাহারা ষষ্ঠ শ্রেণীর তারা দেখিতে চক্ষে পীড়া বোধ করে।

আকাশে এমন নয়টি তারা আছে যাহারা ঔজ্জ্বল্যে অপর সকল তারা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পরস্পরের তুলনায় তাহাদের দীপ্তি এত বিসদৃশ, যে তাহাদিগকে কিছুতেই এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এ কারণ পণ্ডিতেরা ইহাদিগের কোন শ্রেণী নির্ব্বাচন না করিয়া, ইহাদের নাম 'বিশিষ্ট তারা' রাখিয়াছেন। 'কাল পুরুষ' নামে একটি তারামণ্ডল আছে তাহার পশ্চাদপদপ্রান্তে একটি অত্যুজ্জ্বল তারা দেখা যায়, ইহা বিশিষ্ট তারাদিগের মধ্যে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহার নাম 'লুব্ধক'। হিন্দুদিগের বেদ ও পুরাণে কাল-পুরুষের দুইটি কুকুরের উল্লেখ আছে, এই তারা তাহাদের একটি বলিয়া পরিচিত ছিল। ইয়ুরোপীয় জ্যোতিষেও ইহাকে 'কুকুর' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, আকাশের তারা কিছুতেই গণনা করা যায় না। কিন্তু এক্ষণে পণ্ডিতেরা এক সহজ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তারা গণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যেরূপ 'ফটো' যন্ত্র সাহায্যে মানুষের কিম্বা স্থানের ছবি তোলা হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত আকাশের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের ছবি তুলিয়া তাহাকে একত্রে জুড়িয়া লওয়া হয়; এবং ঐ প্রকাণ্ড ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তারা চিহ্নিত করিয়া তাহা গণনা করিলে সংখ্যা জানা যায়। এই উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যত তারা গণনা করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

বিশিষ্ট তারা—৯
প্রথম শ্রেণী—১৮
দ্বিতীয় শ্রেণী—৭১
তৃতীয় শ্রেণী—২২৯
চতুর্থ শ্রেণী—৭৪১
পঞ্চম শ্রেণী—২১১৮
ষষ্ঠ শ্রেণী—১০৫৪৮
সপ্তম শ্রেণী—২২৫৫৬
অষ্টম শ্রেণী—১০১৯৮৪

আকাশের তারাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন 'মণ্ডলে' বিভক্ত করা হইয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী কিম্বা কোন দ্রব্য বিশেষের আকারে ঐ সকল মণ্ডল কল্পনা করিয়া, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা,—'সপ্তর্ষি মণ্ডল' 'কালপুরুষ' 'মিথুন' 'মেষ', 'কর্কট' 'সিংহ' 'ধনু' 'কুম্ভ' ইত্যাদি।

আকাশের অধিকাংশ তারা সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদয় হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। বস্তুতঃ তাহারা যে দল বান্ধিয়া এইরূপ ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহা নহে; পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তনই ইহার কারণ। যেমন তুমি এক স্থানে দাঁড়াইয়া নিজে নিজে খুব দ্রুত ঘুরিতে থাকিলে তোমার মনে হইবে, যেন তোমার চারিদিকের সব জিনিষ উল্টাদিকে ঘুরিয়া যাইতেছে, আকাশকেও পৃথিবী হইতে সেইরূপ ঘুরিতে দেখা যায়; বস্তুতঃ পৃথিবীর ঘূর্ণনই ইহার কারণ। কিন্তু আকাশের উত্তর ভাগে ধরা সমতল হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে একটি তারা দেখা যায় তাহার কখনও উদয়াস্ত ঘটে না, তাহা নিয়ত এক স্থানে থাকে; ইহাকে 'ধ্রুবতারা' কহে। যেমন তুমি নিজে নিজে ঘুরিবার সময় তোমার মাথার উপর কোন জিনিষের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাইবে যে, তুমি যত দ্রুত ঘুরিতে থাক না কেন, ঐ জিনিষ টিকে ঘুরিতে দেখা যাইবে না; সেইরূপ ধ্রুব তারাকে ঘুরিতে দেখা যায় না বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে পৃথিবী ঐ তারার দিকে মাথা রাখিয়া ঘুরিতেছে। (পৃথিবীর আবার 'মাথা' কোথায়, সে বিষয় অন্য বারে আলোচনা হইবে।) ইহার নিকটে যে সকল তারা আছে তাহাদিগেরও উদয়াস্ত ঘটিতে দেখা যায় না; তাহারা এক অহোরাত্রে একবার ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে, কারণ ইহাদিগকে 'ধ্রুবচর তারা' কহে।

আকাশে এমন কয়েকটি তারা আছে, যাহাদের উপরোক্ত প্রকারের দৈনিক উদয়াস্ত গমন ভিন্ন আর এক প্রকার বিশিষ্ট গতি দেখা যায়। তাহারা এইরূপ, যে চতুঃপার্শ্বস্থ অপর সকল তারার সহিত তাহাদের স্থিতি মিলাইলে দেখা যায় যে তাহারা অল্পে অল্পে স্থান চ্যুত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ গতিশীল তারাগণকে 'গ্রহ' কহে। পূর্ব্বে যে শুকতারার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই জাতীয় একটি গ্রহ। শুকতারা ভিন্ন আর ৪।৫টির বেশী গ্রহ মুক্ত নেত্রে দেখা যায় না। তারা মণ্ডলে গ্রহদিগের যে গতি দেখা যায়, তাহা তাহাদের স্বকীয় গতি।

'গ্রহ' চিনিয়া লইবার আরও এক উপায় আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে তারাগণ দূরস্থিত প্রদীপের ন্যায়

মিট্‌মিট্‌ করিয়া আলোক দিতে থাকে ; কিন্তু যে সকল তারা গ্রহজাতীয়, তাহাদের আলোক মিট্‌মিট্‌ করে না ; বস্তুতঃ তাহারা স্থির ভাবে আলোক প্রদান করে। এইরূপে আলোকের তারতম্য দৃষ্টে গ্রহ চিনিয়া লইতে পারা যায়। গ্রহ ভিন্ন অপর সকল তারাই স্বয়ং তেজোময়, তাহারা নিজ নিজ দেহ হইতে আলোক বিকীরণ করিয়া আকাশে দীপ্তি পাইতে থাকে। কিন্তু গ্রহগণ স্বয়ং তেজোময় নহে ; সূর্য্যের আলোক তাহাদের গাত্রে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হয়, এ কারণ তাহাদিগকে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে বিকীরিত আলোক বহু দূর হইতে আসিলে তাহাকে মিট্‌মিট্‌ করিতে দেখা যায় ; কিন্তু প্রতিফলিত আলোক সেরূপ দেখায় না। ইহার কারণ এখন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই ; তবে পরীক্ষা দ্বারা ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও অনায়াসে গ্রহ চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। দূরবীক্ষণ যত তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহাতে তারাগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুরূপে দেখা যায়, তাহাদের কোন আয়তন প্রত্যক্ষ হয় না ; কিন্তু গ্রহগণকে সাধারণ যে কোন দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলেই তাহাদের সুস্পষ্ট আয়তন দেখা যাইবে।

সমস্ত আকাশ বেষ্টন করিয়া যে একটি প্রশস্ত ধোঁয়ার মতন বলয় দেখা যায়, তাহাকে 'ছায়া পথ' কহে। ছায়া পথ সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার আজগুবি গল্প আছে। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বহু পরীক্ষার ফলে ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন, যে ছায়াপথ অসংখ্য তারার সমষ্টি ; কিন্তু অতি দূরত্ব হেতু তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন জ্যোতিঃ কণার ন্যায় না দেখাইয়া, এক ধারাবাহিক অস্পষ্ট আলোকপথের ন্যায় দেখা যায়। ছায়া পথ আকাশকে এমন ভাবে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের কটিবন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (ছায়া পথ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে ১৩০২ সালের বৈশাখের 'ভারতীতে আমার লিখিত 'ছায়াপথ' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবে।)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

ধাঁধার উত্তর।

গত চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল,—

১। নিতান্ত নির্ব্বোধ যেই শুধু সেই জন,
অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন।

২। প্রদীপের আলো।

নিম্নলিখিত গ্রাহকদ্বয় গত মাসের দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীভগবানচরণ পাহাড়ি, শ্রীমৌলীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

এন্, এন্, দে, শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, শ্রীসুধানলিনী-কান্ত দে, শ্রীহিমাদ্রিকুমার শর্ম্মা, শ্রীসুধীরকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী অমলা দেবী, শ্রীঅজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুমারী নির্ম্মলশশী বসু, শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা।

১। আনিতে গেলাম যারে
দেখে পলাইলাম তারে
কিন্তু সে চলিয়া গেলে
আনি তারে করি কোলে

২। এক শতকে এমন চারি অংশে বিভক্ত কর যে প্রথম অংশের সহিত চারি যোগ করিলে, দ্বিতীয় অংশ হইতে চারি বাদ দিলে তৃতীয় অংশকে চারি দ্বারা পুরণ করিলে এবং চতুর্থ অংশকে চারি দ্বারা ভাগ করিলে ফলে একই হইবে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
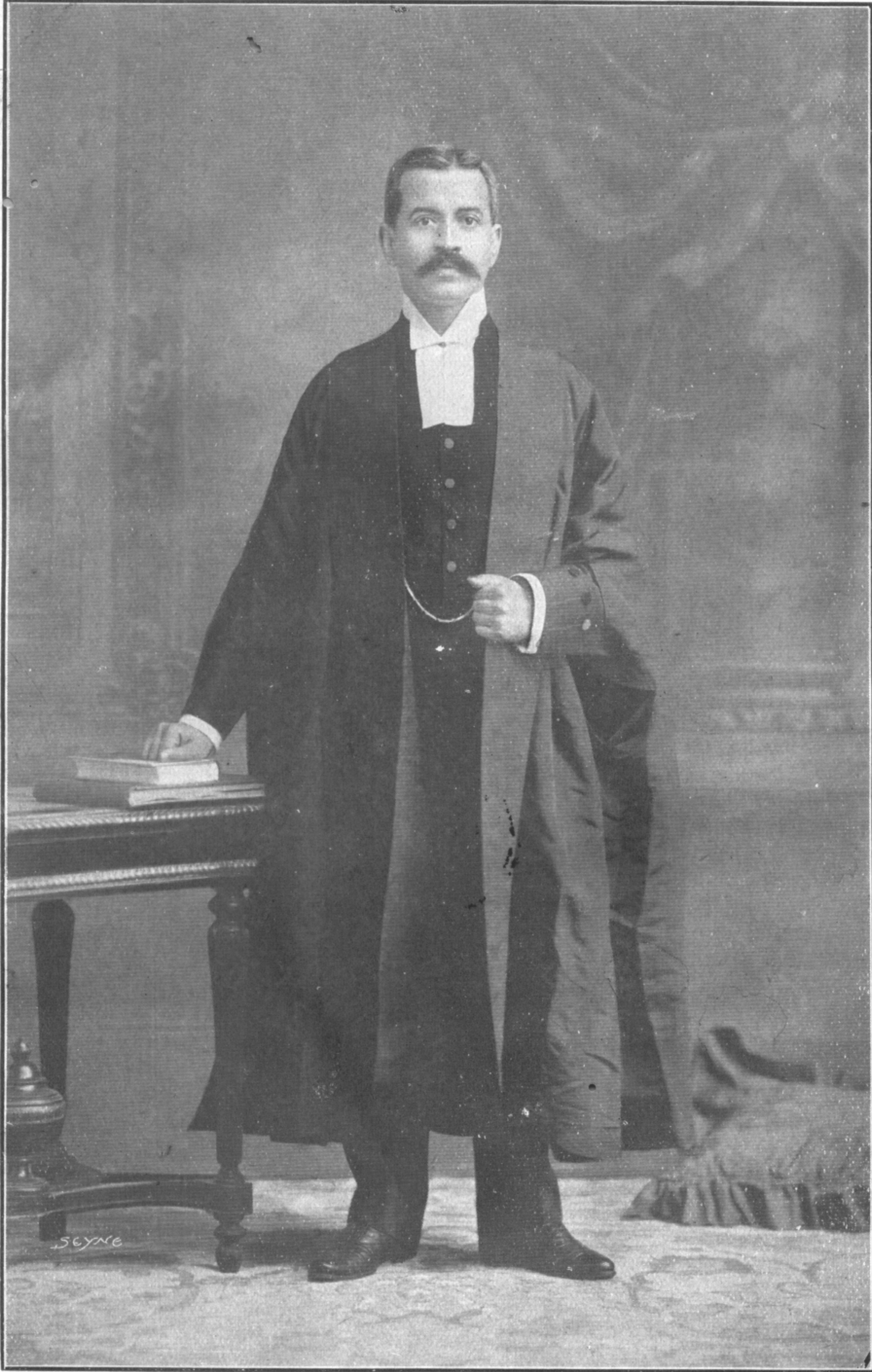
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

মুকুল

১৫শ ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। | ২য় সংখ্যা।

অধ্যবসায়ের পুরস্কার।

সম্প্রতি আমাদের একজন স্বদেশবাসী আমাদের দেশের রাজকার্য্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইজন্য দেশের সকল শ্রেণীর লোক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটী বিশেষ কিছু নহে; তবে বহুদিন হইতে আমাদের দেশের লোকেরা দেশের শাসন কার্য্য হইতে বঞ্চিত ছিল; ক্রমে ক্রমে এখন আবার রাজ-কার্য্যের দ্বার ভারতবাসীগণের জন্য মুক্ত হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসী আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি এবং কার্য্যকুশলতার গুণে কয়েকটী উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ কমিশনার, বোর্ড অব রেভেনিউএর সভ্য প্রভৃতি হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ যে পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ইতিপূর্ব্বে কোনও ভারতবাসী সে পদ লাভ করেন নাই, এবং আমাদের দেশের শাসনপ্রণালীতে সেটী যে অতি উচ্চপদ তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের শাসন ভার যাঁহার হাতে থাকে তাঁহাকে গবর্ণর জেনারল বা রাজপ্রতিনিধি বলা হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। সচরাচর লোক তাঁহাকে বড়লাট বলে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী বা সহযোগী থাকেন। সম্মান এবং ক্ষমতায় বড় লাটের নীচেই তাঁহাদের স্থান। তাঁহারা প্রত্যেকে রাজ কার্য্যের এক এক বিভাগের কর্ত্তা। সকল গুরুতর কার্য্যেই বড়লাটকে তাঁহাদের পরামর্শ লইতে হয়। তাঁহাদিগকে লইয়া বড় লাটের মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। এই সভার নাম কার্য্যনির্ব্বাহক সভা। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এই সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন; তাঁহার হাতে আইন প্রণয়নের ভার থাকিবে। মিষ্টার সিংহ একজন সুদক্ষ আইন ব্যবসায়ী। আমাদের দেশবাসীগণের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভে মিষ্টার সিংহ প্রথম নন। ইতি পূর্ব্বেও অনেক ভারতবাসী আইন ব্যবসায়ে আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহারা যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। আনন্দের বিষয় যে এতদিনে গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের গুণের সমাদর করিতে শিখিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে বড় লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ব্যাপস্থাপক সচিবের পদ প্রদান করিয়া যোগ্যপাত্রে পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে পরোক্ষ ভাবে দেশের অনেক কল্যাণ হইবে। দেশের শাসনকার্য্যে উচ্চপদ সকলের দ্বার আমাদের স্বদেশবাসীগণের পক্ষে বন্ধ থাকাতে তাহাদের প্রতিভা জাগিতেছে না। আমাদের দেশের

লোকেরা যে স্বাভাবিক শক্তিতে অন্য জাতি অপেক্ষা হীন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তবে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে সেই শক্তি ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যতই উচ্চপদ সকলের দ্বার আমাদের দেশের লোকের নিকট মুক্ত হইবে ততই তাহাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিবে, ক্রমে তাহারা বড় হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের উন্নতিতে জাতীয় উন্নতির দ্বার কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আশা করিতে পারিবে যে তাহারা ও এই প্রকার উচ্চপদ লাভ করিতে পারিবে।

আর একটী আশার কথা এই যে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন অসাধারণ প্রতিভা বলে এই উচ্চপদে আরোহন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে। স্বভাবদত্ত সাধারণ বুদ্ধি এবং মেধার সদ্ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে তিনি আপনার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আমরা অধ্যবসায়ের পুরস্কারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ১৮৬৩ সালে বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে একটী ধনী এবং সম্ভ্রান্তবংশে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের বংশে অনেকেই শিক্ষিত এবং কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহ বর্দ্ধমানের সবজজ ছিলেন। তিনি পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষা দিতে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। পুত্রকন্যাগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সর্ব্বকনিষ্ঠ। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাপ্রসন্ন বি এ পরীক্ষা পাশ করিয়া পরিবারের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন শৈশবে মাতার নিকটে থাকিয়া গ্রামস্থ মাইনর স্কুলে পাঠ করেন। মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বীরভূম জেলা স্কুলে প্রবেশ করেন। এখান হইতে ১৮৭৭ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন দশ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রেরিত হন; এবং যথা সময়ে এফ এ পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করেন। বি এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রপ্রসন্নের সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করেন। প্রথমে তাঁহার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বয়স লইয়া গোলমাল হওয়াতে তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আইন অধ্যয়ন করেন এবং যথা সময়ে সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৬ সালে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া মিঃ সিংহ কলিকাতা হাইকোর্টে বারিষ্টারী আরম্ভ করেন। প্রথমে অনেক দিন পর্য্যন্ত বারিষ্টারীতে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। এমন কি শুনিতে পাওয়া যায় যে কলিকাতার খরচ চালাইতে না পারিয়া তিনি কোনও মফস্বল সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময়েআইনব্যবসায়ী কোনও কোনও বন্ধু তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সেই সংকল্প হইতে নিরস্ত করেন। সিটিকলেজের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে আইন অধ্যাপকের পদ প্রদান করেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এই কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমে ব্যবসায়ে তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। বিগত কয়েক বৎসরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টারগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট একবার তাঁহাকে হাইকোর্টের জজের পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত; জজের পদ গ্রহণ করিলে তাঁহার সমূহ ক্ষতি হইত; সেইজন্য তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৯০৬ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বঙ্গদেশের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করেন। ভারতবাসীগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে স্থায়ীভাবে এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপরে গত মার্চ্চমাসে তিনি গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শুনা যায় যে মিষ্টার সিংহ এই পদ গ্রহণের জন্য বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু সম্রাট এডওয়ার্ড স্বয়ং তাঁহাকে এই পদ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন। অর্থাগমের হিসাবে ইহাতে তাঁহার ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আশা করিতেছি ইহাদ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ হইবে। তাঁহার দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আশান্বিত ও উৎসাহিত হইবে।

আহমেদ।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ স্থান মেসেদ নগরে একজন ধার্ম্মিক লোক বাস করতেন, তাঁর নাম আবদুল্লা। তিনি সামান্য সাবান বিক্রী করে দিনাতিপাত করতেন। মেসেদ সহরটি পারস্য রাজ্যের গৌরব। সেখানকার উপাসনা আলয়ের কারুকার্য্য খচিত সোনার গম্বুজ দেখিবার জন্য কত দেশ বিদেশ হতে তীর্থযাত্রী আসত। সারাটি দিন, সেই সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আবদুল্লা সহরময় তার সাবান ফেরি করে বেড়াত, চেঁচিয়ে বলত্ "ভাই সব, আমার বিশুদ্ধ সাবান ক্রয় করো. এমন সুন্দর জিনিশ সহরে আর পাবে না, কচি কচি ছেলে মেয়েরা যদি কথা কইতে পারত তাহলে তারাও একথা স্বীকার করত!" কিন্তু তোমরা কেউ যদি নিরীক্ষণ করে আবদুল্লার সাবান দেখ্‌তে তাহলে কখনই তাকে সাবান বলে বুঝতে পারতে না, রং একেবারে কালো আর এমনি শক্ত যে তাকে সাবান মনে না হয়ে একখণ্ড পোড়া কাঠ বলে ভুল হ'ত। যদি কোন দুর্ভাগা যাত্রী এ সাবান ব্যবহার করত তাহলে তার হাত মুখ আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা করত। কিন্তু এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত না, কেন না পারস্যবাসীরা স্নান কিম্বা কাপড় ধোবার জন্যে কচিৎ সাবান ব্যবহার করে; আর বাসন পরিষ্কার করবার জন্যে আমাদেরি মত ছাই সুরকিতে কাজ চালায়, কাঁচের বাসন নয় যে সাবান দিয়ে ধোবে। তাই প্রায়ই বেচারী আবদুল্লা খালি হাতে বাড়ী ফিরত। ছেলেটির আর নিজের উদরান্ন সংস্থানের মত সামান্য গুটিকত পয়সাও উপার্জ্জন হত না। সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ণ মনে তার ভাঙা কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করে হাঁটুর ভিতর মাথাটি গুঁজে বসে থাক্‌ত। তার একমাত্র ছেলে আহমেদ যে ক্ষুধায় কাতর শুষ্ক মুখে বসে আছে, আর বাপের কষ্ট হবে বলে প্রাণপণে কান্না থামিয়ে রাখছে এ দৃশ্য সে চোখে দেখ্‌তে পারত না। আহমেদের বয়স যখন দশ বৎসর তখন সে নিজের কষ্টের কথা কিছু না মনে করে বাপকেই সান্ত্বনা দিত; বল্‌ত, ইনসাল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়—তাহলে কাল তুমি এই সমস্ত সপ্তাহের চেয়ে বেশী সাবান বিক্রী করতে পারবে। আবদুল্লাও আহমেদের প্রফুল্ল সুন্দর মুখে উজ্জ্বল বিশ্বাসের আলোক দেখে আশ্বস্ত হতেন - তিনি ও প্রার্থনা করতেন, "আহা তাই যেন হয়!"

কিন্তু যতই সময় চলে যেতে লাগ্‌ল, অবস্থা ততই শোচনীয় হল—তার যে কোন পরিবর্ত্তন হতে পারে এমন আশাও রইল না। এমন সময় ছোট্ট আহমেদের জীবনে মস্ত একটি ঘটনা ঘটল্। আহমেদ পাঠশালায় যাচ্ছিল, পথর রোদে শ্রান্ত হয়ে নদীর ধারে একটি গাছের ছায়ায় কিছু ক্ষণের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এই নদীটি মেসেদ নগরের ঠিক্ মাঝখানটি দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তার পাশে প্রশস্ত রাজপথ, দুধারে ছায়া করা গাছের সারি। মেয়েরা সেই নদী হতে জল নিয়ে যাচ্ছিল, কেউ বা কাপড় ধুচ্ছিল, এক সার উট সেখানে জল খাচ্ছিল, আর কতকগুলি গাধা মহা উৎসাহে জলের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। রংরেজরা কাপড় রঙিয়ে নিংড়ে শুকতে দেবার জন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, আর নদীতে নানা রংএর ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। একজন ফকীর একটা সিংহকে শিকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল আহমেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। এমন সময় রাজ বাড়ীর দরওয়ানরা চারিদিক হতে দৌড়ে এল, তাদের মাথায় বড় বড় জরীর টুপি; হাতে রূপার লম্বা লম্বা লাঠী, পরণে লাল মখমলের উপর জরির কাজকরা পোষাক; তাদের দেখলে এক একটি যুবরাজ বলে ভুল হয়। দৌড়ে এসে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌ল—রাজাধিরাজ আসছেন! তোমরা সবাই সরে যাও মুখ ফিরে দাঁড়াও! রাজাধিরাজ একটি তেজী, অতি সুন্দর, শাদা আরবী ঘোড়ার উপর চড়ে যাচ্ছিলেন—তাঁর চারি দিক ঘিরে আরো অনেকগুলি অশ্ব সৈনিক ছিল। তাঁরা যাবার পর, তাঁদের পিছন পিছন একখানি সোনার পাল্কী এল—আর আহমেদ যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারি পাশে এসে বেহারারা পাল্কী নামাল, পাল্কী হতে একজন মেয়ে নেমে এলেন, ঘোমটায় তাঁর মুখ ঢাকা; কিন্তু বহুমূল্য পরিচ্ছদ দেখে মনেহল তিনি

খুবই বড় ঘরের মেয়ে। তিনিই রাজ কন্যা, সম্মুখে স্বর্ণকারের দোকানে কতকগুলি রূপার কাজ করা বাক্স কৌটা দেখিবার জন্যে নেমে ছিলেন। এমন সময় চারি দিকে একটা মহা গোলযোগ আরম্ভ হল—এবলে পালাও, ওবলে মাগো কোথা যাব; কেহ বলে বাবাগো আমি মলাম। চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি, কান্না কাটা পড়ে গেল—ফকির সাহেবের সেই সিংহটি শিকল ছিঁড়ে পাগলের মত ছুটে চলেছে, যাকে সম্মুখে পাচ্ছে তাকে থাবা মেরে পেড়ে ফেলছে, কারো বা বুকের উপর চড়ে বস্ছে—কাকেও বা চিরে ফেলছে! চারিদিকে আর্ত্তনাদ শোনা যেতে লাগ্‌ল—মেয়েদের মূর্চ্ছা হল, পুরুষরা চারিদিকে ছুটে পালাতে লাগ্‌লেন—আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কোথায় যাবে কি করবে কিছু বুঝতে না পেয়ে এক জায়গায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে কাতর ভাবে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—কেউ বা নদীর জলে ঝাঁপ দিলেন—ভয় পেয়ে কতকগুলো ঘোড়া চেঁচাতে চেঁচাতে ল্যাজ তুলে কাণ খাড়া করে একেবারে সেই ভিড়ের মধ্যে দড় বড় করে দৌড়ে বেড়াতে লাগলো। কাণ্ডখানা কি রকম হয়েছিল তা তোমরা একটু কল্পনা করে দেখ! মহা হুঙ্কার ছেড়ে হঠাৎ এসে সিংহটা রাজ কুমারীর গায়ের উপর পড়ল, কিন্তু কোন হানি করবার আগেই, আহমেদ চকিতের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে সেই স্যাঁকরা-দোকান হতে একটা লৌহদণ্ড তুলে নিয়ে আগুণে তপ্ত একেবারে আগুনের মত রাঙা দিকটা সিংহের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে। তখন যন্ত্রণায় গর্জ্জন করতে করতে সিংহটাতো রাজকুমারীকে ছেড়ে দিয়ে বাজারের দিকে ছুটে পালাল। সেখানে গিয়ে অনেক অনিষ্ট অত্যাচার করেছিল। আকস্মিক এই মহা আতঙ্ক হতে একটু সামলে উঠে রাজ কুমারী আহমেদকে তাঁর কাছে ডাকলেন, আর মুখের ঘোমটা খুলে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন, তার সাহসও উপস্থিত বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করলেন আর তাকে একটি সোনার মোহরভরা থলি দিতে চাকরদের আজ্ঞা করলেন। ছোট্ট আহমেদ তার জীবনে এমন সুন্দর মানুষ আর কখনো দেখেনি, সে এম্নি অবাক হয়ে গিয়েছিল যে রাজকুমারীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি কথাও বলতে পারল না, যখন সে কথা বুঝল তখন দেখ্‌ল তাঁরা অনেক দূর চলে গিয়েছেন।

এই সোনার থলির টাকা ফুরিয়ে গেলে আহমেদদের আবার সেই পূর্ব্বের কষ্টের অবস্থা হল। একজন য়িহুদী বণিকের মুখে, রাজধানীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের খুব সুবিধা শুনে আবদুল্লা সেইখানে যাওয়াই স্থির করলে—যদিও রাজধানী বহু দূরপথ, পথে বিপদ ও অনেক তবু সেইখানে যাওয়াই স্থির হল। আহমেদ বল্লে এসহরে এত কষ্টে বেঁচে থাকার চেয়ে, পথে মরুভূমে পড়ে মরাও ভাল! পথে তাদের কতকি ঘটনা ঘটল সে সব কথা বল্‌তে গেলে অনেক সময় লাগ্‌বে, গল্পও অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে—তাই সে কথা থাক্। তারা কখনো পাহাড়ের উপরকার আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে, কখনো মরু ভূমির তপ্ত বালুকার উপর অতি কষ্টে, শ্রান্ত শরীরে, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে কোন রকমে অগ্রসর হত—মনের ভিতর সর্ব্বদাই ভয় কখন্ না জানি মানুষ-ধরা ডাকাতেরা এসে তাদের বন্দী করে নিয়ে যায়! সে সময় অসাধারণ গ্রীষ্ম, তাছাড়া ডাকাতের ভয়ে তারা রাতের বেলা হাঁটত, আর সকাল বেলায় কোন অতিথি শালায় আশ্রয় নিত, সেখানে আহমেদ অল্প, স্বল্প কাজ করত, তারি প্রতিদানে সেখানকার কর্ত্তা তাদের সামান্য কিছু খেতে দিতেন।

এক দিন রাতে তারা লবণ নদীর সাঁকো খুঁজে বেড়াচ্ছে, এমন সময় আকাশ ঘিরে ঘন কালো মেঘ দেখা দিল, মূষল ধারে বৃষ্টি পড়তে লাগ্‌ল, নদীতে বাণ এসে দু কূল ভেসে গেল। তখন চাঁদ উঠা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করে থাকা ভিন্ন আর কোন উপায় রইল না। দুরন্ত ঝড়ে তাদের অস্থির করে তুললে, বৃষ্টিতে তাদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেল, তারা অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে হিংস্র জন্তুর ভয়ে কাতর হচ্ছিল। কিছুক্ষণের জন্যে হঠাৎ ঝড় থেমে গেল, তখন সেই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কার আর্ত্তস্বর শোনা গেল। আবদুল্লা ছেলেকে বল্লে একেবারে মড়ার মত স্থির হয়ে থাকো, মরুভূমির মহা

বৃদ্ধের স্বর শোনা যাচ্ছে, এর হাতে পড়লে আর নিস্তার নাই। কিন্তু আহমেদ জীবনে এই মহাবৃদ্ধের কথা কিছুই শোনেনি, তাই তার কোনই ভয় হল না, বাপের মানা সত্বেও সে উঠে যে দিক হতে সেই কাতর শব্দ আসছিল সেই দিকে গেল। যেম্নি সেখানে উপস্থিত হ'ল অম্নি মেঘের মাঝ হতে চন্দ্র দেখা দিলেন, তাঁর আলোকে চারি দিক স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌ল—আহমেদ দেখলে এক খানা ছেঁড়া বাঘ ছাল গায়ে দিয়ে বুড়ো একজন ফকির শুয়ে আছেন, তার বিছানার পাশে লোহার কাঁটা দেওয়া একখানি বড় লাঠি আর একটি কমণ্ডলু পড়ে আছে। আহমেদকে দেখে বৃদ্ধ কাতর স্বরে বল্লেন, মহম্মদ তোমার মঙ্গল করবেন, তুমি আমাকে একটু জল খেতে দাও, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আহমেদ তাড়া তাড়ি গিয়ে নদী হতে কলসী পূর্ণ করে নিয়ে এসে তাঁকে খেতে দিলেন—যদিও লবণ নদীর জল বলে জলটা তেমন সুস্বাদু ছিল না তবুও পিপাসার শান্তি হ'ল। একটু সুস্থ হয়ে সেই ফকির বল্লেন, আমার নাম আলি দর্ব্বেশ, পারস্য দেশের সকল লোকেই আমাকে জানে। দুমাস মাজান্দারান ছেড়ে আমি মেসেদ যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু কাল হতে আমার জ্বর হয়েছে, এই তিনবার আমার জ্বর হল, বাছা তুমি জান বোধ হয় এরকম জ্বর উপরি উপরি তিনবার হ'লে কেউ রক্ষা পায় না, রাতের শেষ ভাগে অন্ধকার যখন যাব যাব করবে সেই সময় আমাকেও এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। আমার আত্মা যখন মৃত্যুর পরপারে চলে যাবে তখন তুমি আমার গলায় বাঁধা ছোট্ট এই থলিটি খুলে নিও, এর মধ্যে তুমি স্ফটিকের একটি পেয়ালা পাবে, এইটি যদি তুমি ঠিক্ মত ব্যবহার করতে পার তাহলে তোমার অসাধারণ ক্ষমতা লাভ হবে। প্রতি দিন ভোরে এই পেয়ালাটিতে এক বিন্দু পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল রেখে তারি দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকো, তাহলে তোমার কিম্বা তোমার প্রিয় আত্মীয় স্বজনের কোনও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকেত সেটা জানতে পারবে আর যদি"—ফকিরের কথা শেষ হতে না হতে তাঁর শরীর হতে সমস্ত বল চলে গেল, তাঁর ঘাড় নুয়ে পড়ল, তিনি ইহ লোক ছেড়ে গেলেন।

আহমেদ তাঁর কথা মত সেই থলি আর তার মধ্যে স্ফটিকের একটি অতি সুন্দর পেয়ালা পেলে, তখন তার বাপের কাছে ফিরে এসে তাঁকে সব কথা বল্লে। এর পর কদিন ধরে প্রত্যেক সকাল বেলা সে সেই ফকির সাহেবের কথামত পেয়ালায় একটু জল দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকৃত—কিন্তু কিছু না দেখ্‌তে পাওয়াতে সে অভ্যাস ছেড়ে দিলে। কিন্তু এরি দিনকত পরে এক দিন হঠাৎ ভয়ানক ধূলি ঝড় এল, সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, সূর্যদেবকে কেউ যেন আকাশ হতে মুছে-ফেললে, কোথাও তাঁর একটি কিরণ রেখাও দেখা গেল না, দুরন্ত ঝড়ে আশ্রয় হীন মরুভূমির মধ্যে ধূলো আর ছোট ছোট কঙ্করের আঘাতে তাদের এত যন্ত্রণা হতে লাগল যে তারা এক একবার চীৎকার করে না কেঁদে থাকৃতে পারল না। ভয়ে কষ্টে তারা যে এদিক সেদিক ছুটো ছুটি করে বেড়াবে তার আর বিচিত্র কি? কয়েক ঘণ্টার অসহ্য যন্ত্রণার পর ঝড় যখন থেমে গেল তখন পিতা পুত্র কেউ আর কাউকে খুঁজে পেলে না। মরুভূমির মধ্যে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সেখানে আহারের সংস্থান কিছু নেই; এমন কি পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও একফোঁটা জলও পাবার আশা নেই। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আহমেদ চলতে লাগ্‌ল। স্বপ্ন বিহ্বল মানুষ যেমন ভাবে যায় সেও সেই ভাবে চলতে লাগল। কতবার ঝোপ ঝাড়ে পা বেধে সে পড়ে যেতে লাগল; কতবার পাহাড়ে পাথরে পায়ে লেগে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগ্‌ল। তবু প্রাণপণ করে সে এগোতে লাগল, কিন্তু একদিন এমন হল যে সে আর চলতে পারল না, তখন মরুভূমির সেই তপ্ত বালুকার উপর মরবার জন্যে সে শুয়ে পড়ল। সেইখানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিল কিছু বুঝতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখল একজন বুড়ো মানুষ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলছেন—ওমা এ যে আমাদের ছোট্ট আহমেদ, আবদুল্লা সাবান

ওয়ালার ছেলে! হাঁরে আহমেদ তুই আমাকে চিন্‌তে পারছিসনে, আমি যে তোর জেঠা মশায়; পথ হারিয়ে গিয়েছে বলে কাঁদিসনে—আমার সঙ্গে আয় আমি তোর বাবাকে খুঁজে দেব।" আহমেদ আশ্চর্য্যি হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল কেন তার বাবা কখনো এঁর কথা কিছু বলেন নি। তবু সে কথা মুখে কিছু না বলে, এই নতুন-পাওয়া জেঠার হাত ধরে যেতে লাগল। ক্রোশের পর ক্রোশ কতদূর গেল তবুতো তার বাবাকে পাওয়া গেল না। তখন সে মাটীতে বসে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল, আর বল্‌তে লাগল, "আর যে আমি পারিনে।" সেই বুড়ো লোকটি বল্‌তে লাগলেন "আচ্ছা বাছা আর গিয়ে কাজ নেই, তুমি বড় শ্রান্ত হয়েছ, এই খানে শুয়ে ঘুমোও, আমি তোমার শিয়রে জেগে বসে থাক্‌ব।"

আহমেদের চোখ ঘুমে যেম্নি বুজে আসছে, এমন সময় সেই বুড়ো একটু সরে বসলেন—আহমেদ দেখলে তাঁর মুখ যদিও মানুষের মত কিন্তু পা দুখানি নর কঙ্কালের মত; সে ভয়ে "ভূত ভূত" বলে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, আর সেই নর-রক্ত-পিপাসু পিশাচটী আস্তে আস্তে তার বুকের কাপড় সরিয়ে রক্ত শুষে খাবার উদ্যোগ করতে লাগল।

আহমেদ যখন চীৎকার করে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ই আর একটি বড় মিষ্টি গলার স্বর শোনা গিয়েছিল—আর একটু পরেই একটি পরীর মত সুন্দর মেয়ে এক গাছি সোনার দানা মালা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখবামাত্র সেই বুড়োটি বাঘের সামনে হরিণ যেমন ছুটে পালায় তেম্নি বেগে পালিয়ে গেল। কেন না সোনার কোন জিনিশ দেখলে এদের অনিষ্ট করবার কোন শক্তি আর থাকে না। আহমেদকে কে রক্ষা করলে? আর কেউ নয়—সেই পারস্য রাজ কন্যা, মেসেদ নগরে সিংহের মুখ হতে আহমেদ যাঁর জীবন একবার রক্ষা করেছিল! পারস্য-রাজ তীর্থ স্থান হতে ফিরে যাচ্ছিলেন—সঙ্গে রাজকুমারীও ছিলেন, দাস দাসীদের ভয় দেখাবার জন্যে তিনি একা একা বেড়াতে পালিয়ে এসে ছিলেন, সেই খানে আহমেদকে খুঁজে পেলেন। তাঁর অনুরোধে পারস্য রাজ আহমেদকে একটি চাকরি দিলেন, তাঁরা সকলে রাজধানী মুখে যাত্রা করলেন—পথে আহমেদের বাপের সঙ্গেও দেখা হল।

কাজভীন পর্ব্বতের কাছে, মেসেদ হতে প্রায় তিন দিনের পথে, একজন বৃদ্ধ বাস করত, তাকে সকলে পর্ব্বতের বৃদ্ধ কিম্বা দস্যুরাজ বলে জান্‌তো। তার অধীনে একদল দস্যু ছিল। এই দস্যুরা বৃদ্ধকে এমন মান্য করত ও ভালবাস্‌ত যে তার আজ্ঞায় প্রাণ বিসর্জ্জন করতে কিম্বা কারো প্রাণ নিতে তারা কিছুমাত্র দ্বিধা করত না। যখন সে শুন্‌লে তার দস্যু দলকে ধ্বংস করবার জন্যে পারস্য রাজ সৈন্য সংগ্রহ করছেন তখন তার ভয়ানক রাগ হল। তার অধীন একজন দস্যুকে বল্লে যাও পারস্য অধিপতির প্রাণ নিয়ে এস। সে আর দ্বিরুক্তি না করে, তখনি একখানি রুটি, একবোতল পাণীয় জল আর একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা নিয়ে যাত্রা করল। আহমেদ মরুভূমির সেই রক্ত শোষক পিশাচের হাত হতে রক্ষা পাবার পর হতে প্রতিদিন সকালে সেই স্ফটিকের পেয়ালায় এক বিন্দু জল রেখে দেখ্‌ত। অনেক দিন কিছু দেখ্‌তে পায়নি, একদিন দেখ্‌লে পারস্য রাজ ঘুমিয়ে আছেন আর তাঁর পাশে একজন দস্যু তাঁকে আঘাত করবার জন্যে তীক্ষ্ণ ছুরিকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখে সে তাড়াতাড়ি মহারাজার কাছে গিয়ে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা জানালে। তিনি তার কথা বিশ্বাস না করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন তাওকি কখনও হয়, আমার দেহরক্ষক সৈনিকেরা খুব বিশ্বাসী, তারা থাক্‌তে আমার কোন বিপদ ঘটতে পারবে না। আহমেদ তবুও খুব সাবধানে পাহারা দিতে লাগ্‌ল। অন্ধকার রাত্রি এল, মহারাজার দেহ রক্ষক সৈন্যেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল—কোথাও আর কিছু সাড়া শব্দ রইল না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল তবু কিছুই দেখতে না পেয়ে শ্রান্ত হয়ে আহমেদ ও শুতে যাবে মনে করছে, এমন সময় সে দেখ্‌তে পেলে কে যেন আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে যে ঘরে মহারাজা ঘুমিয়ে ছিলেন সেই দিকে চলেছে। সে নিঃশব্দে মহারাজার

ঘরে প্রবেশ কর্‌ল ; আহমেদও তখনি সেই ঘরের ভিতর লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, তাকে ধরে ফেলে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে তখন রাজ প্রাসাদের সবাই জেগে গেল, আর চারি দিক হতে অসংখ্য লোক এসে জড় হল। এই রকম করে একবার নয় দুবার নয়, অনেক বার দস্যুরা একে একে এসে অকৃতকার্য্য হয়ে বন্দী হল, তখন সেই দস্যুপতি তাঁর দলের মধ্যে যে সব চেয়ে চতুর, সাহসী ও বলবান তাকেই পাঠিয়ে দিলেন ; কিন্তু আহমেদের স্ফটিক পাত্রের গুণে মহারাজের কোনই বিপদ ঘটল না।

তখন মহারাজা আহমেদকে ডেকে বল্‌লেন, একবার নয়, দুবার নয়, বহুবার তুমি নিজের জীবন উপেক্ষা করে আমার জীবন রক্ষা করেছ : আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, আমার সাধ্যমত তুমি যা কিছু প্রার্থনা করবে আমি তাই তোমাকে দেব। আহমেদ অতি বিনীত ভাবে তাঁকে বল্লে, রাজাধিরাজ এ দাস ধন রত্ন কিছুই প্রার্থনা করে না, যদি দয়া করে আপনার কন্যা তাকে দান করেন তবেই সে কৃতার্থ হয়। মহারাজা উত্তর করলেন রাজকুমারী যদি তোমাকে ভালবাসে তাহলে আমার কোনই অমত হবে না। রাজকন্যা আহমেদের সাহস ও সততার জন্যে তাকে অনেক আগে হতেই ভালবেসে ছিলেন। তাঁহাদের দুজনের বিবাহ হ'ল, মহারাজ জামতাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিলেন। *

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভুক্তভোগীর পত্র।

পরম রক্ত পিপাসু
অযুত মশক সম্প্রদায়
বহুলহুলধরেষু

১

ক্ষুদ্র তুমি, রুদ্র তুমি, মশা মহাশয়,
শোন গো, আমার নিবেদন সবিনয়।
বল মোরা তব কাছে কি করেছি দোষ ?
মানব জাতির প্রতি কেন এত রোষ ?

২

পুকুরে তোমার জন্ম শুনিবারে পাই,
সেখানে কি পানাহার মেলেনাকো ভাই ?
ডাঙ্গার জীবেরে কেন কর আক্রমণ ?
গায়ে পড়ে' কর কেন শোণিত শোষণ ?

৩

আমাদের রক্ত যদি এতই সুখাদ্য,
না হয় করিয়া দিব তোমায় বরাদ্দ।
দিনান্তে ছটাক লহ, কিন্তু অত্যাচার
কর না রাতের বেলা, দোহাই তোমার !

৪

ভন্ ভন্ রবে যবে আসি দলে দলে,
কামড় বসাও তুমি, অঙ্গ যায় জ্বলে' !
তীক্ষ্ণ তব হুল তার চিহ্ন রাখি যায়
রক্তচন্দনের ফোঁটা যেন সর্ব্ব গায়॥

৫

অতি সূক্ষ্ম মশারি যে, সেও মানে হার,
ছিদ্রান্বেষী তোমা সম আছে কেবা আর ?
ঘুমন্ত শত্রুরে একা পেয়ে অন্ধকারে,
সসৈন্যে যে ঘাড়ে পড়ে, ধিক্ ধিক্ তারে !

৬

কেমনে মারিব তোরে ভাবিয়া না পাই,
কামান পাতিলে লজ্জা, কোন ফল নাই।
চাপড় মারিতে গেলে গালে লাগে চড়,
অসম এ যুদ্ধে মোরা নিরুপায় বড়॥

৭

হায় হায়, কোন্ যুগে জন্মিবে সে জন,
যে করিবে মশাহীন ভারত ভুবন !
যাহার কৃপায় ঘুম পাড়ানিয়া মাসী
শিয়রে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াবেন আসি॥

৮

নিদ্রা বড় সুকুমার, নিদ্রা মধুভরা,
নিদ্রা শান্তিময়ী মাতা ক্লান্তিদুঃখহরা,
সে নিদ্রার হন্তা তুমি, ওরেরে জল্লাদ,
সবংশে নির্ব্বংশ হও, করি আশীর্ব্বাদ !

শ্রীইন্দিরা দেবী।

---

* Books for the Bairns হইতে সংগৃহীত।

টক্ টক্ টক্।

তোমরা সকলেই ঘড়ি দেখিয়াছ। ঘড়িতে যে টক্ টক্ করিয়া শব্দ হয়, তাহা শুনিয়াছ। এই টক্ টক্ শব্দ গুলিতে সেকেণ্ড বুঝায়। একবার টক্ শব্দ করিলে এক সেকেণ্ড হয়। ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, এইরূপ ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা হইয়া থাকে। তোমরা মিনিট কাহাকে বলে জানিলেও অনেকেই মিনিটের মূল্য জান না। আজ তোমাদিগকে সেই বিষয় বলিব।

মিনিটগুলি খুব সামান্য বোধ হইলেও ইহার মূল্য সামান্য নহে। দেখ, মিনিটের সমষ্টিতে ঘণ্টা হয়; ঘণ্টার সমষ্টিতে দিন হয়; দিনের সমষ্টিতে মাস হয়; মাসের সমষ্টিতে বৎসর হয়; আবার এক শত বৎসরে শতাব্দী হয় এবং শতাব্দীতে অনবধারণীয় সময় স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র। কিন্তু সমুদ্র জলের পরিমাণ করা দুঃসাধ্য।

আমরা অনেকেই মিনিটকে সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, কিন্তু বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে এই ক্ষুদ্র হইতে মানবের পরিমিত জীবনের কত মহৎ ও হিতকরী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তুমি আমি প্রত্যেক দিন কতটা সময় বৃথা নষ্ট করি। যদি আমরা হিসাব করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের এই পরিমিত জীবন হইতে কতকটা সময় এইরূপে অপব্যয় হইয়া যায়। শৈশবে অনেকেই সময়ের মূল্য বিষয়ে অমনোযোগী থাকে। শৈশবে যাহা অভ্যাস হয়, পরিণত বয়সে সেই পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে! কাঁচা মাটীতে যে দাগ কাটা যায়, তাহা অগ্নিদগ্ধ হইলে আর মুছিয়া ফেলা যায় না। শেষ বয়সে অনেকেই যখন জীবনের কথা চিন্তা করিতে বসে, তখন বিগত জীবনে সময়ের বৃথা ব্যয়ের কথা মনে পড়িয়া দুঃখে দগ্ধ হইতে থাকে।

কয়েকটী উদাহরণ দিয়া এই বিষয়ের গুরুত্ব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব।

শৈশবে আমি কোনও কার্য্যই উপযুক্ত সময়ে শেষ করিয়া উঠিতে পারিতাম না। তাই, পাঠশালায় গুরু মহাশয় ও স্কুলে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট কত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি। পিতা মাতাও যথেষ্ট তাড়না করিয়াছেন। বাল্যকালে পিতামাতার নিকট অনেক সময় এজন্য প্রহার পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছে। বড় হইয়াও কত কষ্ট কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই এই অভ্যাসটী পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যে বার আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই সেই বৎসর আমার পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের বৃহৎ পরিবারের আমি এক মাত্র পুরুষ অভিভাবক হইলাম। আমাদের এক খানি পৈতৃক তালুক ছিল। তাহাতে যাহা আয় হইত, তাহাতেই আমাদের পরিবারের ভরণ পোষণ দুঃখে কষ্টে চলিয়া যাইত। আমাদের গ্রাম হইতে জেলা বহু দূরে। তালুকের রাজস্ব জেলায় গিয়া নির্দ্ধারিত দিন ও সময়ের মধ্যে দিতে হইত। এক বার শেষ কিস্তির লাটের খাজনা দিতে যাইবার সময় তিন মিনিটের জন্য ট্রেন হারাইলাম। জেলায় গিয়া উপস্থিত হইয়া, দেখি, আমি যাইবার পূর্ব্বেই আমাদের তালুক খানি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গিয়াছে। সে অনেক দিনের কথা। তখন একবার লাটের খাজনা বাকি পড়িবার জন্য সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেলে এখনকার মত আর তাহা পুনরুদ্ধার করা যাইত না। সময়ে উপস্থিত হইতে না জানিয়া আমরা একদিনে সম্বলহীন পথের ফকির হইলাম।

কিছু দিন পূর্ব্বে অল্প বিদ্যায় উত্তম কর্ম্মপ্রাপ্তি এখনকার মত এতদূর কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য ছিল না। আমি দুই বার একটি প্রতিযোগী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু দুইবারই পরীক্ষা গৃহীত হইবার নির্দ্ধারিত সময়ের কিঞ্চিৎ বিলম্বে যাইয়া উপস্থিত হই। বলা বাহুল্য, ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয়।

একখানি ডাউন ট্রেন সবেগে ষ্টেশনে আসিতেছিল; অনতিদূরে ষ্টেশন। ষ্টেশনের নিকট একটা বাঁক ছিল। এই বাঁক ছাড়াইলেই ষ্টেশন। এই ট্রেন খানির পথে অল্প বিলম্ব হইয়াছিল। এই সময় আপ্‌ট্রেন নিয়মিত

সময় পর্য্যন্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই বাঁকা পথ ছাড়াইলেই ট্রেন দুইখানি নিরাপদে তাহাদের গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতে পারে। দুর্ভাগ্য ক্রমে দুইখানি ট্রেনই পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ট্রেন দুইখানি সবেগে যাইতেছিল। বেগ থামাইতে থামাইতে ট্রেনেট্রেনে সংঘর্ষ হইল। উভয় ট্রেনের গাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল ও আরোহীগণ মৃত্যু মুখে পতিত হইল। তিন মিনিটের বিলম্বে মনোহরপুরের এই রেল সংঘর্ষের লোমাঞ্চকর কাহিনী প্রাচীনেরা অবসর সময়ে গল্প করিয়া এখনও শ্রোতৃমণ্ডলীর যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকেন।

একবার একজনের নরহত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই ব্যক্তি কোনও গুরুতর উত্তেজনা বশে এইরূপ ভয়ানক কাণ্ড করে। জনসাধারণ এই হতভাগ্যের প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের প্রার্থনা জানাইয়া বড় লাটের করুণা ভিক্ষা করিয়া এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করে। সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে আবেদনের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু হতভাগ্যের চরম দণ্ডের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না। হতভাগ্যের জীবন শেষ হইবার পাঁচ মিনিট পরে সংবাদ আসিল, লাট সাহেব দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের অদেশ রহিত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন। তখন এ আদেশ অনুযায়ী কার্য্য হইবার আর অবসর ছিল না।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাশিদিগের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এক দিকে মহাবীর নেপোলিয়ন অপর পক্ষে সমগ্র ইংরাজ ও প্রুসিয়ান জাতি। আট ঘণ্টা ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধে দলে দলে উভয় পক্ষের সৈন্য হত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই অবিশ্রান্ত যুদ্ধে নিস্তেজ ও হীন বল হইয়া পড়িতেছিল। অপরাহ্নে ইংরাজ পক্ষে নব সংগৃহীত কতকগুলি সৈন্য আসিয়া যোগ দান করিলে তাহাদের প্রাণে নব বল সঞ্চারিত হইল। ইংরাজেরা দ্বিগুণ উৎসাহে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ফরাশি পক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে দেশীয় সৈন্য সংগ্রহ কার্য্য চলিতে লাগিল। যদি এই নব সংগৃহীত সৈন্যদল ফরাশিদিগের সহিত উপযুক্ত সময়ে যোগদান করিতে পারিত, তাহা হইলে আজ সভ্য জগতের ইতিহাস অন্যরূপ হইয়া যাইত। সংগৃহীত সৈন্যবলের অপেক্ষা না করিয়া ব্যগ্র মহাবীর নেপোলিয়ন উপযুক্ত সময়ে এই নব সংগৃহীত সৈন্যদল তদীয় পক্ষে যোগদান করিবে এইরূপ মনে নিশ্চয় করিয়া আপনার reserve দলকে বিপক্ষ সৈন্যদল আক্রমণের আদেশ প্রদান করেন। নেপোলিয়নের I perial Guard পরাজিত হইল। অদ্বিতীয় মহাবীর নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দীভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন। কেন এ বিপর্য্যয় ঘটিল তোমরা শুনিবে? মহাবীর নেপোলিয়নের একজন মার্শেলের আসিতে পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইয়াছিল!

শ্রীঅজিতপ্রসাদ সান্যাল।

ধ্রুব-উপাখ্যান।

শিশু ধ্রুব ও আশ্রমবাসিনী জননী।

১

নিবিড় অরণ্য তাহে মুনির আশ্রম,
সুনীতি নিয়ত কাঁদে ধ্রুব করি বুকে,
মুনি-পত্নী নিশিদিন করে উপশম,
অজ্ঞান সে শিশু ধ্রুব হাসে খেলে সুখে।

২

প্রশান্ত স্বর্গের শোভা পুলকে নয়ন,
নাহি জানে কোনকালে কুটিল ভাবনা;
মুনি পুত্রগণ সহ খেলে অনুক্ষণ,
বিশ্বের কিছুরি হায় রাখেনা কামনা!

৩

জনক উত্তানপাদ কোথা নাহি জানে,
হায় নাহি জানে কেন মুনির আশ্রমে,
কিংবা অশ্রু ঝরে কেন মায়ের নয়নে,
কোন্ দুঃখ স্রোত বহে তাঁহার মরমে।

৪

যখন বালক ধ্রুব খেলিবার তরে,
বাহিরিত জননীরে একাকী ফেলিয়া ;
হায়রে ! জননী-প্রাণ কতই কাতরে,
পথপানে এক দৃষ্টে রহিত চাহিয়া।

৫

একদিন ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান,
সূর্য্য অস্তমিত, সন্ধ্যা সমাগত প্রায় ;
পূরিল গোধূলি ধূলি গগণ প্রাঙ্গণ,
উড়িল সহস্র পক্ষী আপন কুলায়।

৬

চিন্তিতা জননী ব্যস্ত ধ্রুব অদর্শনে,
সন্ধ্যা সমাগত তবু এলোনাক ঘরে ;
এ হেন সময়ে ধ্রুব বিষণ্ণ আননে,
পড়িল জননী-চক্ষে সহসা অদূরে।

৭

দেখে মা ধ্রুবের মুখ মলিন তখন,
ব্যস্তে জিজ্ঞাসেন ত্বরা কারণ ইহার ;
"বল বাছা, কেন আজ দেখিরে এমন,
কোথা মুনি-সুতগণ সঙ্গীরা তোমার ?

৮

গম্ভীর নয়নে ধ্রুব জননীর পানে,
তাকায়ে ক্ষণেক ধীরে বলিল তখন ;
"মাগো গিয়েছিনু আজ পিতার সদনে,
সঙ্গে মা খেলার সাথী মুনিপুত্রগণে"—

৯

"দেখিনু উত্তম ভাই কোলেতে পিতার,
খেলিছে আনন্দে কত, নাহি অন্যমন ;
আরোহিতে পিতৃ কোল বাসনা আমার,
ধরিল বিমাতা কিন্তু প্রকৃতি ভীষণ"—

১০

"কত যে গো কটু কথা কহিল আমায়,
কোপেতে জ্বলিছে তাই সমস্ত শরীর ;
দারুণ সে অপমান দহিছে হৃদয়,
তাই মাগো এত আজ হয়েছি অধীর"।

১১

আদরে জননী অঙ্কে করিয়া গ্রহণ,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি অন্তর ব্যথায় ;
চুম্বিয়া কপোল দেশ, মুছায়ে নয়ন,
বলিলেন ধ্রুবে শত প্রবোধ কথায় ;—

১২

"বৎস ! ছত্র, অশ্ব, গজ কিংবা রাজাসন,
স্বীয় কর্ম্মফলে, তাই সব অপরের ;
স্থির হও, মিথ্যা ক্রোধ কর সম্বরণ।"
শান্ত নহে তবু মন ব্যথিত ধ্রুবের।

১৩

চিন্তিত বালক ধ্রুব কহে পুনর্ব্বার,
কেমনে বিষণ্ণ মনে ধরি এ জীবন ;
দুঃখের অদৃষ্ট কি মা ফিরেনাক আর ?
বলনা জগতে কেবা দুঃখ-নিবারণ ?

১৪

—"বৎস ! কৃপাময় হরি দুঃখ-নিবারণ,
কর সর্ব্ব-ফল-প্রদ পুণ্য আহরণ,
ঘুচিবে সকল দুঃখ শান্ত কর মন,
অধীরতা নহে কভু জ্ঞানীর লক্ষণ।"

বৈরাগ্য।

১৫

শুনিয়া বালক ধ্রুব দয়াময় নাম
নিস্তব্ধ কাঁপিল বক্ষ, অটল নয়ন
চমকিল, শুধাইল কোথা তাঁর ধাম—
কেমনে চরণ লভি জুড়াবে জীবন।

১৬

জননী দেখিয়া ধ্রুবে ব্যাকুল অন্তর,
ভুলাবারে কত চেষ্টা করেন তখন ;—
ধরম পিপাসু আত্মা কিন্তু সতন্তর,
নিমেষে কে যেন তাহে করিল হরণ।

১৭

ফিরিল গগণরূপ, এল অন্ধকার,
ফিরিলনা কিন্তু শিশু ধ্রুবের নয়ন ;—
ফিরাবে সে স্থির আঁখি হেন সাধ্য কার,
রয়েছে নিমগ্ন ধ্যানে হরির চরণ।

১৮

পলাইল অবিলম্বে ক্রীড়াসক্ত মন,
উদিলনা স্মৃতি-পটে মুনি পুত্রগণ,
চমৎকার ইহলোকে ধার্ম্মিক জীবন
চকিতে ঘটিল আহা! অতীত স্বপন।

১৯

ব্যাকুল কুমার পাশে ব্যথিতা জননী,
পাতি দীন-তৃণ-শয্যা করেন শয়ন,
ধীরে সুপ্ত মাখা বিশ্ব গভীরা রজনী,
মুদিলনা তবু শিশু ধ্রুবের নয়ন।

২০

জননীর পরিশ্রান্ত তাপিত শরীর,
নিদ্রার সুস্নিগ্ধ কোলে ক্ষণে অচেতন;
কিন্তু সে বালক ধ্রুব তখনো অধীর,
নাহি নিদ্রা, লক্ষ্য মাত্র হরির চরণ!

২১

নিদ্রিতা জননী, ধ্রুব সঘনে তাকায়,
সত্য সুখময় বটে ভাবিয়া তখন
ত্যজিলেন সুখ শয্যা লইতে বিদায়,
হায়রে, শিশুর এই সাহস কেমন!

২২

নত শিরে নমি মার যুগল চরণ,
লইলেন পদধূলি মস্তকে তুলিয়া,
কেমন সুন্দর শোভা ধ্রুবের তখন,
বারেক জগৎ লোক দেখগো চাহিয়া।

২৩

পড়িছে অজস্রধারে নয়নের জল,
কে দেখিল শিশু অশ্রু হায়রে তখন।
দুঃখহারী হরিনাম করিয়া সম্বল,
ত্যজিলা জননীসহ সংসার জীবন।

অরণ্যে প্রবেশ।

২৪

চারিদিক জনশূন্য, রজনী আঁধার,
চারিপাশ অন্ধকার শান্ত দরশন,
ধাইল সে শিশু ধ্রুব অরণ্য মাঝার,
ভয়ানক বনপথ করি অতিক্রম।

২৫

এভাবি কাহার দেহ রোমাঞ্চিত নয়,
খুঁজিল কেমনে ধ্রুব দয়ার নিলয়;
কঠোর সাধন, তপ, বিকশিত হয়,
কিন্তু কি সত্যই হরি এত নিরদয়।

২৬

শিখাবে সন্ন্যাসী ধ্রুব অনন্ত ধরায়,
সরল স্বর্গীয় ভিক্ষা, প্রীতি, ভক্তিচয়,
শিশুর কোমল মন সরল ভিক্ষায়,
অঙ্কুরিবে প্রেম-বীজ পাষাণ হৃদয়।

২৭

আহা, কিরে চমৎকার এমন সময়,
উপরে আকাশ, নীচে অসীম ধরণী,
বনস্থল অন্ধকার, উপচয় ভয়,
চারিদিক্ শব্দহীন গভীরা রজনী।

২৮

ফুটিয়াছে তারাফুল অনন্ত গগনে,
নাহি আর নভঃ মাঝে কোকনদ ছবি,
কে আনিল ভক্ত ধ্রুবে হেন ঘোর বনে
দেখাইতে অন্ধকারে আলোময় রবি!

২৯

নিদ্রাভঙ্গে অকস্মাৎ ত্বরিতে জাগিয়া,
মুর্চ্ছিতা জননী হেথা ধ্রুব অদর্শনে;
একি! কোথা ধ্রুব বলি পুনঃ বাহিরিয়া,
খুঁজিলেন; আর্ত্তনাদ স্পর্শিল গগনে।

৩০

বহিল নয়ন জল ভিজিয়া বসন,
উচ্চে ডাকিলেন "ধ্রুব! কৈ রে বাছা আয়!
নহে উদ্বন্ধনে আজি ত্যজিব জীবন,
এ ঘোর নিশীথ কালে কে নিল তোমায়?

৩১

"মা' বলে কে ডাকে আজ সুমধুর স্বরে,
বল নাথ! একবার দুঃখিনীর বিধি;—

নিবাই শোকের বহ্নি কারে কোলে করে,
হায়! কোথা ধ্রুব মম অঞ্চলের নিধি?

৩২

"জনম দুঃখিনী আমি, এস বাছাধন —
বারেক মা বলে ডাক জুড়াই জীবন,"
এরূপে সন্তপ্তমাতা, করেন রোদন,
ছুঁইল এ শোক ধ্বনি, অতুচ্চ গগণ!

৩৩

দুঃখিনী মায়ের কথা ধ্রুবের অন্তরে,
মুহূর্ত্তের তরে শুধু হলনা স্মরণ—
আহারে, সাধন-আত্মা সংসারভিতরে;
ফিরে কি নিমেষ তরে বারেক কখন!

ব্যাকুলতা।

৩৪

নিবিড় অরণ্য, চারিদিক অন্ধকার,
বিচরিছে স্থানে স্থানে হিংস্র জন্তুগণ,
কাতরে ভকত ধ্রুব করিয়া চীৎকার
দীনভাবে করিতেছে আত্মনিবেদন।

৩৫

"কোথাহে কাঙ্গাল ধন এসএকবার,
বিমাতার বাক্যবাণে বিঁধিছে হৃদয়;
দীনবেশে ডাকি নাথ করে হাহাকার,
কৃপা করে একবার হও হে সদয়।

৩৬

শুনেছি মায়ের মুখে হে হরি সুন্দর!
দীন জন বাঞ্ছাপূর্ণ কর দয়াময়;
অভাগা এসেছে তাই তৃষিত অন্তর,
শ্রীপদ লভিতে আর হেরিতে তোমায়!

৩৭

দীননাথ! বিলম্ব ত সহেনাক আর,
কাঁদিছে সন্তপ্ত প্রাণ দেখনা চাহিয়া,
কৃপাকরে খুলে দাও স্বর্গের দুয়ার,
চরণ দর্শণে তব জুড়াইব হিয়া।

৩৮

কিন্তু কি আশ্চর্য্য শিশু ধ্রুবের জীবন,
না জানে হরির কিবা স্বরূপ প্রকার;
বায়ুতে পাদপ শ্রেণী করে শন্ শন্,
বলে হরি এই বুঝি আইল এবার।

৩৯

রাখিয়া আকাশ পানে তৃষিত নয়ন,
আত্মহারা ভক্ত ধ্রুব, মুকুতার প্রায়
ঝরিছে বিমল অশ্রু তিতিয়া বসন,
এমন স্বর্গীয় শোভা কে দেখেছে হায়।

৪০

আহা! কি অপূর্ব্ব প্রেম, সরল ভকতি,
কাঁপাল সে ভক্তস্বরে নিস্তব্ধ গগণ,
নয়নের জলে ধ্রুব করিছে মিনতি,
হায়রে বিদীর্ণ হেরি পাষাণের মন।

৪১

নিনাদিল বন গুহা ধ্রুবের চীৎকারে,
শুনে স্বর চমকিল পশু পক্ষীগণ,
চমকিল নিশাচর সকরুণ স্বরে,
দাঁড়াল অনতি দূরে হিংস্র জন্তুগণ।

৪২

পঞ্চম বর্ষীয় শিশু এমন সময়ে,
নির্ভয় অন্তরে করি পশু আলিঙ্গন,
'তোমরাকি তাপিতের হরি দয়াময়'
এরূপে অবোধ শিশু করে সম্বোধন।

(ক্রমশঃ)

জীবনের পথে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাবা বোধ হয় জানেন না যে আমি কয়েক দিন হইতে কত মন্দ ব্যবহার করিতেছি। বাবা আমাকে সমুদয় পড়া বলিয়া দিলেন; তাহার পর রামায়ণ হইতে রত্নাকরের উপাখ্যান পড়িয়া শুনাইলেন। আমি তাহা

শুনিয়া বুঝিলাম মানুষ চেষ্টা করিলে কত মন্দ হইয়াও কত ভাল হইতে পারে। রত্নাকর দস্যু ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ও আপনার চেষ্টায় শেষে মহামুনি হইয়া গেলেন। আমিও কি তবে চেষ্টা করিলে অবশেষে ভাল হইতে পারিব না? ভক্তির সহিত এক মনে কাতর ভাবে ডাকিয়া রত্নাকর পাপী হইয়াও পুণ্যময় জীবন পাইয়াছিলেন, আর আমি কি তাহা পাইব না?

৬ই আষাঢ়। আজ সকালবেলা উঠিয়া অনেকক্ষণ মন খুলিয়া প্রার্থনা করিয়াছি। আমি আর মন্দ থাকিব না, আমি ভাল হইবই; আমি আমার এমন বাবা মার প্রাণে কখনও ব্যথা দিব না তাঁহারা আমার জন্য কত করেন, যাহাতে লেখা পড়া শিখিয়া ভাল হইতে পারি তাহার জন্য কত উপায় করিয়া দিয়াছেন, আর আমার তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার কিরূপ? কেবল তাহাই নহে, স্কুলে গুরুজন শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি আমার ব্যবহার আরও কত মন্দ হইতেছে। তাঁহাদের আমাদের শিখাইতে কত কষ্ট পাইতে হয়, তাহার উপর আমরা যদি একগুঁয়েমি করিয়া তাঁহাদের কথা মত পরিশ্রম করিয়া পাঠ না শিখি তাহা হইলে কেবল যে তাঁহাদের অপমান ও মনঃকষ্ট দেওয়া হয় তাহা নয় তাহাতে আমাদেরও চিরদিনের উন্নতির পথে কণ্টক। আমি এমন করিয়া আপনার অনিষ্ট আপনিই করিতেছি। ঈশ্বর আমাকে বিপথ হইতে সুপথে লইয়া যাউন মনে মনে শতবার এই প্রার্থনা করিলাম। আজ সন্ধ্যার সময় আমি বাবার কাছে সে দিনের স্কুলের সমুদয় ঘটনা বলিয়াছি। বাবা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন তুমি "কালই তাঁহাদের নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।"

৮ই আষাঢ়। কাল আমার জীবনের একটা দিন গিয়াছে। অনেক দিন অনেক কষ্টের পর একদিন ভাল ভাবে কাটাইতে পারিলে যে সুখ আজ আমি তাহা পাইয়াছি। বাবার কথা অনুসারে অমি পণ্ডিত মহাশয়ও অম্বিকাবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছি। প্রথমে মুখে বলিতে গিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে বড় কান্না পাইল, তাই পত্র লিখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ভাবে ক্ষমা চাহিয়াছি; ভরসা করি তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক কাল হইতে আমার প্রাণের একটা বিষম বোঝা নামিয়া গিয়াছে; ঈশ্বরের নাম করিয়া দিন আরম্ভ করিলে সে দিন কেমন সুন্দরভাবে কাটিয়া যায় তাহার পরিচয় আমি কাল পাইয়াছি। নহিলে কি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিবার কথা নীতিবিদ্যালয়ে উঁহারা এমন করিয়া বলিতেন? আজ আমার বড় আনন্দ হইতেছে, ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন প্রতিদিন এমন আনন্দে আমার দিন কাটিয়া যায়।

২২এ আষাঢ়। আজ প্রায় দশ দিনেরও বেশী হইল জ্বর হইয়াছে; আজ একটু ভাল আছি তাই লিখিতেছি। এই আষাঢ় মাসের বৃষ্টিতে ভিজিয়া আমার এই জ্বর হইয়াছে। মার কথার অবাধ্যতার এই প্রতিফল পাইয়াছি। বুকে ব্যথা কাশী ও জ্বরে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি; অসুখের ক্লেশ যেমন তেমন কিন্তু শুশ্রূষার ও ঔষধ সেবনের যাতনায় প্রাণ গেল। কবে আবার পূর্ব্বের মত ভাত খাইতে পাইব তাই কেবল ভাবি। দুধ এরারুট আর রুটি খাইতে খাইতে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর ভাল লাগে না। প্রত্যহ ঔষধ খাওয়ার সময় কি কষ্ট হয় তা বলিতে পারি না; যত রাজ্যের কটু তিক্ত কষায় পদার্থ না মিশাইলে কি ঔষধ হয় না? বাস্তবিক আমার বড়ই বিরক্ত বোধ হয়। এক এক সময় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

৩০এ আষাঢ়। এখন ভাল হইয়াছি। কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা এখনও সারে নাই। ভাত খাইয়াছি কিন্তু এখনও ইচ্ছা মত ব্যঞ্জনাদি আহার করিতে পাই না। এমন খাইয়া আমার লাভ কি? সে দিন ভাত খাইতে গিয়া এমন বিরক্ত বোধ হইয়াছিল যে মার উপর রাগ করিয়া ভাত ফেলিয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম। এ সকল অনুচিত বুঝি, কিন্তু কার্য্য কালে তদনুসারে কাজ করিয়া উঠিতে পারি না, এই দুঃখ।

৩১এ আষাঢ়। সুনীতি দিদি আমার অসুখের সংবাদ শুনিয়া আজ আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এত দিন এখানে ছিলেন না। তাই আমাকে

দেখিতে আসিতে পারেন নাই। আজ সমস্ত দিন আমার কাছে ছিলেন, কত গল্প ও ভাল কথা শুনিয়াছি তা কি বলিব। আচ্ছা, সুনীতি দিদি কি গল্পের ভাণ্ডার ? এত গল্প কোথা হইতে শিখিলেন ? আর এমন সুন্দর করিয়াই বা কি করিয়া বলেন ! আহা সুনীতি দিদি যদি এমন করিয়া আমার কাছে থাকেন তবে আমার হাজার অসুখেও সুখ ! কিন্তু আমি কি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ভাল হইতে পারিতেছি ? কই না। আমি জ্বরের সময় খাওয়া ও ঔষধ লইয়া সকলের সঙ্গে উপদ্রব করিয়াছি শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু কিছুই তিরস্কার করেন নাই, কেবল আমার দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কমল, এখনও তোমার ছেলেমানুষী ঘুঝিল না, সহিষ্ণুতাই মেয়েদের প্রধান গুণ জান ?" তাঁহার এই মৃদু ভর্ৎসনা আমার হৃদয়কে বিশেষরূপে আঘাত করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর কখনও এমন করিব না। সুনীতি দিদিকে আর একদিন আসিতে বলিয়া দিয়াছি। তিনি আসিবেন বলিয়াছেন।

২রা শ্রাবণ। সুনীতি দিদি আমার জন্য এক বাক্স আঙ্গুর পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁর বিশেষ কাজ থাকাতে আসিতে পারিবেন না, এইরূপ লিখিয়াছেন। আমি আঙ্গুর খুব ভালবাসি আর সুনীতি দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া এ গুলি যেন আরও শত গুণ মিষ্ট লাগিতেছে। আহা তিনি আমাকে কেমন ভালবাসেন ! আমি খাইয়া যে এত সুখী হইব তা তিনি কেমন করিয়া টের পাইলেন ! আর মিছামিছি বাড়ীতে বসিয়া সময় নষ্ট করিতে বড়ই ক্লেশ বোধ হয়। এমন করিয়া বসিয়া থাকিতে আর পারি না। কবে স্কুলে যাইব ? এই অসুখে আমার যে কি ভয়ানক পড়ার ক্ষতি হইয়াছে তাহা ভাবিলেও ভয় পাই। দেখিতেছি ক্লাসের সকল মেয়েই আমার উপরে উঠিয়া যাইবে। আগামী ষান্মাসিক পরীক্ষায় কি করিয়া পারিব তাহা ভাবিতে আমার প্রাণ কাঁপে। এবার বোধ হয় আমি শেষ পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারিব না। বিশেষতঃ এবার জয়ন্তী আসিয়াছে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি সে আমার উপরে উঠিবে তাহা হইলেই আমার জীবন্মৃত্যু। মাকে ত কতবার জিজ্ঞাসা করি কবে স্কুলে যাইব, মা সে কথা কাণেও তোলেন না, বলেন এত অসুখের পর খুব ভালরূপে না সারিয়া স্কুলে গেলে আবার জ্বর হইবে। আমার বিবেচনায় এমন মূর্খ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকা অপেক্ষা মরা ভাল। মা এ কথা বোঝেন না কেন ?

১০ই শ্রাবণ। আজ স্কুলে গিয়াছিলাম। অনেক বেশী পড়া হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কোন মতেই পারিয়া উঠিব না দেখিতেছি। আমার ভয়ানক পরিশ্রম করা দরকার। আমাদের ক্লাসে আর একটী নূতন মেয়ে আসিয়াছে, নাম ইন্দিরা। মেয়েটা বেশ ; আশ্চর্য্য সুন্দরী।

১৫ই শ্রাবণ। আমি এখন দিবারাত্রি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি ; এত দিন স্কুল কামাই হওয়াতে পড়ার যে ক্ষতি হইয়াছিল এখন দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিব স্থির করিয়াছি। আমি এখন খুব পড়ি। এবার পরীক্ষায় যেমন করিয়াই হউক প্রথম হইতে হইবে। ঈশ্বর আমার সংকল্পের সহায় হউন।

১৭ই শ্রাবণ। অনেকগুলি ছোট ভাই বোন থাকা কি পাপের ভোগ ; আমি হাজার সংকল্প করি কিন্তু ইহাদের জ্বালায় তাহা কাজে করিয়া উঠিতে পারি না। এবার খুব পড়িব ঠিক করিয়াছি, কিন্তু আমার ছোট ভাই বোনদের উপদ্রবে তাহা হয় না ; পড়িতে বসিয়াছি সুরেশ আসিয়া বলিল, দিদি জামার পকেট ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেলাই করিয়া দাও, বোতাম দুই তিনটা খুলিয়া গিয়াছে, লাগাইয়া দাও। বাপরে ! ছেলে গুলো দস্যি নাকি ? এই সে দিন ধোবাবাড়ী হইতে কাপড় আসিতে আসিতেই সমস্ত কাপড় মেরামত করিয়া দিয়াছি আবার আজই সব বোতাম ও পকেট ছিঁড়িয়া আসিয়া উপস্থিত ! আর পারি না, একবার মেয়ে হন ত কাপড় ছেঁড়ার সুখ পান, তাহা হইলে বাছাদের কাপড় সেলাই করিতে করিতে প্রাণটা যায় !

২২ এ শ্রাবণ। ইন্দিরার সঙ্গে আমার খুব পরিচয়

হইয়াছে। ইন্দিরা বেশ মেয়ে। লোকের সঙ্গে খুব ভাব করিতে পারে এই ক' দিনে আমার সঙ্গে এম্‌নি আলাপ ও বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিয়াছে ঠিক যেন আমি তার নিজের লোক। ইন্দিরার খুব ভাল ভাল গুণ আছে, আশ্চর্য্য ইংরাজী বলিতে পারে, আমাদের ক্লাসের সব মেয়েরা তাহার ইংরাজী কথা শুনিয়া অবাক হইয়া যায়। এতটুকু মেয়ে, কিন্তু ইহারই মধ্যে পিয়ানো, বেহালা, সেতার বাজাইতে একেবারে পাকা।. আর এমনি মিষ্ট গলা, তার আর কি বলিব. যে শোনে সেই মোহিত হয়। ইন্দিরার বাবা খুব বড় মানুষ, অনেক টাকা আছে। ইন্দিরা তাদের বাড়ীর কত গল্প করে; খুব সুন্দর বড় বাড়ী আর চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগান তাহাতে সরল রকম ইংরাজী ও দেশী ফুল আছে। ইন্দিরা সেখানে রোজ বিকালে কত রকম ইংরাজী খেলা করে আহা! আমার একবার দেখিতে কত ইচ্ছা করে!

২৪ এ শ্রাবণ। ইচ্ছামত পড়িতে পারিতেছি না। খোকাকে কোলে করিয়া পড়া বড়ই দুস্কর, সম্মুখে বই পাইলেই ছিঁড়িয়া ফেলিবে, দোয়াত দেখিলেই তাহার কালীটুকু উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিবে। এই খোকাকে ধর, কুসুমের চুল বাঁধিয়া দেও, কাপড় গুছাইয়া রাখ কুসুমের পড়া বলিয়া দেও, সুরেশের জামা সেলাই করিয়া দাও, বাবার টেবিল সাজাইয়া রাখ, এমন করিলে কি পড়া করা যায়? আমি আমার স্নেহের ভাই বোন গুলির জন্য পরিশ্রম করিতে কাতর নই কিন্তু অন্তত এই বৎসরের জন্য যদি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতে পাইতাম তবে কত ভাল হইত! পরীক্ষার সময় যে কি করিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না, সেই ভাবনায় চারিদিক অন্ধকার দেখি। আমাদের ক্লাসের অন্য কোন মেয়েকে কি পড়িবার জন্য এত বাধা অতিক্রম করিতে হয়? কখনই না। ইন্দিরাকে ত বাড়ীর কোন কাজই করিতে হয় না তবে নিজের কাজ করিয়া দিবার জন্য দুই জন ঝি আছে। জয়ন্তীকেও কোন কাজ করিতে হয় না তার ছোট ভাই বোন কেহ নাই। আর সুরমা ত তার বাবা মায়ের এক মাত্র মেয়ে। আমারই যত ক্লেশ। কাহাকে এ সকল দুঃখ বলিব, আমার সময় সময় বড়ই কান্না পায়। (ক্রমশঃ)

নদী।

(বালিকা রচনা)

আকাশ হইতে, স্নেহ বিন্দু গুলি,
পড়ে ঝরি গিরি গায়।
আনন্দে মোহিয়ে, সলিলের স্রোত,
বহে আসে এ ধরায়॥
সলিলের স্রোত, বহিতে বহিতে
কত দেশ দেশান্তরে।
কোথাও পুকুর, কোথাও সাগর,
হয়ে জল দান করে॥
নদীর কারণে, হয় কত দেশ,
তাহাতে জীবের বাস।
নদীর জলেতে, হয় কত শস্য
বড় গাছ হতে ঘাস॥
জীবের দুঃখেতে, দয়াবতী নদী
অত্যন্ত কাতরা হয়।
তাঁহার কৃপায়, বাঁচে জীব যত
সুবিশাল এ ধরায়॥
তৃষায় আকুল, নব বধূ কুল
কলসী লইয়া কাঁখে।
জল আনিবারে, যায় ধীরে ধীরে
ঘোমটা খুলিয়া দেখে॥
রাখাল সকল, লয়ে গাভী দল
সলিল করায় পান।
পুলকে মগন, যত শিশু দল
আনন্দে ধরয়ে তান॥
বালুকা লইয়া, নদীর জলেতে
ছড়ায় সোহাগে কত।
পুনঃ নাচি জলে, ডুবো ডুবি খেলে
তাহাতে আনন্দ কত॥

কত শত তরী, যায় ধীরে ধীরে
তুলিয়ে বিশাল পাল।
কেহ দাঁড় বায়, কেহ গুণে ধায়
কেহ বা ধরেছে হাল॥
বণিক সকল, পণ্যদ্রব্য লয়ে
গন্তব্য স্থানেতে যায়।
কথন জাহাজে, কথন নৌকায়
দেশে দেশে তারা ধায়॥
না থাকিতে যদি, দয়াবতী তুমি
বাণিজ্যে হইত ক্ষতি।
এদেশ হইতে, ওদেশে যাইতে
দুর্গম হইত অতি॥
যাঁর করুণায়, তুমি স্রোতস্বতী
নমিগো তাঁহারি পায়।
তোমারি মতন, পরহিত সাধি
যেনগো জীবন যায়॥
তুমিও যেমন, খরবেগে বহি
ছুটিছ সাগর পানে।
তেমতি আমরা, সংসার হইতে
যেন যাই নিত্যধামে॥

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল,—

১। জল (কলসিতে জল আনিতে যাইবার সময় জল আসিল। তাই প্রথমে পলাইয়া গিয়া পরে জল থামিলে কলসপূর্ণ জল কোলে করিয়া লইয়া আসিলাম।)

২। ১২+৪=১৬
২০−৪=১৬
৪×৪=১৬
৬৪÷৪=১৬

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীমন্মথমথন সরকার, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীমহীতোষ বাগ্‌চী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীহেমচন্দ্র সাউ, শ্রীহিমাদ্রিকুমার শর্ম্মা, শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমহম্মদ কাছিরদ্দিন, শ্রীপ্রেমনীহার রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীচারুচন্দ্র বসু, শ্রীমৌলীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরকুমার মৈত্র, শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল, শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বীণাপানি দেবী, শ্রীহেম কুমার বর্দ্ধন, শ্রীকৃষ্ণমোহন মল্লিক, শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপ্রমোদলাল ধর, শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলাংশুভূষণ মিত্র, শ্রীমণুজনাথ ঘটক, শ্রীমিহিরকুমার মিত্র, শ্রীনীরজানাথ ঘটক, শ্রীসরোজনাথ ঘটক, শ্রীমননকুমার মিত্র, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী, শ্রীঅমূল্যকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীরোহিনীকুমার ধর, শ্রীরায়েতালি সেখ, শ্রীমতী কুসুমকুমার দাস, শ্রীসুশীতচন্দ্র চৌধুরী, রায় ঈশ্বরচন্দ্র গজপতি সিংহ, শ্রীআবদুল কাজির খাঁ।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীমন্মথমথন সরকার প্রেরিত।)

১। নিম্নের বাক্যটি হইতে কোন প্রসিদ্ধ নাম বাহির করিতে পার কি?

ওহে মতি তোমাদের জামাইকে লইয়া আইস।

(শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রেরিত।)

২। এ অতি আশ্চর্য্য গাই।
স্তন তার হেরি নাই॥
গলে ছুরি দিলে তার।
তবে পড়ে দুগ্ধধার॥

(শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস প্রেরিত।)

৩। টাকায় ঘটি সিকায় বাটী ৫ টাকার এক থালা
১৬ টাকার ১৬টী দ্রব্য এনে দাও এই বেলা।

২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

সেনাপতি স্থরেশ বিশ্বাস ও তাঁহার পুত্রগণ

মুকুল

১৫শ ভাগ। } আষাঢ়, ১৩১৬। { ৩য় সংখ্যা।

বাঙ্গালী বীর।

বাঙ্গালী জাতির একটী বড় অখ্যাতি আছে। লোকে বলে, বাঙ্গালীরা সকল কাজে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে; তাহারা পণ্ডিত হইতে পারে, কবি হইতে পারে, দার্শনিক হইতে পারে, রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যোদ্ধা হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা যে সত্য নহে, তাহা সম্প্রতি এক জন বাঙ্গালীর জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে বাঙ্গালীদের মধ্যে বিখ্যাত যোদ্ধার নাম বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, যে বাঙ্গালীদের যোদ্ধা হইবার সুবিধা নাই। সুবিধা পাইলে বাঙ্গালীরা যে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় যুদ্ধ বিদ্যায়ও পারদর্শিতা দেখাইতে পারে তাহার জীবন্ত প্রমাণ পরলোকগত লেফ্‌টেনাণ্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। ইনি এক জন বাঙ্গালী, নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অবশেষে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল সাধারণ-তন্ত্রের এক জন বিখ্যাত সেনানী হইয়াছিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র আপনার সাহস ও বীরত্বের বলে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া বিদেশে উচ্চ পদ এবং প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার আশ্চর্য্য এবং ঘটনাপূর্ণ জীবনের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অল্প যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতেই তাঁহাকে এক জন অসাধারণ লোক বলিয়া মনে হয়। ১৮৬১ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাথপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহার নিকটে থাকিয়া ভবানীপুর লণ্ডন মিশন সোসাইটির স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময়ে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম ধর্ম্মগ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর স্বভাবতঃই তিনি পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া খৃষ্টান মিশনারীদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি কিছু দিন লণ্ডন মিশন সোসাইটীর বোর্ডিংএ থাকিয়া পাঠ করেন। কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকতে পারিলেন না। বাল্যকাল হইতেই সুরেশচন্দ্রের চরিত্রে এক প্রকার তেজ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও হঠকারিতা ছিল, ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির কারণ এবং ইহা হইতে তিনি জীবনে অনেক কষ্ট এবং অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের অল্প দিনের পরেই তিনি তাঁহার খ্রীষ্টান অভিভাবকগণের বিরাগ ভাজন হন; এবং তাঁহাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এখন হইতে তিনি নিরাশ্রয় হইলেন; তাঁহার বয়সও বেশী হয় নাই।

প্রথম প্রথম দুই এক জন বন্ধুর বাড়ীতে কিছু দিন ছিলেন। কিন্তু এমন করিয়া কত দিন চলে? সুরেশচন্দ্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল। নিজের চেষ্টাতে বড় লোক হইব এই ভাব চিরদিন তাঁহার মনে প্রবল ছিল। কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি কোনও জাহাজে কোনও প্রকার কাজ লইয়া বিলাতে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প বয়সের বালককে এরূপ কার্য্য দিতে সহসা কেহ ইচ্ছুক হইলেন না। তবু বিশেষ চেষ্টায় মান্দ্রাজ রেঙ্গুন প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী বন্দরযাত্রী কোনও কোনও জাহাজে সুরেশচন্দ্র সময়ে সময়ে খানসামার কাজ পাইতে লাগিলেন। এদিকে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি মনে মনে আর এক সংকল্প করিলেন। তিনি ভাবিলেন, যে পল্লীগ্রামে কোন স্থানে গিয়া অনেক জমি লইয়া বিস্তৃত ভাবে চাষ করিবেন, তাহার জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার এই কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তখন আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কাজের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কলিকাতায় একটী হোটেলে খানসামার কাজ পাইলেন। এই কাজ করিতে করিতে এক খানি জাহাজের খানসামারূপে তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার সুবিধা হয়। এই যে তিনি বিদেশে চলিলেন, আর কখনও তাঁহার দেশে ফিরিবার সুবিধা হয় নাই।

ইংলণ্ডে পৌছিয়া কিছু দিন তিনি অতি কষ্টে যাপন করিয়াছিলেন। ষ্টীমারে কাজ করিয়া তাঁহার যাহা কিছু সঞ্চয় হইয়াছিল, লণ্ডনে কুসঙ্গে পড়িয়া এক রাত্রিতেই তাহা ব্যয় হইয়া যায়। তাহার পরে কিছু দিন তাঁহার কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল। অবশেষে সুরেশন্দ্র একটি সার্কাসের দলে সিংহের খাবার দেওয়ার কাজ পাইলেন; তাঁহার উদ্দাম সাহসী প্রকৃতির পক্ষে এই কাজ ঠিক হইয়াছিল; অল্প দিনের মধ্যে সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বশ করিতে তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন এবং সার্কাসের দলের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের নানা স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ ভ্রমণ করিয়া তিনি ইউরোপের নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে অনর্গল বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। একাজে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনও কম হইত না; কিন্তু যেমন উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি ব্যয় করিতেন। কিন্তু এই প্রকার অনিয়মিত জীবন যাপন করিয়া তিনি মনে শান্তি পাইতেন না।

সার্কাসের দলের সঙ্গেই তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করেন। সেই সময়ে ব্রেজিলে রাজবিপ্লব চলিতেছিল। সুরেশচন্দ্রের উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতি সহজেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; এবং তিনি সাধারণ-তন্ত্র দলে একজন সামান্য সৈনিকরূপে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে তিনি বার বার অসাধারণ সাহস এবং নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদেশী বলিয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাইতেন না। অবশেষে তাঁহার বীরত্ব ও আত্মত্যাগ একজন নিরপেক্ষ উচ্চ কর্ম্মচারীর দৃষ্টিতে পড়ে। একদিন রাত্রিতে শত্রুপক্ষীয়েরা বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া একটি নগর আক্রমণ করে। সুরেশচন্দ্র পঞ্চাশ জন সৈন্য লইয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে বাহির হইলেন। শত্রু পক্ষের লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "কে ওখানে" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। তাঁহার দিকে অসংখ্য কামান ও বন্দুক উত্থিত রহিয়াছে। সুরেশচন্দ্র নির্ভয়ে উত্তর করিলেন "সাধারণ তন্ত্রের বীর সেনা"। শত্রুর উত্তর আসিল, "আত্ম সমর্পণ কর, নচেৎ মৃত্যু।" তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "সাধারণ-তন্ত্রের বীর সেনা আত্মসমর্পণ করিতে জানে না।" পর মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ ফিরিয়া সুরেশচন্দ্র আপনার পঞ্চাশজন সঙ্গীকে সবেগে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। শত্রু পক্ষীয়েরা ইতিমধ্যে তাহাদের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে ভীত না হইয়া সুরেশচন্দ্র আপনার অনুবর্ত্তীদিগকে বলিলেন, "বন্ধুগণ, শত্রুর কামান আমাদের নিকটেই আছে, এ কামানের গোলায় আমাদের ক্ষতি করিতে পারিবে না। প্রিয় ব্রেজিলের সন্তানগণের বীর হৃদয়

জীবন দানে কুণ্ঠিত নহে, এবং আজ তোমরা দেখিবে, পবিত্র হিন্দুস্থানের সন্তান কেমন করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে শত্রুর কামান কাড়িয়া লয়, প্রস্তুত হও।" তৎপরে কয়েকবার জয়ধ্বনি করিয়া তিনি বলিলেন, "আমাকে অনুসরণ কর।" এই বলিয়া তিনি প্রচণ্ড বেগে ঝড়ের ন্যায় শত্রুর কামানের উপর গিয়া পড়িলেন। বিপক্ষেরা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল, সুরেশচন্দ্র তখন সেই কামান ঘুরাইয়া তাহাদিগের দিকে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর রক্তস্রোত বহিল। সুরেশচন্দ্র জয়ী হইলেন। বীর বলিয়া চারিদিকে তাঁহার যশ ঘোষিত হইল। ব্রেজিলবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে শিখিল, তিনি উচ্চপদে উঠিলেন।

বিদেশে সম্মান ও সম্পদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মাতৃভূমিকে ভুলেন নাই। ব্রেজিলে তিনি বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তথাপি তিনি স্বদেশের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া তিনি আর এদেশে আসেন নাই। জননীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "পিতৃদেব আমাকে কলিকাতায় যাইয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমি তাহা করিতে অক্ষম, কারণ মাতৃহীন কলিকাতায় আমার আর কোনও আকর্ষণ নাই। যাঁহাকে আমি চিরদিন ভাল বাসিতাম এবং বাসি এবং যিনি আমাকে চিরদিন স্নেহ করিতেন ও করিবেন তিনি আর তথায় নাই। এখন আমি স্বর্গের দ্বারে আমার জননীর সহিত যুক্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া দিনপাত করিব।" এই পত্রে সুরেশচন্দ্রের চরিত্রের আর এক অংশের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তিনি যে কেবল বীর ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়ও অতি কোমল ছিল। তাঁহার ভাল বাসিবার শক্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল। বাল্যকালের বন্ধুগণকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভুলেন নাই। সংসার তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিলেন, অল্পবয়সে পিতৃগৃহ ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আশ্রয় হীন হইয়া দেশে দেশে বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁহার হৃদয় সেই শৈশবের গৃহেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি এক পত্রে তাঁহার খুল্লতাতকে লিখিয়াছিলেন,

"আমি কপর্দ্দকহীন অবস্থায় বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাটী ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার মনে বড় সাধ ছিল, আমার জননীর শিরোদেশ হীরকহারে মণ্ডিত করিয়া দিব। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, আমি এত দিনে সে সাধ পূর্ণ করিতাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল, আমি এজন্মে আর আমার জননীর স্নেহমুখ দেখিতে পাইব না।" যিনি সম্পদ বিপদময় সংসারাবর্ত্তের মধ্যে এমন করিয়া জননীর স্মৃতি ভক্তিভরে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারেন, তিনি নমস্য।

বাঁচিয়া থাকিলে সুরেশচন্দ্র হয় ত কোনও দিন দেশে ফিরিতেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিদেশে তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি মাতৃভূমিকে ভুলেন নাই; তাঁহার স্বদেশবাসীরাও তাঁহার গৌরবে আনন্দিত হইয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র যদি কখনও দেশে ফিরিতেন দেশবাসী সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন; সে সুযোগ আর হইল না। বঙ্গবাসী বহুদিন সাদরে ও সগর্ব্বে এই গৃহতাড়িত বাঙ্গালী যুবকের বীরত্বের কথা স্মরণ করিবে।

সৌর জগৎ।

যে কারণে বৃক্ষ হইতে ফল ধরাতলে পতিত হয় এবং কোন উৎক্ষিপ্ত বস্তু ধরাতলে পুনরাগমন করে, তাহাকে 'আকর্ষণ' কহে। আকর্ষণ চক্ষে দেখা যায় না এবং কোন দৃশ্য বন্ধন ব্যতিরেকে শূন্য পথেও ইহার কার্য্য চলিয়া থাকে। আরও জানা যায়, যে ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় পদার্থ এই আকর্ষণের আয়ত্ত ও তাহা দ্বারা বশীভূত। এই আকর্ষণ বলে লঘু পদার্থ সকল গুরু পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার দিকে চলে, অথবা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হইলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করে।

আকাশে এমন কতকগুলি তারা আছে, যাহারা সূর্য্যের আকর্ষণবলে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার চারিদিকে

ঘুরিতেছে; ইহাদের সমষ্টিকে 'সৌর জগৎ' কহে। সৌর জগতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা শ্রেণীর তারা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি তারা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিয়া থাকে এবং অপর কতকগুলি ঐ সকল তারাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে। যে সকল তারা সূর্য্যের আকর্ষণবলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া চলে, তাহাদিগকে 'গ্রহ' কহে। প্রত্যেক গ্রহের গতির এক একটা নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, তাহাকে ঐ গ্রহের 'কক্ষ' কহে। গ্রহের কক্ষ চক্ষে দেখা যায় না। যেমন আকাশে ঢিল ছুড়িলে তাহা যে পথে শূন্যমার্গে উত্থিত হয় এবং পুনরায় ধরাতলে অবতরণ করে, তাহা চক্ষে দেখা না গেলেও, ঢিলের গতি দেখিয়া তাহার পথ জানা যাইতে পারে। গ্রহ কক্ষের আকার গোল, কিন্তু সম্পূর্ণ বৃত্তাকার নহে।

প্রাচীন কালে হিন্দু, গ্রীক এবং আরব ও মিশর দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে গ্রহগণ বৃত্তাকার (সম্পূর্ণ গোলাকার) পথে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং কোন দৈবশক্তি তাহাদিগকে সময় সময় বিচলিত করিয়া পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়, একারণ তাহাদিগের গতি দৃষ্টে মনে করা যায়, যেন তাহাদের কক্ষ বৃত্তাকার নহে। এক্ষণে আমরা গণিত বিদ্যার সাহায্যে জানিতে পারিয়াছি, যে গ্রহ কক্ষ বৃত্তাকার হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সূর্য্যকে পৃথিবীর গ্রহরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; অদ্যাপি হিন্দু শাস্ত্রে নবগ্রহ স্তোত্রে সূর্য্যকে গ্রহরূপে স্তব করা হইয়া থাকে। এখন ইহা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে, যে সূর্য্য গ্রহ নহে; পরন্তু পৃথিবী একটি গ্রহ, এবং তাহা অপরাপর গ্রহদিগের সহিত সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট নামক একজন হিন্দু পণ্ডিত প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দে (৪২০ শকে, অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে) সর্ব্বপ্রথম ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যে পৃথিবী ঘুরিতেছে; তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে ইহা লিখিত আছে যে "পৃথিবী নিয়ত ঘুরিতেছে, একারণ আমরা আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রদিগকে প্রতিদিন উদয় হইতে এবং অস্ত যাইতে দেখি।" কিন্তু ইহা দ্বারা পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তনই বুঝায়; পৃথিবী যে একটি গ্রহ, কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর্য্য ভট্টের প্রায় ১০৪০ বৎসর পরে কোপার্নিকস্ নামক একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত, এবং তাহার ৫০ বৎসর পরে গ্যালিলিও নামক একজন ইতালীয় পণ্ডিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতি প্রতিপাদন করিয়া সূর্য্য বিষয়ক ভ্রান্ত মত খণ্ডন, ও পৃথিবীর গ্রহত্ব সপ্রমাণ করেন।

সৌরজগতে আটটি প্রধান গ্রহ আছে। সূর্য্য হইতে দূরত্বানুসারে তাহাদের নাম, যথাক্রমে, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইন্দ্র ও বরুণ। তাহাদের দূরত্ব, আবর্ত্তন কাল এবং আয়তন নিম্নলিখিত তালিকাতে দৃষ্ট হইবে।

গ্রহের নাম	সূর্য্য হইতে গড় দূরত্ব —মাইল	আবর্ত্তন কাল —দিন	গ্রহবিম্বের ব্যাস —মাইল	আয়তন—আকার পৃথিবীর কত গুণ
বুধ	৩,৫৯,৫৮,০০০	৮৮	৩০০৮	১৮ ভাগের ১ ভাগ
শুক্র	৬,৭১,৯০,০০০	২২৪ ৩/৪	৭৪৮০	২৫ " ২১ "
পৃথিবী	৯,২৯,৫০,০০০	৩৬৫ ১/৪	৭৯২৬	———
মঙ্গল	১৪,১৫,৩৬,০০০	৬৮৭	৪৯৯৯	৪ ভাগের ১ ভাগ
বৃহস্পতি	৪৮,৩২,৮৮,০০০	৪৩৩২ ১/২	৮৫৪৩৯	১৩৯০ গুণ বড়
শনি	৮৮,৬০,৬৫,০০০	১০৭৫৯ ১/৪	৭৫০৩৬	৮৪৯ " "
ইন্দ্র	১,৭৮,১৯,৪৪,০০০	৩০৬৮৬ ৩/৪	৩০৮৭৫	৫৯ " "
বরুণ	২,৭৯,১৭,৫০,০০০	৬০১২৬ ৩/৪	৩৭২০৫	১০৩ ১/২ " "

সূর্য্য হইতে গ্রহের দূরত্ব সকল সময় সমান থাকে না; গ্রহের কক্ষ সম্পূর্ণ গোলাকার না হওয়াই ইহার কারণ। গ্রহের এক আবর্ত্তন কালে তাহার ;বাস্তবিক দূরত্ব একবার করিয়া বেশী ও একবার করিয়া কম হইয়া থাকে। এই তালিকাতে যে দূরত্ব দেওয়া হইল তাহা ঐ সকল পরিবর্ত্তনশীল দূরত্বের গড়। নিম্নে গ্রহকক্ষের একটি আদর্শ চিত্র প্রদর্শিত হইল। তাহাতে দেখা যাইবে, যে সূর্য্য কক্ষের ঠিক মধ্য স্থলে নহে; কক্ষের যে বিন্দুতে সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছে, তাহাকে কক্ষের 'নাভি' কহে। চিত্র দৃষ্টে সহজে বুঝা যাইবে, যে যখন গ্রহ 'ক' বিন্দুতে থাকে তখন উহা সূর্য্যের সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী, এবং যখন 'খ' বিন্দুতে থাকে তখন সর্ব্বাধিক দূরবর্ত্তী হয়। এই উভয় দূরত্বের যোগফলকে সমদ্বিভাগ করিলে গড় দূরত্ব পাওয়া যায়।
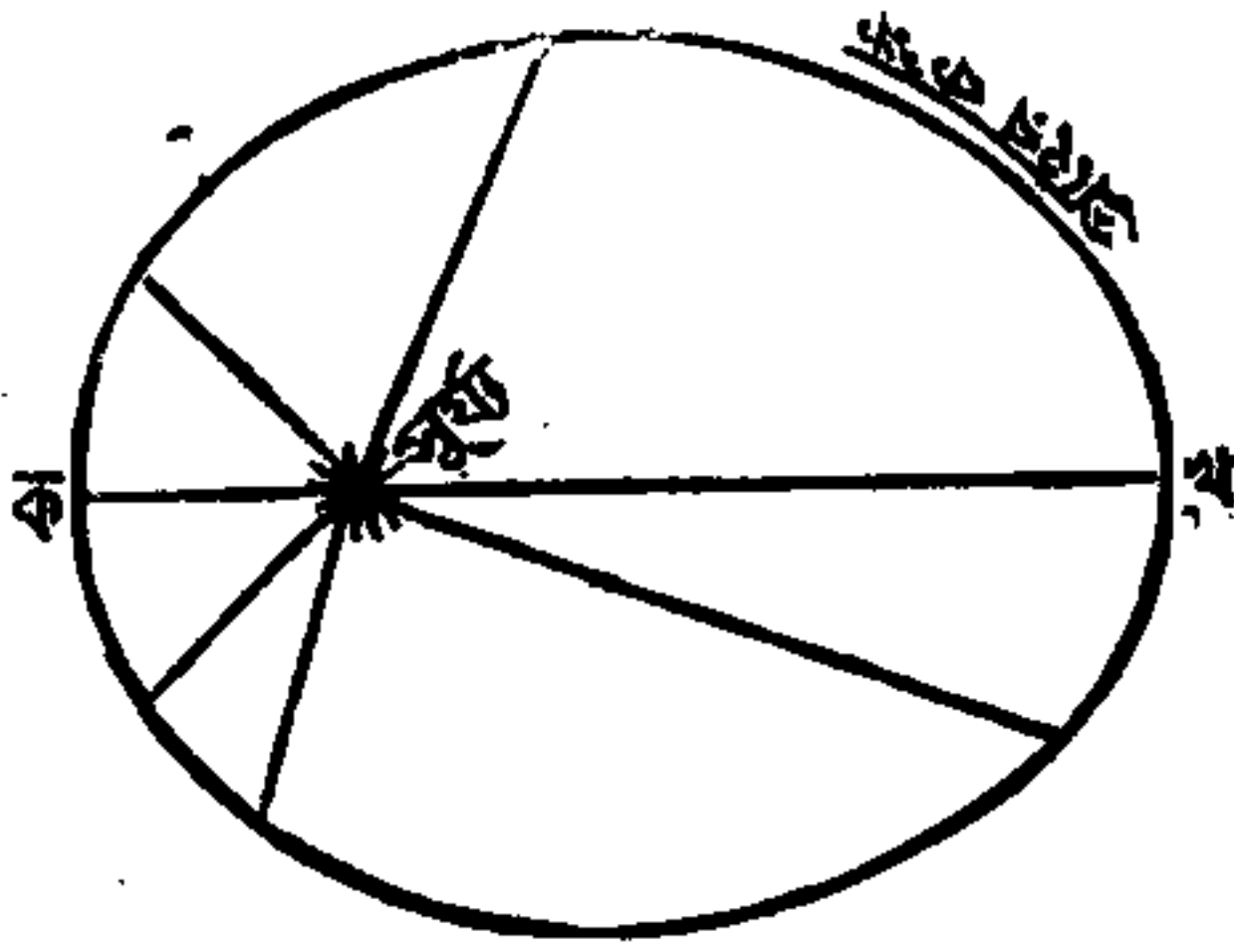
উপরোক্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যাইতেছে, যে বুধ গ্রহ সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী; তৎপর শুক্র, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ যথাক্রমে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। ইহাদের আবর্ত্তনকাল দূরত্বের অনুরূপ এবং উভয়ের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ কারণ যে গ্রহের দূরত্ব যত বেশী, তাহার আবর্ত্তন কাল ও সেই সম্বন্ধানুক্রমে বেশী হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রহদিগের আয়তন তাহাদের দূরত্বের অনুরূপ নহে। সৌরজগতে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন গ্রহ, তাহার পর শনি; অপর সকল গ্রহকে একত্র করিয়া একটা গ্রহ গঠন করিলে তাহা শনির পঞ্চমাংশের এবং বৃহস্পতির অষ্টমাংশেরও ন্যূন হইবে।

সৌর জগতে অপর এক জাতীয় তারা আছে, তাহাদিগকে 'উপগ্রহ' কহে। গ্রহ যেমন সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে থাকে, উপগ্রহ সেইরূপ গ্রহের আকর্ষণে গ্রহকে বেষ্টন করিয়া ঘুরে। উপগ্রহ গ্রহাপেক্ষা ছোট, এবং যে গ্রহের নিকটে থাকে, তাহার আকর্ষণে আবদ্ধ হয়; একারণ তাহাকে ঐ গ্রহের উপগ্রহ বলা যায়। গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ বেষ্টন করিয়া চলিবার সময় উপগ্রহগণ তাহাদিকে বেষ্টন করিয়া চলিতে চলিতে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। চন্দ্র এইরূপ একটি উপগ্রহ; উহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

সকল গ্রহেরই যে উপগ্রহ আছে, তাহা নহে; এবং যে সকল গ্রহের উপগ্রহ আছে, তাহার উপগ্রহ সংখ্যাও সমান অথবা কোন বিধানানুযায়ী নহে। বুধ ও শুক্রের কোন উপগ্রহ দেখা যায় না। অপর গ্রহদিগের উপগ্রহ সংখ্যা যথাক্রমে নিম্নে দিতেছি,

পৃথিবীর ১, মঙ্গলের ২, বৃহস্পতির ৬, শনির ৮, ইন্দ্রের ৪ এবং বরুণের ২।

চন্দ্র ছাড়া অপর কোন উপগ্রহই চক্ষে দেখা যায় না, তাহাদিগকে দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন কালের লোকেরা দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিতে জানিতেন না, একারণ তাঁহারা উপগ্রহের কোন সন্ধান জ্ঞাত ছিলেন না।

শনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ না হইলেও তাহার উপগ্রহ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহা ছাড়া শনির আরও এক বিশেষত্ব আছে যাহা আর কোন গ্রহে নাই, শনির দেহের অতি নিকটে, কিন্তু তাহা হইতে অসংলগ্ন ভাবে তিনটি চক্র পরস্পর সমান্তরাল থাকিয়া, তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। ইহাদিগকে 'শনির চক্র' বলা যায়।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে নয়টি গ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়; তোমরা এক. দুই শিখিবার সময় 'নয়ে নবগ্রহ' বোধ হয় মুখস্থ করিয়'ছিলে। সেই নয়টী গ্রহ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এবং রাহু ও

কেতু। রাহু ও কেতুকে চক্ষে দেখা যায় না, এ কারণ তাহাদিগকে বাদ দিয়া অপর সাতটি গ্রহের নামানুসারে রবি, সোম, মঙ্গল প্রভৃতি সাত বারের নামকরণ করা হইয়াছে। ঐ কালের লোকেরা পৃথিবীকে অচলা ও গ্রহজগতের কেন্দ্র মনে করিতেন; এবং পৃথিবীর গতি সূর্য্যে আরোপ করিয়া সূর্য্যকে একটা গ্রহরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন গ্রহগণ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে, ইহা সিদ্ধান্ত করাতে চন্দ্রকেও একটা গ্রহ মনে করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহগণ চলিতেছে; পৃথিবী একটি গ্রহ, এবং চন্দ্র তাহার উপগ্রহ। রাহু ও কেতু বাস্তবিক গ্রহ নহে; ইহাদের পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।

ইন্দ্র ও বরুণ গ্রহদ্বয় দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইয়ুরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগকে সচরাচর চক্ষে দেখা যায় না; একারণ প্রাচীন কালে কেহ ইহাদের পরিচয় জানিতেন না। ইহাদের ইয়ুরোপীয় নাম স্বতন্ত্র; কিন্তু অপর গ্রহদিগের নামের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য অধুনা তাহাদিগকে দুইটি হিন্দু দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে।

গ্রহ এবং উপগ্রহ ছাড়া সৌরজগতে অপর এক জাতীয় তারা আছে, তাহাদিগকে 'গ্রহকঙ্কর' কহে। ইহাদের সংখ্যা এক্ষণে চারি শতের অধিক। ইহারা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের কক্ষের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিয়া স্ব স্ব কক্ষে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহাদের আয়তন অতি ক্ষুদ্র; একারণ ইহারা চক্ষে দূরে থাকুক, সাধারণ ছোট দূরবীক্ষণেও দেখা যায় না। প্রায় এক শতাধিক বৎসর যাবৎ ইহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং এখন পর্য্যন্ত ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা যত বাড়িতেছে ততই অধিকতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহকঙ্কর দেখা যাইতেছে; এবং এইরূপ অনুমান করা যায়, যে কালে আরও অনেক বেশী গ্রহকঙ্কর দেখা যাইবে।

সৌর জগতের শেষ সীমা এখনও জানা যায় নাই। বরুণ গ্রহের কক্ষের বাহিরে অন্য একটি গ্রহ আছে, এইরূপ অনুমান বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতে ছিল। সম্প্রতি একটি নূতন গ্রহের আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; জ্যোতির্ব্বিদেরা মনে করিতেছেন যে ইহা বরুণ গ্রহ হইতে দূরবর্ত্তী একটি নূতন গ্রহ। ইহার আবর্ত্তন কাল প্রায় ৩০০ বৎসর হইবে, অতএব পৃথিবী হইতে লক্ষ্য করিলে তাহার গতি এত মৃদু দেখাইবে যে তাহার কক্ষের আকার ও দূরত্বাদি গণনা করিতে এখনও বহুকাল লাগিবে।

বুধ গ্রহের কক্ষের ভিতরে সূর্য্যের আরও নিকটে অপর একটি গ্রহ আছে, অনেক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করিতেন, এবং দূরবীক্ষণও অন্যান্য যন্ত্র সাহায্যে তাহাকে দেখিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এ যাবৎ কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। তবে ইহা সহজে অনুমান করা যায়, যে সৌরজগতের সকল সংবাদ এখনও জানা যায় নাই; আরও কি কি নূতন পদার্থ সৌরজগতে রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি যত বাড়িতে থাকিবে, আমরা ততই সৌর জগতের আরও নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব এইরূপ আশা করা যায়।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

ধ্রুবোপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪৫

ধ্রুবের বিনীত ভিক্ষা দয়াল-শ্রবণে,
পশিল যে উচ্চরবে আছে কি সংশয়?
প্রেরিলেন দেব ঋষি নারদে অগোণে,
দীক্ষাতত্ত্ব জ্ঞাপনার্থ চির প্রেমময়।

৪৬

ভক্ত ধ্রুব এসময়ে স্তিমিত নয়নে,
গম্ভীর সমাধি মগ্ন পূর্ণ অচেতন;
বহিতেছে প্রেমঅশ্রু স্মরি মনে মনে,
পরশ রতন হরি সন্তাপ হরণ!

৪৭

পশ্চাতে নারদ ঋষি দাঁড়ায়ে সুধীরে,
হেরেন স্বর্গীয় কান্তি উজ্জল কেমন
ধ্রুবের যুগল নেত্রে, প্রাণ যেন ফিরে
কোন সে স্বর্গের রাজ্যে আনন্দে মোহন!

৪৮

অকস্মাৎ ধ্রুব পাশে হেরিয়া নারদে
মহান তেজস্বী মূর্ত্তি গম্ভীর প্রকৃতি
প্রণমিল ভক্তিভরে, ওই দেব পদে;
দাঁড়াইল অচঞ্চল, সবিস্ময়ে অতি।

৪৯

শুধেন দেবর্ষি ধ্রুবে, হয়ে অগ্রসর,
"প্রিয় বৎস! দীনবেশে হেথা কি কারণ?
আমি নহি তিনি, তুমি অভিলাষী যাঁর
লভিবে কেমনে হায় সে দুর্লভ ধন?

৫০

"কত ঋষি যোগীগণ অবিশ্রান্ত যাঁর,
একাকী কঠোর যোগ করিয়া সাধন
দেখ বৎস! নাহি পান কভু দেখা তাঁর,
বালক যে তুমি, কেন অরণ্যে এখন?

৫১

ঈশ্বর যাহাকে যাহা করেন প্রদান,
আরো শুন বৎস ধ্রুব, বলিগো তোমায়,
সুখে দুখে সর্ব্বকালে যদি সেই জন,
থাকে তুষ্ট, তবে তার মোক্ষলাভ হয়।

৫২

"ক্ষান্ত হও শিশু ধ্রুব! বৃথা কেন আর,
ঈদৃশ কঠোর ব্রতে আগ্রহ তোমার?
ছাড় বন, গৃহে ফিরে যাও এইবার,
বৃদ্ধ বয়সেতে হেথা আসিও আবার।

৫৩

দেবর্ষির বাক্য কিন্তু ধ্রুবের হৃদয়ে
পশিল না একবার, আরো অবিচ্ছেদে
জ্বলিল পিপাসানল, দ্বিগুণ, নির্ভয়ে,
অনন্য গতির তুল্য পড়িল ও পদে।

৫৪

বিশ্বাস মুকুট শিরে, ভক্তিহার গলে,
অটল স্বর্গীয় বলে ধ্রুব কারে ডরে?
পর্ব্বত সমান বিঘ্ন আসুক ভূতলে;
কার সাধ্য হেন বল পরাজয় করে?

৫৫

কহিলেন স্থির কণ্ঠে "ওগো ভগবন্!
একে আমি দুর্ব্বিনীত ক্ষত্রিয় তনয়,
গুরুবাক্য নাহি লয়, আজি ক্ষুদ্র মন,
বিমাতার বাক্যে তাহে বিক্ষত হৃদয়।

৫৬

গুরো! যদিও সে দেব দুর্লভ চরণ
দুর্দ্ধর্ষ যোগীর তীব্র যোগ কিংবা ধ্যানে;
কৃপা করে দয়াময় তথাপি কখন,
প্রকাশিত করেছেন সাধক সদনে।

৫৭

ব্রহ্মন্! বাসনা মম হেরিতে জীবনে,
থাকে প্রাণ নয় যায় হরির চরণে,
লভিব দুর্লভ স্থান, আপন যতনে,
তাই ভিক্ষা শ্রেয়ঃ পথ বলুন এক্ষনে।"

দীক্ষা।

৫৮

সবিস্ময়ে ঋষিবর ক্ষণেক নীরবে
বুঝিলেন ধ্রুব নহে সামান্য তনয়,
ফিরাতে সংসার পথে আর কি সম্ভবে,
বিফল যতনে তীব্র, বৃথা বাক্যব্যয়।

৫৯

সুদৃঢ় ধ্রুবের মন দেখিয়া নারদ,
প্রশান্ত স্বর্গীয় নেত্রে ক্ষণেক চাহিয়া,
কহিলেন বৎস! তব মিলিবে সম্পদ,
বল হরি মন মাঝে প্রসন্ন হইয়া।

৬০

"অবিলম্বে তব দুঃখ যাইবে সুদূরে,
শান্ত সমাহিত চিত্তে আর ভক্তি যোগে,

বিনম্র দীনাত্মা সম, পরম ঈশ্বরে,
অহর্নিশি এক মনে সাধ অনুরাগে।

৬১

স্থির হও, স্নাত হও এই সরোবরে,
লহ হরিনাম মন্ত্র জীবন-আধারে;
তা' পর দ্বাদশ বর্ষ তপস্যার তরে,
সমর্পহ মন প্রাণ একাগ্র অন্তরে।

৬২

প্রসন্ন বালক ধ্রুব, যেন আচম্বিতে,
বাজিল স্বর্গীয় বীণা হৃদয় কুটীরে,
নিমেষে তাপিত প্রাণ লাগিল হাসিতে,
ধাইল নাচিয়া রক্ত যেন প্রতি শিরে!

৬৩

বহিল প্রেমের ঝড় সারা প্রাণে মনে,
টুটিয়া দুখের বাঁধ হৃদয় ভিতরে,
নারদের দেববাক্য গভীর স্বননে,
ধ্বনিল অশনি সম সকল অন্তরে!

৬৪

তোমরা কি প্রেম-অশ্রু দেখেছ কখনে,
সেই প্রেম-সুধা বিন্দু ধ্রুবাত্মা আকাশে
শোভিল অনন্ত বর্ণে স্বর্গীয় কিরণে;
দেখ নাই, ভাব নাই গভীর বিশ্বাসে।

৬৫

বহিল সহস্র ধারা ধ্রুবের নয়নে,
পড়িল ঝরিয়া চির আরাধ্য চরণে;
শত শত ভক্তিফুল নীরবে গোপনে
ফুটেছিল শিশুর যা হৃদয়-কাননে।

৬৬

প্রণমিয়া দেবর্ষির যুগল চরণ,
হরিষ অন্তরে ধ্রুব লইল বিদায়;
শিরে ধরি নারদের স্বর্গীয় বচন,
ছুটিলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের প্রায়।

৬৭

যমুনার তটবর্ত্তী মনোহর বনে,
উপনীত হইলেন মায়ে পাশরিয়া,
না ভাবি সংসার কথা বারেক কখনে
সঁপিলেন মন প্রাণ তপস্যা লাগিয়া।

৬৮

বিবশা জননী হেথা ব্যাকুল না হেরে,
বালক ধ্রুবের সেই কোমল আনন;
ডাকিলেন উচ্চে কত তীব্র শোক ভরে
বাছা ধ্রুব, কোথা ধ্রুব, বলিয়া সঘনে।

৬৯

শোক বেগে ধ্রুবমাতা নয়ন ধারায়
ভাসিলেন অহোরাত্র, অন্য কোন ধন
ইচ্ছে মন ইহলোকে কিংবা কি আশায়
ধরেন এ শোকানলে তাপিত জীবন।

৭০

হায়! ধ্রুব আজি অনন্ত ধরায়
বিস্মৃত জননী কোন মায়ার বন্ধনে,
ছিঁড়িয়া উড়িল যেন নভে তীর প্রায়
প্রবেশিল অন্যলোকে তাপস বসনে!

৭১

ঋষিবর এসময়ে রাজ সন্নিধানে,
উত্তরিলা প্রবোধিতে সন্তপ্ত রাজায়;
বিমর্ষ উত্তানপাদ নারদ সদনে
লাগিলা সজল নেত্রে কহিবারে হায়;—

৭২

মোহে বশীভূত মম পাষাণ হৃদয়,
সমাগত সুতে স্নেহে করিনি গ্রহণ;
হা দেবর্ষি! বল আজি ধ্রুব কোথা রয়,
ত্যজিয়া জনকে আহা! নিঠুর এমন?

৭৩

"স্থির হও হে রাজন্!" কহি তপোধন
আশ্বাস বচনে ধীরে প্রবোধি রাজায়;

বলিলেন একে একে ধ্রুব বিবরণ,
ক্ষণেক সুস্থির রাজা হইলেন তায়।

৭৪

শোকার্ত্তা জননী কিন্তু নারদ দর্শনে,
কাঁদিলেন আরো উচ্চে ভেদিয়া গগন,
তখন দেবর্ষি শত সান্ত্বনা বচনে,
কহিলেন বৎসে! কর দুঃখ সম্বরণ!

৭৫

ধ্রুব তব একমাত্র স্বর্গীয় রতন,
কেন বৃথা অহর্নিশি করিছ রোদন;
অনতি বিলম্বে ধ্রুবে দেখিবে এখন,
আসিছে অদ্ভুত কাজ করিয়া সাধন।

৭৬

কাঁদিওনা বাছা আর ভাসি আঁখিনীরে,
অচিরে তোমার ধ্রুব আসিবে ফিরিয়া,
তুলিয়া সত্যের ধ্বজা ত্রিলোক শিবিরে;
শুনাইব হরিনাম আনন্দে মাতিয়া।

(ক্রমশঃ)

জীবনের পথে।

২০এ শ্রাবণ। ভাল লাগেনা। পড়াতে বড়ই পিছাইয়া পড়িয়াছি; কি করিব বুঝি না, এত রাত্রি জাগিয়া পড়া করি, তবু কোনমতে পড়ায় কুলাইয়া উঠিতে পারি না। মা আবার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতে দেন না, সে দিন পড়িতে পড়িতে রাত্রি বারটা হইয়া গেল, মা আসিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন, কি করি? মার উপর বড়ই রাগ ধরে, রাগে গর গর করিতে করিতে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। কত বার চেষ্টা করি, রাগ করিব না, কিন্তু পারিয়া উঠি না, আর এমন করিলে কার রাগ না হয়? ইচ্ছামত পড়িতে পারিব না এ কেমন?

১লা ভাদ্র। কাল মাসিক উপাসনার মন্দিরে গিয়াছিলাম। খুব সুন্দর উপাসনা হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় আমাদের মনের প্রতি দুর্ব্বলতার জন্য যখন ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল! আমি তখন নিজের ত্রুটির দিকে তাকাইয়া এরূপ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম, যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারি নাই। হায়! আমি কবে ভাল হইতে পারিব? আচ্ছা, আমি এত ভাল হইতে চেষ্টা করি, তবুও পারিয়া উঠি না কেন? কিসে আমাকে ভাল হইবার পথে বাধা দেয়? কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। যাহা হউক, আমি আবার ভাল হইতে চেষ্টা করিব। একবারে না পারি, অনেকবার চেষ্টা করিব। আমার ভাল হইবার প্রবল ইচ্ছা, যেমন করিয়াই হউক ভাল হইতে হইবে।

১২ই ভাদ্র। আমার এক এক জন লোকের উপর কি এক রকম ভাব আছে, জানি না। ও ক্লাসের তরঙ্গিনী আমার দু চক্ষের বিষ; হাজার চেষ্টা করিলাম তবুও তাহার দিকে ভাল ভাবে তাকাইতে পারিলাম না। মেয়েটী অহঙ্কারীর শেষ। আর এমন জেঁকো মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিলাম না। মেদিনীপুর জুড়িয়া প্রকাণ্ড জমিদারী, প্রজারা এত কাপড় নজর দেয়, যে সম্বৎসর ইহাদের কাপড় কিনিতে হয় না, তার বাবার প্রবল প্রতাপ, মা দেখিতে খুব সুন্দরী, দিদি, অতিশয় পণ্ডিত, ঘরে বসিয়াই রাজ্যের যত বই পড়িয়াছেন, দাদা বিলাত হইতে মহা পণ্ডিত হইয়া আসিবেন, ইংরাজীতে তাঁহার অধিকার দেখিয়া বিলাত শুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গিয়াছে, এই রকম গল্প, যখন পা ছড়াইয়া বসিয়া করিতে থাকে, তখন আমার উহার জাঁক দেখিয়া হাড় শুদ্ধ জ্বলিয়া যায়, এক এক সময় ইচ্ছা করে, আচ্ছা করিয়া কয়েকটা কথা শুনাইয়া দিই। আমার উহাকে একেবারে ভাল লাগে না। পড়া শুনায় মূর্খের শেষ, কাজের মধ্যে ময়ূর সাজিয়া স্কুলে আসিয়া আপনাদের জাঁক করা, এই ত দেখিতে পাই। বাস্তবিক অহঙ্কারী লোক আমার বিষম ঘৃণার পাত্র। বিশেষতঃ অহঙ্কারী মেয়ে আমার চক্ষে অতি কুৎসিত দৃশ্য।

২৬এ ভাদ্র। মা আমাকে একটা বড় ট্রাঙ্ক ও একটা সুন্দর বড় পড়িবার ডেস্ক কিনিয়া দিয়াছেন। আর

আমার পুরাণ ডেস্ক সুরেশকে দিয়াছেন। মা বলিয়া দিয়াছেন, এখন হইতে তিনি আর আমার কাপড় রাখিবেন না, আমাকেই আমার কাপড় ট্রাঙ্কে গুছাইয়া রাখিতে, ধোবা বাড়ীতে ময়লা হিসাব করিয়া দিতে আমার নিজের ছেঁড়া কাপড় সারিতে ও আমার কাপড় ছোট আলনায় গুছাইয়া রাখিতে হইবে। আর আমার ডেস্কে আমার সমুদয় বই-কাগজ কলম দোয়াত ইত্যাদি রাখিতে হইবে, যেখানে যাহা রাখিতে হয় সেইখানেই থাকিবে, কোন জিনিশ যেন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া না থাকে, মা বলিয়া দিয়াছেন। আমি নূতন ট্রাঙ্ক ও ডেস্ক পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে আমার কতগুলি কাজ বাড়িয়া গেল ও কতদূর সতর্ক হইতে হইবে, তাহা যখন দেখিলাম, তখন আর আমার সে আনন্দ রহিল না মনে মনে বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। একটা নূতন সুন্দর জিনিশ পাইতে হইলে যদি এত ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তবে তাহা পাইয়া আর কি সুখ হইল? মার সকল কাজই এই রকম, দানের সঙ্গে সঙ্গে একটা দায়িত্ব দেওয়া তাঁহার একটা অভ্যাস। মা যা যা বলিলেন, তাই করিব বলিয়া আসিলাম, কিন্তু কি করিয়া করিব তাহাই আমার মহা চিন্তার কারণ হইয়াছে, আমি আমার জিনিশ পত্র গুছাইয়া রাখিতে বড়ই অপটু! প্রথম দুই একবার জিনিশ পত্র গুছাইয়া রাখিলেও সব সময়ে আমার সেরূপ গোছান থাকে না, কি জানি কিরূপে এলো মেলো হইয়া যায়। ডেস্কে বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, সুচ, সুতা, উল, ইত্যাদি বেশ গুছাইয়া রাখিলেও কয় দিন পরে এমনি বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, যে শেষে একখানা বই কিম্বা অন্য কিছু খুঁজিতে হইলে একবার বিছানার তলায় এক বার ডেস্কের পাশে দশবার দেরাজ টানিয়া সমুদয় জিনিশ পত্র ও সৃষ্টি উল্‌টাইতে হয়। এই জন্যই মার এই বন্দোবস্ত আমার একেবারে ভাল লাগিতেছে না। ইহা ভিন্ন ধোবার হিসাব রাখিতে ও সব ময়লা কাপড় গুলি জড় করিয়া ধোবা বাড়ী দিতে আমি বড়ই অক্ষম। কি জানি কিরূপে আমার অনেক কাপড় গোল হইয়া যায়, বিশেষতঃ মোজা, বালিসের ওয়াড় ইত্যাদি ছোট ছোট কাপড় ত কোন মতেই ঠিক রাখিতে পারি না হারাইয়া যাইবেই যাইবে। আর আমার ছেঁড়া কাপড় আমি সেলাই করি বটে কিন্তু মোজা রিপু করা আমার একটু ভাল লাগে না, এত দিন মা আমার সব ছেঁড়া মোজা সারিয়া দিতেন, কিন্তু এখন ত আর তাহা হইবে না এখন আমাকেই সব করিতে হইবে। মোজা সারিতে আমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ঘৃণা করি।

২৮এ ভাদ্র। এ বৎসর বর্দ্ধমান প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। রাশি রাশি লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে মারা যাইতেছে। খবরের কাগজে যখন ইহাদের দুঃখের কথা পড়ি, তখন প্রাণ যেন ফাটিয়া যায়। হায় আমি কি ইহাদের জন্য কিছু করিতে পারিব না? আমি যখন ঘরে সুখে স্বচ্ছন্দে পিতা মাতার যত্নে বাস করিতেছি তখন আমারই বয়সী শত শত ছোট মেয়ে ছেলে পিতা মাতা হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের অনেকে ত ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, কি ভয়ানক! আমি ইহাদের দুঃখ দূর করিতে কি করিব? আমার যদি খুব টাকা থাকিত, তাহা হইলে কেমন ভাল হইত! কিন্তু এখন কি করি?

২৫এ ভাদ্র। গত রবিবার ম্যালেরিয়া পীড়িত দুঃখীদের জন্য মন্দিরে বিশেষ উপাসনা ও দান সংগ্রহ হইয়াছিল। অনেকে অনেক টাকা দিয়াছেন, অনেক স্ত্রীলোক অলঙ্কার পর্য্যন্ত দিয়াছেন। সে দিন মন্দিরে রাশিকৃত চাউল ও পুরাণ কাপড়ের স্তূপ হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয়, যখন পীড়িত লোকদের অসহ্য যাতনা বর্ণনা করিতে ছিলেন, তখন আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা কি করিয়া বলিব। তাহাদের অসীম দুঃখ ও যাতনা ভাবিয়া আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারি নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া তাহাদের পাশে যাই। আমি ক্ষুদ্র অসহায় বালিকা আমি তাহাদের কি করিতে পারি? কিন্তু আমার যা কিছু আছে তাহা দিয়া, আমার অন্নের অর্দ্ধাংশ দিয়া যদি একটী ক্ষুদ্র বালিকা বা বালককে প্রাণে বাঁচাইতে পারিতাম তাহা হইলে জীবন সার্থক হইত। আচার্য্য মহাশয় যখন

তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে তাহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সুন্দর প্রার্থনায় আমি মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমিও তাহাদের জন্য বার বার প্রার্থনা করিয়াছি। প্রভু পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করুন এবং আমি যাহাতে তাহাদের কিছু উপকার করিতে পারি, তিনি আমাকে সেরূপ শক্তি ও আশীর্ব্বাদ দান করুন।

২৬এ ভাদ্র। কাল মন্দির হইতে আসিবার সময় পথে বাবা ও মার কাছে মেলেরিয়া পীড়িত লোকদের জন্য দান করিবার টাকা চাহিয়াছিলাম। বাবা বলিয়াছেন, অন্যের উপকার করিতে হইলে নিজের ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক। আমি যদি তাঁহার কাছ হইতে টাকা লইয়া দান করি তাহা হইলে বাস্তবিক আমার দান করা হইল না, কিন্তু বাবার দেওয়া হইল; সুতরাং সে দানে আমার কোন ফল নাই, কারণ তাহার জন্য আমাকে কোন স্বার্থ বা সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ বা কোন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। এজন্য বাবা বলিয়াছেন, আমাকে নিজে কোন রূপে উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের দান করিতে হইবে। আমি কিরূপে উপার্জ্জন করিব? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, এই শীতকালের জন্য তুমি যদি আমার জন্য গরম মোজা তৈয়ার করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে সে পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ প্রত্যেক মোজার দরুণ আট আনা করিয়া দিব। আর মা বলিয়াছেন, যে বাবার অনেকগুলি ছেঁড়া মোজা আছে, সেগুলি সারিয়া দিলে তিনি আমাকে দুই আনা করিয়া দিবেন। বাবাও মার এই কথায় আমি বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। আমি মোজা বুনিতে খুব ভাল বাসি, কিন্তু মোজা রিপু করিতে আমার একটুকুও ভাল লাগে না। সে যাহা হউক, আমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আমি এ সকল কাজ করিয়া দুঃখীদের জন্য কিছু উপার্জ্জন করিবই। একটুকু ক্লেশ স্বীকার কি আমি তাহাদের জন্য করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। আমার একটুকু বিরক্তিকর পরিশ্রমে যদি এক জন ক্ষুধিতের মুখে অন্নগ্রাস যায়, তবে সে আমার পরম সৌভাগ্য। কি আশ্চর্য্য! আমি দুঃখীদের কিরূপে উপকার করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম এখন দেখি, ঈশ্বর তাহার উপায় করিলেন। ইহাতেই বোধ হয়, বাস্তবিক সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিলে ঈশ্বর তাহার উপায় জুটাইয়া দেন। যাহা হউক, আমি আজ হইতেই কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

২৯এ ভাদ্র। এখন আমি বড় ব্যস্ত। আমার একমুহূর্ত্তও সময় নাই। বাবার জন্য ছয় জোড়া মোজা ও একটা কমফরটার করিব ভাবিয়াছি। আমি শীঘ্র শীঘ্র বুনিতে পারি না, তাই বড় অসুবিধা হইতেছে। আমি এখন খুব সকালে উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া পড়িতে বসি; পড়া তৈয়ার করিয়া বাকী সময় টুকু মোজা বুনি, স্কুলে যখন একটুকু অবসর পাই, মোজা বুনি। এখন আমি আগেকার মত খেলা ছাড়িয়া দিয়াছি। সে সব সময় আমি এই কাজে কাটাই। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও ইচ্ছানুরূপ কাজ হইতেছে না। এক জোড়া মোজা বুনিতে আমার তিন দিন লাগে; যাহা হউক, আমি কাজ করিয়া প্রাণে সুখ পাইতেছি। আমি যখন ভাবি, যে আমার এই পরিশ্রমের ফলে অন্ততঃ একটী লোকও ত উপবাসের দারুণ ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইবে তখন আমার অত্যন্ত আনন্দ হয় এবং এই পরিশ্রম কেমন লঘু বলিয়া বোধ হয়। আমাদের ক্লাসের আর আর মেয়েদের এই সব কথা বলিয়াছি। তাহারা অনেকেই সম্মত হইয়াছে। আমি স্কুল হইতে টাকা তুলিব স্থির করিয়াছি। ইন্দিরা ইহাতে ২০৲ টাকা দিয়াছে, আর আর মেয়েরা অনেকে যাহার যেমন সাধ্য, সেইরূপ পয়সা কাপড় ইত্যাদি দিয়াছে এবং অনেকে আমার মত সেলাই করিয়া টাকা দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

২০এ আশ্বিন। এতদিন দৈনিক লিপি লিখিতে পারি নাই। বড় ব্যস্ত ছিলাম। আমি এই কয় দিনে ছয় জোড়া মোজা ও একটা কমফরটার বাবার জন্য বুনিয়াছি। ইহার জন্য বাবার কাছে আমি ৩৸০ পাইয়াছি, আর বাবা আমাকে দুঃখীদের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আর ও দুই টাকা বেশী দিয়াছেন।

বাবাকে এইরূপ উৎসাহ দিতে দেখিয়া আমি কতকক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দে কথা কহিতে পারি নাই। বাবা আমার কেমন চমৎকার! আমাকে কেমন ভাল বিষয়ে উৎসাহ দেন! আমি এখন হইতে বাবার আরও অনুগত হইব। এমন ভাল বাবা আর কার আছে?

২৮এ আশ্বিন। দুঃখীদের জন্য যে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহা শেষ হইয়াগিয়াছে। বাবার ছেঁড়া মোজাগুলি রিপু করিয়া দিয়া আমি মার কাছে ১৷৷০ টাকা পাইয়াছি সেলাই করিয়া আমি সর্ব্বশুদ্ধ ৭৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, আর বাবা আমাকে যে মাসিক ৩৲ টাকা নিজের খরচের জন্য দেন, তাহা আমি এ মাসে অন্য কিছুতে ব্যয় না করিয়া দুর্ভিক্ষে দিয়াছি। দুঃখীদের জন্য এইরূপ সাহায্য করিয়া আমার প্রাণে যে কিরূপ আনন্দ হইতেছে তাহা কি বলিব। আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে দুঃখীদের কিছু উপকার করিতে পারিলাম।

(ক্রমশঃ)

হিমালয়ে একদিন।

১৩১৩ সালের ৯ই ভাদ্র শনিবার ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির পরেও আকাশের মেঘ কাটে নাই। কালো মেঘগুলি ঈশান কোণে জড় হইয়া গুমট বাঁধিয়া আছে। সকাল সকাল খাইয়া, বিছানায় শুইয়া, কম্বল মুড়ি দেওয়ার জোগাড়ে আছি, এমন সময়ে হাতে মোটা বাঁশের লাঠি, মাথায় চাদরের পাক, সপ্তরথীর মত সাত বন্ধু আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল "ওঠ, এখনি হিমালয়ে যাইতে হইবে।" বাপ্‌রে বাপ্! একি কথা! এই মেঘ, এই বাতাস, এই শীত, আবার বারটাও শনি এই অলক্ষণ দিনে পাহাড়ে যাইয়া প্রাণটা খোয়াইয়া যে বাহাদুরী, তার চেয়ে ঘরে বসিয়া দুটা চিড়ামুড়কি চিবাইলে এক সময়ে আরামচর্চ্চার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী' মানুষের এক একটা বয়সের এক একটা খেয়াল আছে, তাহা যেন সকল আরাম দূরে ঠেলিয়া অস্বাস্থ্য, দুঃখ ও হুড়াহুড়ির মধ্যেই মাথা জাগাইতে ভালবাসে। বৃষ্টির দিনে পাহাড়ে যাইয়া সাধ করিয়া কষ্টভোগ করা অপেক্ষা গৃহে বসিয়া থাকায় যে সুখ আছে, অন্ততঃ বৃষ্টিতে ভিজ্জাটাতে যদি নূতনতর সৌখীনতা হয়, তবে বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়াও যে তাহার আস্বাদন লওয়া যাইতে পারে, বন্ধুগণ এ যুক্তি মোটেই স্বীকার করিল না। তাই সকল যুক্তি, সকল আপত্তি অবহেলা করিয়া আমার একান্ত অনিচ্ছায় আমাকে হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল।

দিগ্বিজয়ী দিক্‌পালগণের মত আট বন্ধু যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, তখন গাড়ি আসিবার অনেক দেরী। কোচবিহার ষ্টেট্ রেলওয়ে বরাবর যে নিয়মে খোলা ছিল, ইতিমধ্যে তোষা নদীর আকস্মিক জলপ্লাবনে স্থানে স্থানে পুল ও রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সংপ্রতি সে নিয়ম উল্টাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই ট্রেণ দুদিনের মধ্যে একবারমাত্র গিতলদহ হইতে জয়ন্তী পর্য্যন্ত যায়। কোচবিহারে গাড়ি বৈকালে ২টা হইতে ৩টার মধ্যে পঁহুছায়। ভগ্নরাস্তার পুর্ণসংস্কার না হওয়ায় গাড়ি পঁহুছিবার সময় এখনো বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই।

আট বন্ধুর দুদিনের খোরাকী এক থলে চিড়া চিনি, শয়নের জন্য কম্বলাদি এবং আলোর সরঞ্জাম মোম ও ম্যাচবাতি সঙ্গে লইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ষ্টেশনে বসিয়া রহিলাম। তিনটার প্রাক্কালে ট্রেণ কোচবিহারে আসিয়া হাজির হইল। ট্রেণে উঠিয়া আট বন্ধুতে এক কামরা জুড়িয়া বসিলাম।

কোচবিহার হইতে জয়ন্তী ৩২ মাইল উত্তরে—এ স্থানে হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৷৷৵১৫ মাত্র। কোচবিহার ও জয়ন্তীর মাঝে চারিটা ষ্টেশন। ষ্টেশনগুলির প্রত্যেকটীর নামের সঙ্গেই ছোট খাটো একটু ইতিহাসের সংস্রব আছে।

প্রথম ষ্টেশনটীর নাম বাণেশ্বর। বাণেশ্বর হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ। ষ্টেশন ঘরের পাশে একটি বহু পুরাতন মন্দির আছে—এই মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত

বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের নামানুসারে এস্থানটীর নামকরণ হইয়াছে। বাণেশ্বর হিন্দু পুরাণোক্ত বাণরাজার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কিম্বদন্তী শুনা যায়। প্রত্যেক বৎসর শিব চতুর্দ্দশীর দিন বাণেশ্বরে বাণেশ্বর মেলা হয়। তখন দেশবিদেশের বহুযাত্রী এ স্থানে সমবেত হইয়া মহাসমারোহে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে।

বাণেশ্বর-মন্দিরের বাম পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী আছে। ইহার মধ্যে অনেক গুলি বড় বড় কচ্ছপ আছে। এই কচ্ছপগুলির বিশেষত্ব এই যে, কিছু খাদ্য দেখাইয়া 'মোহন' বলিয়া ডাক দেওয়া মাত্রই ইহারা ভাসিয়া উঠে, এবং আহ্বানকারীর সঙ্কেত মত ডাঙ্গায় উঠিয়া তাহার অনুসরণ করে। অনেকে তামাসা দেখিবার জন্য সঙ্কেত দ্বারা ইহাদিগকে ডাঙ্গায় উঠাইয়া হঠাৎ চিৎ করিয়া ফেলে ও বুকের উপর পাথর চাপা দিয়া রাখে। তখন আর ইহারা নড়িতে চড়িতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীতে একটা অতি বৃদ্ধ ও সুবৃহৎ কচ্ছপ ছিল। কোচবিহারের মহারাণী ইহার গায়ে নানাপ্রকার সোণা রূপার অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছিলেন। সংপ্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই বাণেশ্বর-ষ্টেশনে গাড়ি কয়েক মিনিট মাত্র থামে। গাড়ি থামিলে আমরা ষ্টেশনে নামিয়া শিব-মন্দিরটী দেখিয়া আসিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সাড়ে চারিটার সময় ট্রেণ আলিপুর দুয়ার ষ্টেশনে পঁহুছিল।

আলিপুর দুয়ার কোচবিহারের পর দ্বিতীয় ষ্টেশন। এই স্থানটী কালজানি নদীর পরপারে অবস্থিত। কোচবিহার ও ব্রিটিশরাজ্য এই কালজানি নদীদ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ-অধিকার প্রসারিত হওয়ার পূর্ব্বে ভোটান রাজ্যের দক্ষিণ সীমা আলিপুর দুয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে এ স্থানটী দমনপুর নামে আখ্যাত হইত। ভোটান যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ পক্ষের কর্ণেল্ পাটনাবাসী হেদায়েৎ আলি এই স্থানটী জয় করিয়া ব্রিটীশ অধিকার ভুক্ত করিয়া দেন। সেই সময় হইতে তাঁহারই গৌরবাত্মক নামের শেষার্দ্ধ অনুসারে দমনপুর আলিপুর নামে পরিবর্ত্তিত হয়।

কর্ণেল্ হেদায়েৎ আলি প্রথম জীবনে সামান্য শ্রেণীর সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রণপটুতা ও অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়া তিনি শেষ জীবনে কর্ণেল্ পদে উন্নীত হন। ভোটান যুদ্ধে তাঁহাকে বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া সৈন্য চালনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কৃতকার্য্যতা ও শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তৎকালীন সরকার বাহাদুর তাঁহাকে জলপাইগুড়িতে একটি জায়গীর প্রদান করেন। এখন তাঁহার পুত্র সেই জায়গীরের অধিকারী। এক্ষণে আলিপুর দুয়ার জলপাইগুড়ির অধীন ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি নাতিবৃহৎ মহকুমা।

এই হেদায়েৎ আলি সম্বন্ধে একটি উপদেশাত্মক সুন্দর ঘটনা শুনা যায়। ভোটান যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তিনি যখন তাঁহার উর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করিতে যান, তখন সাহেব তাঁহাকে সমাদর করা দূরে থাকুক, বসিবার জন্য একখানি আসন পর্য্যন্ত দিলেন না। রাজপুরুষের এই উপেক্ষা রণজয়ী হিন্দুস্থানীর অন্তরে দারুণ ক্রোধাগ্নি উৎপন্ন করিল। তৎক্ষণাৎ তিনি হুজুরের গালে স্বীয় পরুষ হস্তের ভীষণ চপেটাঘাত বসাইয়া দিয়া সদর্পে বলিয়া উঠিলেন 'চুড়া থাকে লড়াইকাওয়াস্তে হিদায়েৎ, আউর বেটা সব হুজুর!' (চিড়া খাইয়া লড়াইর জন্য হিদায়েৎ, আর বেটারা হুজুর)! এই এক চপেটাঘাতে সাহেব সোজা হইলেন এবং আরাম-কেদারা আনাইয়া হেদায়েৎকে বসিতে দিলেন।

আলিপুর দুয়ার হইতে হিমালয়ের দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখা যায়। কি বিরাট, কি সুন্দর ছবি! পর্ব্বতের প্রত্যেক শিখর অন্য শিখর হইতে বিভিন্ন, প্রতি বৃক্ষ অন্য বৃক্ষটি হইতে পৃথক, সকলই যেন সুস্পষ্ট গৃহচিত্রের মত মনে হইতে লাগিল। তখন আকাশের মেঘও অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, মেঘের পরদা ঠেলিয়া সূর্য্যের সান্ধ্যকিরণ পাটল আলোক বিস্তার করিতেছিল। অনতিদূরে পাহাড় সে আলোক রেখা প্রকৃতির হাসির মত ফুটিয়া উঠিতেছিল। চারি দিকের এদৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলেই তন্ময় হইয়া পড়িলাম।

আলিপুর দুয়ার হইতে ট্রেণ কখন ছাড়িয়া দিল, তন্ময় অবস্থায় তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। প্রায় ১৫।১৬ মিনিটের পর চাহিয়া দেখি, আমরা ভীষণ তরাইর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আলিপুর দুয়ার ষ্টেশন ছাড়াইয়া ২।৩ মাইল উত্তরে আসিলেই শাল, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষরাজি পূর্ণ দুর্ভেদ্য নিবিড় তরাই দৃষ্ট হয়। এই তরাই এস্থান হইতে উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সরিয়া একেবারে হিমালয়ের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। এই পথে চলিবার সময়ে বোধ হয়, যেন একটা তমসাচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ভীষণ জঙ্গল কোন্ মান্ধাতার আমল হইতে আদি অন্তহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

এই পথে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ট্রেণে ডবল আলোক জ্বালান হইয়াছিল সম্মুখের পথ তাহাতেই কতকটা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ট্রেণ খুব ধীরে চলিতেছিল। একে পার্ব্বত্য পথ, তার উপর ভীষণ জঙ্গল পদে পদে ট্রেণখানিকে শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছিল।

রেল লাইনের সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফের যে তার বরাবর চলিয়া গিয়াছে, তাহা বামদিকের জীবন্ত শালবৃক্ষগুলিতে আবদ্ধ। পূর্ব্বে যথারীতি টেলিগ্রাফ-পোষ্ট্ ছিল; কিন্তু কয়েকবার জঙ্গল হস্তিপাল ক্রমাগত তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়ায়, অবশেষে জীবন্ত গাছের উপর তারের ভার চাপাইয়া দিয়া সংপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত আছেন। তরাইর মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর যথেষ্ট উপদ্রব আছে। যখন এই পথে সর্ব্বপ্রথম রেল চলিতে আরম্ভ করে, তখন জঙ্গলা হস্তী বা মহিষের পাল ঘাড় বাঁকাইয়া রেল লাইনের উপর আসিয়া দাঁড়াইত। উহাদিগকে তাড়াইয়া রেল চালাইতে তখন চালকের গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হইত। অধুনা লোকসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল উৎপাত অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

এই সকল উৎপাত, উপদ্রব ও আশঙ্কার কথা স্মরণ করিতে করিতে কিছুকালের মধ্যে আমরা রাজা-ভাত-খাওয়া নামক তৃতীয় ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজা-ভাত-খাওয়া তরাইর মধ্যে সংস্থাপিত। এস্থানে ফরেষ্ট্ আপিসের যৎসামান্য কারবার চলিতেছে। ষ্টেশন হইতে তিনক্রোশ পশ্চিমে সাহেবদের কয়েকখানি চা-বাগানও আছে।

ষ্টেশন রাজা-ভাত-খাওয়ার নামকরণ সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। পাহাড়ী রাজ্য সমূহের মধ্যে, বিশেষতঃ ভোটানাধিপ ও কোচবিহারাধিপতির মধ্যে আবহমান কাল হইতে বিশেষ সৌহৃদ্য বর্ত্তমান আছে। মধ্যযুগে কিছুকাল ভোটান ও কোচবিহারের মধ্যে কিঞ্চিৎ অসদ্ভাব উপস্থিত হয়। উভয় রাজ্যের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন করিবার জন্য উভয় রাজ্যের রাজা এখানে মিলিত হইয়া আহারাদি করেন। তদবধি এস্থান রাজা-ভাত-খাওয়া নামে পরিচিত। কেহ কেহ আবার এই নামকরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। শেষোক্ত দলের মতে ভোটানও কোচবিহারের রাজাদ্বয় সন্ধি দ্বারা নষ্টমিত্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সন্ধির পরক্ষণেই কোচবিহারের তদানীন্তন রাজকুমারের অন্নারম্ভ বা ভাতখাওয়া-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে ভোটান রাজ কোচবিহারের রাজকুমারকে এই স্থানটি 'ব্যাভার স্বরূপে প্রদান করেন। সেই হইতে রাজা-ভাত-খাওয়া নামের উৎপত্তি।

এই রাজা-ভাত-খাওয়া ছাড়াইয়া কতক দূর উত্তরে গেলে বক্সার রোড্ নামক চতুর্থ ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের পরেই এ লাইনের সর্ব্বশেষ ষ্টেশন জয়ন্তী আমাদের গন্তব্য স্থান। এই স্থান হইতে হাঁটিয়া আমাদিগকে হিমালয়ে যাইতে হইবে।

যথা সময়ে রাজা-ভাত-খাওয়া হইতে বিদায় লইয়া এবং বক্সার রোড্ পথে ফেলিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে জয়ন্তী ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ষ্টেশনটী গভীর বনের মধ্যে স্থাপিত। ষ্টেশনের ঘরগুলি অত্যুচ্চ সুদৃঢ় মাচার উপর নির্ম্মিত। মাঝে মাঝে হস্তিপাল আসিয়া ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য বাড়ীর প্রাঙ্গনটী দুই তিন পল্লা টীনে ঘেরা এবং বড় বড় থামের বেড়া দেওয়া।

ষ্টেশনে পঁহুছিবামাত্র শুনিলাম, ঘণ্টা খানেক হইল,

একটা বাঘ ষ্টেশনের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গিয়াছে। রাত্রিযোগে বন্যমহিষাদি রাস্তার বাহির হইয়া বুনিয়াদের পল্লীগৃহের উপর যথেষ্ট উপদ্রব করিয়া থাকে।

রাত্রিকাল—সেদিন আট দণ্ডের মাত্র জ্যোৎস্না। শয়ন ত দূরের কথা, আঁধার হইতে না হইতে কোথায় একটু নিরাপদ আশ্রয় স্থান পাইব, আটটি প্রাণীর তাহাই প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। ষ্টেশন গৃহটিতে স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ষ্টেশন মাষ্টার বাবুটীরই হাত পা নাড়িবার সুবিধা হইতেছে না। সেস্থানে সে বেচারার পক্ষে আট বন্ধুর স্থান সঙ্কুলান করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা হইল না। দূরে একটি ডাকবাংলা ছিল, দুজন সাহেব পূর্ব্বেই তাহা অধিকার করিয়া আছেন। কাজেই এ সময়ে আমাদিগকে লইয়া মাষ্টার বাবুটি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অনেক ভাবনা চিন্তার পর স্থির হইল, সে রাত্রিতে আমাদিগকে মালগাড়ির মধ্যে বোঝাই হইয়া থাকিতে হইবে। কয়েকটি সজীব প্রাণী অতঃপর ব্রেক্‌ভ্যানে-দেওয়া-পুলিন্দার মত মালগাড়িতে পড়িয়া থাকিব, ইহা মনে করিয়া আমাদের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইলেও আপত্তির কোন কারণ ছিল না। “যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ”—আমরা সহজেই এ ব্যবস্থায় সম্মত হইলাম।

মালগাড়ির মধ্যে পুলিন্দার মত অবস্থান করিবার পূর্ব্বে উদরের ব্যবস্থা পাকা পাকি করিয়া লওয়ার কথা আমাদের মনে হইল। তৎক্ষণাৎ চিড়ার থলেটা লইয়া আটবন্ধু জলের সন্ধানে বাহির হইলাম। ষ্টেশন মাষ্টারের পুঁজি জলটুকু আমাদের মত অগস্ত্যমুনিদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইল না। কাজেই বাধ্য হইয়া নদীর দিকে রওনা হইতে হইল।

(ক্রমশঃ)

চোর ও ডাকাত।

বামুন বামুনী শুইয়াছিলেন
তাঁদের ছোট ঘরে;
সিঁদ কেটে এক চোর আসি তথা
প্রবেশিল অতি ধীরে।
জড় সড় হয়ে বামুন বলিল,
“বামুনী রক্ষা কর”,
হাসিয়া বামুনী বলিলেন ধীরে
“ন্যায়ের ভাষ্য পড়।”
এহেন সময়ে দস্যুদল আসি
দুয়ারে মারিল ঘা,
বামুন উঠিল চীৎকার করি
“এবার মলেম মা।”
চোর ভয়ে ভয়ে মাচার উপরে
হাঁড়ির ভিতরে লুকাল,
ক্যাস বাক্স আর চাবী গোছা দিয়ে
বামুনী বামুনে পাঠাল।
সেই সিঁদ দিয়া তর্কবাগীশ
বাড়ীর বাহির হইয়া
থানা অভিমুখে বীরের মতন
যাইতে লাগিল ছুটিয়া।
গৃহিণী তখন ডাকাত দলেরে
দিলেন দুয়ার খুলিয়া
ডাকাত আসিয়া ‘মার কাট কাট’
বলিতে লাগিল হাঁকিয়া।
গৃহিণী বলিল “মাচার উপরে
কর্ত্তা ঠাকুর রয়েছে,
টাকা কড়ি সব উঁহার নিকটে
কাপড়েতে বাঁধা রয়েছে”।
জন দু চারেক ডাকাত যাইয়া
চোরের টিকিটা ধরি
মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল
কোথা তোর টাকা কড়ি।
“কর্ত্তা আমি না কর্ত্তা বামুন,
পৈতা আমার গলে
(আমি) কর্ত্তা হইলে দেখিতে পাইতে”—
“দেখ্ তোর টিকি ঝোলে,”
—বলিল ডাকাত— “ওরে বেটা তুই
পৈতা ছিঁড়ে ফেলেছিস্!

লর্ড রিপণ

ART PRESS
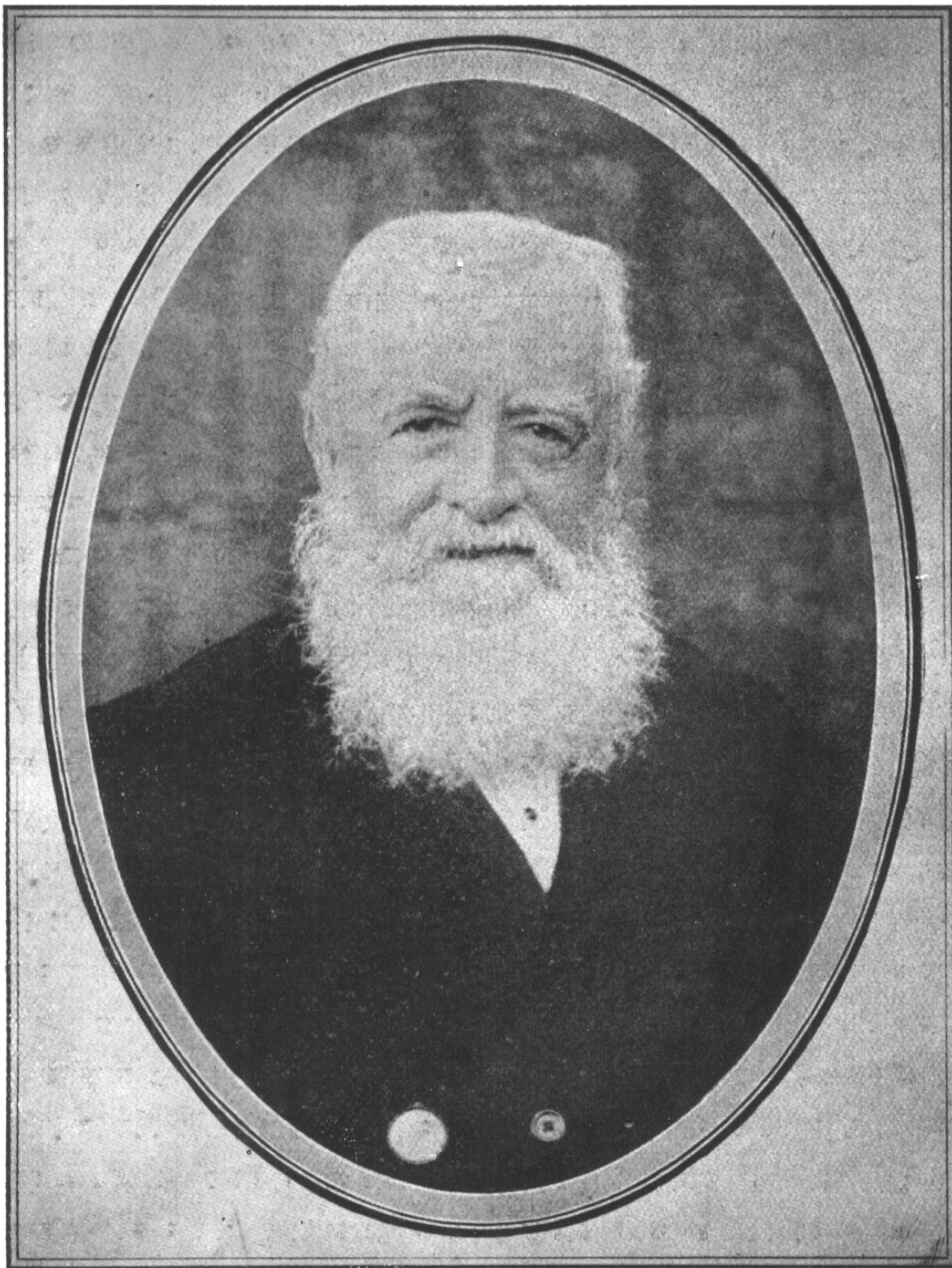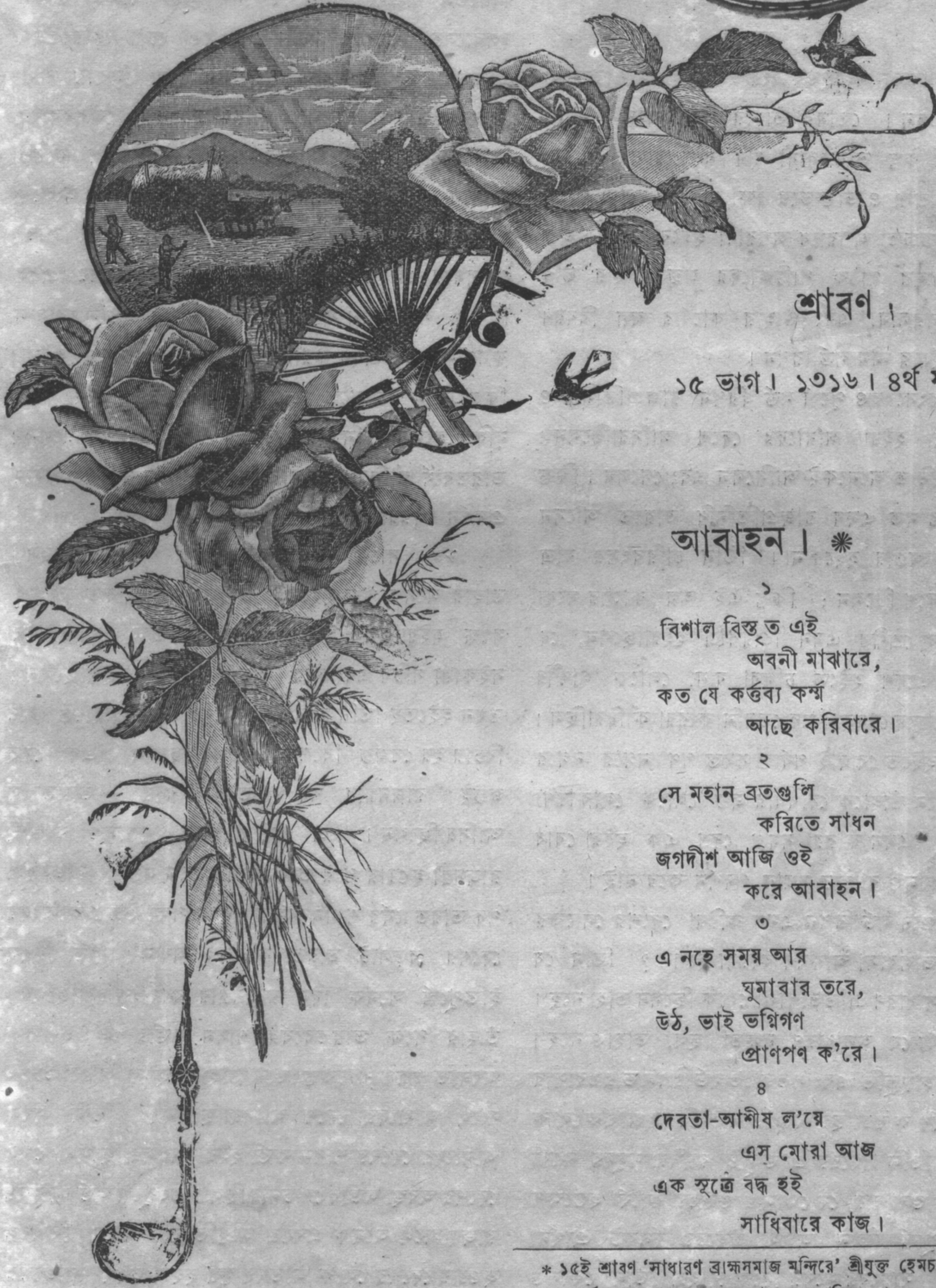
শ্রাবণ।

১৫ ভাগ। ১৩১৬। ৪র্থ সংখ্যা।

আবাহন। *

১

বিশাল বিস্তৃত এই
অবনী মাঝারে,
কত যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম
আছে করিবারে।

২

সে মহান ব্রতগুলি
করিতে সাধন
জগদীশ আজি ওই
করে আবাহন।

৩

এ নহে সময় আর
ঘুমাবার তরে,
উঠ, ভাই ভগ্নিগণ
প্রাণপণ ক'রে।

৪

দেবতা-আশীষ ল'য়ে
এস মোরা আজ
এক সূত্রে বদ্ধ হই
সাধিবারে কাজ।

* ১৫ই শ্রাবণ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে' শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, কর্ত্তৃক 'নব আবাহন বক্তৃতা শ্রবণে রচিত

ভারতবন্ধু লর্ড রিপন।

——:০:——

সম্প্রতি একজন মহানুভব ইংরাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তোমরা তাঁহার কথা জান কি না জানি না; কিন্তু ভারতবাসী যদি বংশপরম্পরা ধরিয়া তাঁহার স্মৃতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে রক্ষা না করে, তাহা হইলে তাহারা অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইবে। সেই জন্য আমরা মুকুলের পাঠক পাঠিকাদের জন্য তাঁহার ছবি প্রকাশিত করিলাম, এবং তাঁহার কার্য্যের স্বল্প বিবরণ দিলাম। ইঁহার নাম লর্ড রিপন।

পঁচিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে লর্ড রিপন রাজপ্রতিনিধি ও শাসন কর্ত্তা হইয়া আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধি ত অনেকেই আসিলেন এবং গেলেন। কিন্তু লর্ড রিপনের মত এমন রাজপ্রতিনিধি ভারতে আসেন নাই বলিলে অন্যায় হইবে না। তিনি চারিবৎসর মাত্র আমাদের দেশে ছিলেন; কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে দেশের সকল শ্রেণীর এমন প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, যে তিনি যখন এদেশ হইতে চলিয়া যান, লোকে আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদে যেমন কাঁদে,তেমনি করিয়া কাঁদিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত পথ নগরে নগরে ষ্টেসনে ষ্টেসনে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। এমন করিয়া সমগ্র দেশ এক হইয়া বোধ হয় আর কোনও ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শন করে নাই।

কোন গুণে লর্ড রিপন এমন করিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন? তিনি যে এক জন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন তাহা নহে। শাসন কার্য্যে যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, তাহাও নহে। আন্তরিক সহানুভূতি এবং সততাতে লর্ড রিপন ভারতবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমুদয় কার্য্য করিতেন। শুনা যায়, যে কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তিনি আগে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কোনও কাজ করিতেন না। আপনাকে ঈশ্বরের ভৃত্য জ্ঞান করিতেন, এবং মানুষের নিন্দাস্তুতি অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানের আদেশে তিনি চলিতে চেষ্টা করিতেন। এইজন্যই লর্ড রিপন বহু আন্দোলন এবং নিন্দার মধ্যে নির্ভয়ে কর্ত্তব্য পথে চলিতে পারিয়াছিলেন। যৌবনকালে তিনি আপনার পিতামাতার ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে লোকে রোমান ক্যাথলিক দিগকে অতিশয় ঘৃণা করে। সে সময়ে এই সাম্প্রদায়িক অবজ্ঞা ও ঘৃণা অতিশয় প্রবল ছিল। লর্ড রিপন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান; তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করায় দেশে তুমুল আন্দোলন হইল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহা সত্য বুঝিয়াছিলেন নির্ভয়ে তাহার অনুসরণ করিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া বার বার তিনি এই দৃঢ়চিত্ততার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৮০ সালে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হইয়াছিল। ১৮৬২ সালে তিনি ভারতবর্ষের সহকারী সচিব এবং পরে সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই তিনি ভারতবাসীগণের প্রতি যাহাতে ন্যায় বিচার হয় সেজন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন এবং সেই জন্যই রাজমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কোনও ব্যক্তিই রাজমন্ত্রী হওয়ার পরে ভারতবর্ষে আসেন নাই। রাজমন্ত্রীর পদ ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তার পদ অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশের বড়লাট ভারত সচিবের অধীন। লর্ড রিপন ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন রাজমন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তার পদ গ্রহণ করা অবনতি স্বরূপ; কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ১৮৮০ সালে আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন আমাদের দেশের শাসন কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তৎপূর্ব্বে লর্ড লীটনের রাজত্বকালে অনেক প্রকার অপ্রীতিকর আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় দেশের লোক অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। রাজস্বের

অবস্থা ভাল ছিল না; তাহার উপায় কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কর ভার আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল। লর্ড রিপন আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন। তাঁহার শাসনকালের বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যথা সময়ে ইতিহাসে তোমরা তাহা পড়িবে। এখানে তাঁহার দুই একটী কার্য্যের উল্লেখ করিয়া ভারতবাসীগণের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি ছিল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। লর্ড রিপন আসিয়া দেখিলেন, যে কাবুল যুদ্ধে ভারতবর্ষের কোনও উপকার নাই বরং অপকার হইতেছে। সেইজন্য তিনি যাহাতে অচিরে শান্তি স্থাপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন, আর এই যুদ্ধের ব্যয়ের অন্ততঃ কিয়দংশ যাহাতে ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বুঝাইলেন, যে এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের অপেক্ষা ইংলণ্ডের স্বার্থই অধিক। যদি সমগ্র ব্যয় ভার দরিদ্র ভারতবাসীগণকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে অবিচার হইবে। তাঁহার নির্ব্বন্ধে কাবুল যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে পাঁচ কোটী টাকা দেওয়া হয়।

লর্ড লীটনের শাসনকালে ভার্ণাকিউলার প্রেস য়্যাক্ট নামে একটী আইন বিধিবদ্ধ হয়; ইহা দ্বারা দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ পত্র সমূহের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল। দেশের লোক ইহার অতিশয় বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া লর্ড লীটন এক দিনে ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে এই অপ্রীতিকর আইন পাশ করেন। দেশের লোক ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করেন এবং এই আইন উঠাইয়া দিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে পর্য্যন্ত আবেদন করেন। কিন্তু তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন না। লর্ড রিপন এদেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে এই দোষাবহ এবং অপ্রীতি-কর আইন উঠাইয়া দিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

লর্ড রিপনের আর একটী স্থায়ী দেশ হিতকর কার্য্য শিক্ষা সংস্কার। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য সুশিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য তিনি একটী কমিশন নিযুক্ত করেন; এবং সেই কমিশনে যাহাতে দেশের লোকের মত ব্যক্ত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে পরলোকগত আনন্দমোহন বসু, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলাঙ্গকে তাহার সভ্য করেন। লর্ড রিপন শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক সুব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপনের বহু সদনুষ্ঠানের মধ্যে যাহার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে বিখ্যাত এবং যাহার জন্য তাঁহার নাম ভারত ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে তাহা স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন। এই মহানুভব ইংরাজ রাজপুরুষই ভারতে স্বায়ত্তশাসনের বীজ বপন করেন। ভারতবাসীদিগকে স্বদেশের শাসন কার্য্যে ধীরে ধীরে অধিকার প্রদানের উদ্দেশে তিনি ব্যবস্থা করেন যে মিউনিসিপালিটী, জেলা বোর্ড প্রভৃতিতে স্থানীয় লোকেরা আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, যে ক্রমে অন্যান্য বিভাগেও এই প্রথা অবলম্বিত হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী শাসন কর্ত্তাগণ লর্ড রিপনের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করেন নাই।

এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষ নিবারণ, দেশের সাধারণ অবস্থা উন্নতি প্রভৃতির জন্য তিনি অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন এবং করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এদেশবাসী ইংরাজগণ তাঁহার ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। লর্ড রিপনের ভারতপ্রেম ও ন্যায় নিষ্ঠার জন্য তাঁহারা প্রথম হইতেই তাঁহার বিরোধী ছিলেন। একটীর পর একটী করিয়া যতই তাঁহার জনহিতকর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল ততই তাঁহাদের বিদ্বেষ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে যখন লর্ড রিপনের ইচ্ছানুসারে সার কোর্টনী ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসী সিবিলিয়ান দিগকে ইংরাজ সিবিলিয়ানদের তুল্য অধিকার প্রদানের জন্য প্রস্তাব আনয়ন করেন তখন সেই বিদ্বেষ তুমুল ঝড়ের আকার ধারণ করে। সরকারী ও বেসরকারী ইংরাজগণ এক

হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা শুধু তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না তাঁহাকে নানা প্রকারে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইতে চুনাগলির ফিরিঙ্গীরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অজস্র গালাগালি দিতে লাগিলেন। লর্ড রিপন নীরবে অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের সেই অন্যায় এবং অভদ্র ব্যবহার সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আইনানুসারে অনেককে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু লর্ড রিপন তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি বলিতেন, ইহাদের যখন জ্ঞান হইবে তখন বুঝিতে পারিবে ইহারা কি অন্যায় কাজ করিতেছে। ভারতবাসীগণ তাঁহার সদাশয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা যেমন তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল, তেমনই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভারতবাসীগণ একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি যে দিন শিমলা হইতে ফিরিয়া আসেন, কলিকাতার লোকেরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান দেখাইবার জন্য বিরাট আয়োজন করেন। কলিকাতার সমুদয় সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য হাবড়া ষ্টেশনে সমবেত হন। ষ্টেশন হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে লক্ষ লক্ষ লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। লর্ড রিপনের সুবৃহৎ গাড়ী ফুলের তোড়াতে পূর্ণ হইয়াছিল; তাহার মধ্য হইতে কেবল তাঁহার মাথাটুকু দেখা যাইতেছিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছিল। যাঁহারা সে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনও তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

ইংরাজদিগের প্রতিকূলতায় লর্ড রিপন ইলবার্ট বিল আইনে পরিণত করিতে পারিলেন না; এমন কি তাঁহাকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন যে আমার এদেশের কাজ ফুরাইল বটে কিন্তু এদেশের জন্য কাজ ফুরায় নাই। বোম্বাই সহরে একজন ভারতবাসী বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষকে ভুলিবেন না।" তিনি তাঁহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "তাহা কি সম্ভব? ভারতবর্ষ যে আমার হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে।" একথা কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় নাই; মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত লর্ড রিপন ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলেই লর্ড রিপন ভারতবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। এক বৎসর পূর্ব্বে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; সাধারণতঃ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যাইতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও গুরুতর প্রশ্ন উঠিলে তিনি যষ্টিভর করিয়াও লর্ড সভায় উপস্থিত হইতেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের শাসনসংস্কার বিষয়ক একটা আইন পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। লর্ড সভায় যখন এই বিষয়ে আলোচনা হয় তখন লর্ড রিপন পীড়িত। পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ করিয়া এক জন বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচনার দিনে তাঁহার শরীর একটু ভাল হইল; তখন তিনি অতি কষ্টে পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইলেন, এবং একাশী বৎসরের বৃদ্ধ লর্ড সভায় দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিলেন। সেই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভারতবাসী এমন বন্ধু আর পাইবেন না।

তাঁহার নাম যদি ভারতবাসী স্বর্ণাক্ষরে আপনাদের দেশের ইতিহাসে লিখিয়া রাখে তাহা হইলেও যথেষ্ট হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ভারতবর্ষে লর্ড রিপনের স্মৃতি মূর্ত্তি নাই। কলিকাতায় ময়দানে এদেশের সকল বড়লাটের প্রতিমূর্ত্তি আছে; কেবল লর্ড রিপনের নাই। ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাঁহার শত্রু ছিলেন; তাঁহারা এবিষয়ে উদ্যোগী হন নাই। তাই তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী এই সদাশয় ভারতবন্ধুর স্মৃতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? পাথরের প্রতিমূর্ত্তি নাই; মুকুলের পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহাদের হৃদয়ে কি এই মহানুভব

ভারতবন্ধুর স্মৃতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে সযত্নে রক্ষা করিবেন?

"শাহ"।

আফ্রিকার আসান্টি জঙ্গলে প্রায় ৭০।৮০ বৎসর আগে এক বাঘিনী তার দুটি ছোট বাচ্চাকে ফেলে কোথায় চলে গিয়েছিল। কচি ছানা দুটি নিজের খাবার খুঁজে পেতে নেবার বয়স তাদের হয়নি, সেই জঙ্গলেই তারা দুই ভাই অনাহারে মারা যেত যদি না একজন পথিক তাদের দুর্দ্দশা দেখে দয়া করে এনে সেখানকার রাজাকে উপহার দিতেন। রাজবাড়ীতে দুই ভাই বেশ সুখেই ছিল, খেত, খেলত, নাচিয়া বেড়াত। একদিন দুজনে খেলে বেড়াচ্ছিল "শাহ" দেখতে বড়, গায়েও জোর বেশী, খেলতে খেলতে ভাইটির উপর এমন লাফা ঝাঁপি করল, তার বুকের উপর চড়ে এমন চেপে বসল যে সে দম আটকে মরে গেল। ভাইটি যখন মরে গেল, তখন তার দুঃখ হয়েছিল কি না জানিনে, কিন্তু রাজা বাহাদুর এত ভয় পেয়ে গেলেন যে তাকে তাঁর বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও রাখতে অস্বীকার করলেন, তখন হাচিনসান নামে এক জন ইংরাজ লাট সাহেব তাকে নিয়ে গেলেন। তিনি ব্যবসার বিষয় বন্দোবস্ত করবার জন্যে কিছু দিন হতে সেইখানেই বাস করছিলেন। সাহেবে আর বাঘের বাচ্ছায় খুব ভাব হয়ে গেল, দুজনে সর্ব্বদাই এক সঙ্গে থাকতেন, তাঁর সেখানকার কাজ শেষ হলে শাহকে নিয়ে তিনি সমুদ্রতীর ইংরাজ উপনিবেশে চলে গেলেন। দুই বন্ধুতে একত্রে আহার করতেন, সাহেবর পাশে শাহ নিতান্ত ভাল মানুষটির মত বসে থাকত, যা পেত তাই খেত, সচরাচর সে ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করত কিন্তু দু এক দিন যখন তার বড় বেশী ক্ষুধার তাড়না হত তখন সে না বলে কয়ে টেবিলের উপর হতে সাহেবের খাবার কাবাব করা আস্ত মুরগিটি চুরি করত; সেটি তার ভোগে আসত না, সাহেব তাকে ভদ্রতা শেখাবার উদ্দেশ্যে সেটি কেড়ে নিতেন, কিন্তু তাকে একেবারে বঞ্চিত করতেন না অন্য কিছু খেতে দিতেন। প্রথম প্রথম দুর্গবাসী ছেলে মেয়েরা তাকে বড় ভয় করত কিন্তু ক্রমে সে খুব পোষমানা হল, তখন সবারি সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল; আর যাতে সে কারো কোন হানি না করতে পারে সেই জন্যে তার তীক্ষ্ণ দাঁত আর নখ ঘষে ঘষে ভোঁতা করে দেওয়া হ'ল। যখন জায়গাটি তার বেশ চেনা হয়ে গেল, তখন সে দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে চারিদিকে ঘুরে বেড়াত, কেবল একটি ছেলে তার প্রহরীর মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। ছেলেটি পাহারা দিতে দিতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ত—তখন শাহ বেশ বুঝতে পারত তার বড় সুযোগ উপস্থিত। আস্তে আস্তে পালিয়ে গিয়ে মনের সুখে যেখানে ইচ্ছা খেলা করে বেড়াত, আর তার পাহারাওয়ালা জেগে উঠ্‌বার আগেই সুবোধ ছেলেটির মত আপন স্থানে ফিরে আস্‌ত। একদিন অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে খেলা করে ফিরে এসে দেখে তার পাহারাটি তখনও ঘুমচ্ছে, শাহ দেখ্‌লে বড্ড বাড়াবাড়ি তাকে একটা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এই মনে করে যেই তার মাথায় একটা থাপ্পড় দিলে সে একেবারে ফুটবলের গোলার মত ঘুরতে ঘুরতে কোথায় গিয়ে পড়ল, ঘুমতো ভাঙ্গলই, সৌভাগ্য যে হাড়গুলো আস্ত রইল।

শাহকে সবাই খুব ভাল বাস্‌ত, কিন্তু তার নিজের আবার কতকগুলি বিশেষ প্রিয় পাত্রছিল, লাট সাহেবকে সে সব চেয়ে বেশী ভালবাস্‌ত, তাঁকে একেবারে চোখের আড়াল করত না। যখন তিনি কাজে চলে যেতেন তখন সে গিয়ে বৈঠকখানার বড় জানালার সম্মুখে বসে থাকৃত সেখান হতে চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত কোথায় কি হচ্ছে সব দেখ্‌তো আর তার প্রভু যখন কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরতেন, তখন সেই সব প্রথম তাঁকে দেখ্‌তে পেত। এই সময় তার পূর্ণ বয়স হয়েছিল শরীরটিও প্রকাণ্ড হয়ে উঠল, যেখানে বসত সেখানে অনেকখানি জায়গা অধিকার করত, ছেলেরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে কিছুই আর দেখতে পেত না; তাই তারা এক একদিন বড় চটে যেত আর সকলে মিলে লেজ ধরে এমনি টানাটানি করত যে খানিকক্ষণ পরে বাধ্য হয়ে তাকে সরে বসতেই হ'ত।

আশ্চর্য্যের বিষয় বিদেশী ইংরাজদের চেয়ে তার স্বদেশী কাফ্রিরাই তাকে বেশী ভয় করত। শাহ আমোদ করতে বড় ভালবাসত, একদিন মজা করতে গিয়ে এক কাফ্রি বুড়ীকে প্রায় মেরে ফেলেছিল আর কি। বুড়ীটার কাজ ছিল সমস্ত বাড়ী ঝাঁটপাট করা একদিন সকালে উঠে বুড়ী ঘরগুলো ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে, একটা ঘরের কোণে অনেক ধূলো জমেছে দেখে বুড়ী উপুড় হয়ে সেইখানটা খুব ঝাঁটাচ্ছে এমন সময় বলা কওয়া নেই শাহবাহাদুর এসে হঠাৎ তার পিঠের উপর চড়ে পড়লেন। আর নড়বার নাম নাই সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন চারিদিকে অন্য যে সব চাকর দাসীরা ছিল তারাতো বাবা গো, মাগো, মলাম গো বলে যে দিকে চোখ যায় উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। বুড়ী আর কি করে মরার মত পড়ে রইল, আর বড় দেরী নাই জেনে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপতে লাগল। এই কান্নাকাটি গোলমাল শুনে লাট সাহেব এসে দেখেন, শাহ জীবন্ত যমের মত বুড়ীর পিঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিছুতেই নামছে না তিনি শাসন করতে তবে নেমে এল।

ডাচেস অব ইয়র্ক নানা জাতীয় জন্তু পুষতে বড় ভালবাসতেন, তাই লাট সাহেব ঠিক করলেন, তাঁর জন কয়েক বন্ধুর সঙ্গে শাহকে ইংলণ্ডে ডাচেসের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এ যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন আফ্রিকা হতে বিলাত যেতে অনেক দিন লাগ্‌ত, আর তখন ঝড় বৃষ্টি ছাড়া পথের বিপদও অনেক ছিল। এক জন ভদ্র ইংরাজ মহিলার তত্ত্বাবধানে শাহ যাবে স্থির হল। তাকে পূরে নিয়ে যাবার জন্যে লোহার শিক দিয়ে ঘেরা একটা খুব শক্ত খাঁচা তৈয়ারী হতে লাগল, এই অবসরে ভদ্র মহিলাটী তার সঙ্গে ভাব করে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি তার সঙ্গে গল্প ও খেলা করতেন, জন্তু বশ করবার এই প্রধান উপায়। শাহ সহজেই দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করত, চেহারাটি বড় সুন্দর ছিল, নরম হলদে রেশমী চামড়ার উপর বড় বড় কাল গুল বসান, আর এমনি একটি আদুরে ধরণ ছিল, যে দেখত, সেই ভালবাসত। অনেক জন্তু, অনেক বুদ্ধিমান লোকও তার মত খাঁচায় বন্ধ হয়ে যেতে হ'লে বিশেষ গোলযোগ করত, কিন্তু শাহ চিরকাল আদর যত্নে লালিত পালিত হওয়ার তার ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তার প্রভু তার জন্যে যা করেন তা তার ভালর জন্যই করেন। তাই খাঁচার ভিতরও সে বেশ সন্তুষ্ট মনেই ছিল কোন উপদ্রব করেনি। সমুদ্র যাত্রার প্রথম দিনই তার জীবন যাত্রার শেষ হবার উপক্রম হয়েছিল। শাহকে খাঁচায় পূরে একটা ডিঙ্গী নৌকায় করে জাহাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, সেখান হতে খাঁচাটা দড়িতে বেঁধে জাহাজে টেনে তুলে দেবে, যে সব কাফ্রির উপর এই জাহাজের ভার ছিল, তারা খাঁচাটার কাছে যেতে এম্নি ভয় পেলে যে ইতস্ততঃ করতে করতে খাঁচাটা সমুদ্রে পড়ে গেল তখনি জাহাজের নাবিকেরা তাড়াতাড়ি নৌকা নিয়ে গিয়ে সেখান হতে তাকে উদ্ধার না করলে সে আর বাঁচত না। যাইহোক এর পর দিন কত সে ভারী মুষড়ে ছিল, কিছু খেত না, মুখ তুলত না, খাঁচার একটি কোণে শুধু চুপটি করে পড়ে থাকত, মেম সাহেব তার জন্য বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়ে ছিলেন, কিন্তু তোমরা সবাই বোধ হয় জান যে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে না গেলেও সমুদ্র যাত্রায় তরঙ্গের দোলা খেয়ে খেয়ে যাত্রীদের এমন অবস্থা হয় যে আর কিছু খাবার ইচ্ছা বড় থাকে না, আর কিছু খেলেও তা পেটে থাকে না। কিছু দিন নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে এক দিন তার মেম সাহেবের গলার স্বর শুনে সে উঠে বসল, তারপর খাঁচার মধ্যে আনন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগল, চীৎকার করতে লাগল আর কেমন করে তাঁর কাছে যাবে সেই চেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠল যখন সে একটু শান্ত হল তখন মেম সাহেব খাঁচার মধ্যে হাত দিয়ে তার সঙ্গে "সেক হ্যাণ্ড" করলেন। সেই অবধি সে একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেল। "গোপালে"র মত যা পেত তাই খেত।

শাহ ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ অত্যন্ত ভালবাসত; হিংস্র জীব, চিরকাল বনে বাস, পশু শীকার করে জীবন ধারণ করেছে তার যে কোথা থেকে এমন সৌখীন রুচি জন্মাল

কে জানে? কিন্তু কেউ যদি ল্যাভেণ্ডার দেওয়া রুমাল নিয়ে তার খাঁচার কাছে যেত সে তৎক্ষণাৎ সেখানি কোন সুযোগে কেড়ে নিত, তার উপর মুখ গুজে পড়ে থাকৃত আর আনন্দে রুমাল খানিকে নিয়ে এম্নি টানাটানি করত যে তার আর বড় কিছু বাকী থাকৃত না। মেম সাহেব শাহের এই সখটি জানতেন সপ্তাহে দুদিন একটা ঠোঙায় ল্যাভেণ্ডার পূরে খাঁচার ভিতর দিতেন। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ পাবামাত্র সেই খানেই সে পড়ে থাকৃত, আনন্দে গর্জ্জন করত, আর যতক্ষণ একটু সুগন্ধ পাওয়া যেত, ততক্ষণ আর সেখান হতে কোন মতেই নড়ত না। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হত, ভোজনের চেয়ে ঘ্রাণেই তার পূর্ণ পরিতোষ হয়।

কোনও কারণে যে জাহাজে শাহ যাত্রী হয়েছিল, সে খানি গাবুন নদীতে প্রায় দুমাস ধরে নোঙর করে ছিল; এই সময় শাহ অনেকটা স্বাধীন ভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পাইত, কিন্তু গ্রাম হতে যে সব কাফ্রিরা খাবার জিনিস বিক্রী করতে আসত, তাদের উপর সে এমন আক্রোশ দেখাত যে বাধ্য হয়ে তাকে বন্ধ করে রাখতে হত। শূয়োর ছানা গুলোকে একেবারেই দেখতে পারত না আর হনুমান তো দু চক্ষের বিষ ছিল। এক বার এক জন কাফ্রি বণিক নাবিকদের কাছে একটি হনুমান বিক্রী করতে এসেছিল, সেটাকে দেখে সে পাগলের মত এমনি লাফঝাঁপ চীৎকার করেছিল, যে পালাতে গিয়ে বাঁদরটা অনেক জিনিস পত্র ভেঙ্গে ফেলেছিল। বাঁদরটার ভয় ভাঙ্গাতে কিছুকাল গিয়েছিল কিন্তু ব্যাঘ্র মহাশয়ের রাগ কখনই যায়নি রাত দিন তার আর অন্য ধ্যান জ্ঞান ছিল না বাঁদরটা কি করছে, কোথায় আছে শুধু সেই দিকেই দৃষ্টি। যদি মনে করত যে কাছাকাছি এসেছে তবে অমনি খাড়া হয়ে বসে, ঘাড় বাঁকিয়ে, লেজ আস্ফালন করে গর্জ্জন করতে থাকতো, অথচ শিশুকাল হতে সে কখন কোন জীব হিংসা করেনি।

অনুকূল বাতাসে পাল ছড়িয়ে দিয়ে জাহাজ খানি কিছুদিন পরে বদ্ধ সঙ্কীর্ণ নদী গর্ভ ছেড়ে, অনন্ত প্রসারিত সমুদ্রে গিয়ে পড়িল। তখন জল দস্যু দের বড় উপদ্রব ছিল, একদিন তারা সদল বলে এসে জাহাজে যা কিছু মূল্যবান ছিল, এমন কি আহার্য্য দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত সব লুট করে নিয়ে গেল। কেবল খাঁচা ভরা তিনশ আন্দাজ টিয়াপাখী ছিল সে গুলকে ফেলে গেল এদিকে জাহাজ যতই ইউরোপের কাছাকাছি হল, ঠাণ্ডা সহ্য না করতে পেরে পাখীগুলি ততই মরে যেতে লাগ্‌ল শাহকে এই মরা পাখীগুলো খেতে দেওয়া হত একে ঠাণ্ডা তাতে প্রতিদিন পালক শুদ্ধ পাখী খেয়ে সেও অসুখে পড়ল, তার জর হল। বাঘের জর হলে কি করে জানা যায় জান? তার নাকে হাত দিয়ে দেখ্‌তে হয় নাকটা যদি খুব গরম হয় তাহলেই বুঝতে হবে তার জর হয়েছে। শাহ আর নড়েচড়ে না, মনে হল বুঝি আর বাঁচবেনা, তখন তার মেম তাকে খাঁচার বাহিরে এনে জাহাজের ছাদের উপর শুইয়ে রাখলেন। সুস্থ শরীর হলে সে ছাড়া পেয়ে কত আহ্লাদই করত কিন্তু তখন তার আর সে শক্তি ছিলনা। মেম সাহেবের কোলে মাথা দিয়ে একেবারে চুপ করে পড়ে থাকত। মেম সাহেবের কাছে জরের ভাল ওষুধ ছিল এক দিন শাহের প্রহরী তার মুখ হাঁ করিয়ে ধর্‌লে আর তিনি তাকে তিনটি গুলি খাইয়ে দিলেন। যত্ন শুশ্রূষা, নিয়মিত ঔষধ পথ্য পেয়ে, সে ক্রমে আবার সুস্থ হয়ে উঠিল ইংলণ্ডে পৌছে ডাচেস্ অবইয়র্কের কাছে খুব আদর পেল, তিনি তার রূপগুণে একেবারে মুগ্ধ হলেন। লণ্ডনে কিছু দিনের জন্যে একটি ভদ্রলোকের কাছে তাকে রেখে দিলেন। তার কাছে শাহ খুব সুখেই ছিল, ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে বেড়াত আর পেট ভরে খেতে পেত। ডাচেস এসে তাকে দেখতেন ও তার সঙ্গে খেলা করতেন। লণ্ডনের বাহিরে পল্লীতে তাঁর প্রকাণ্ড অট্টালিকা শাহের জন্যে ঘর তৈয়ারি হচ্ছিল, সেইটি শেষ হলেই তাকে সেখানে নিয়ে যাবেন ঠিক ছিল। কিন্তু যে দিন সেখানে যাবেন, সেই দিন সকালে তাঁর কোচম্যান শাহকে আনতে গিয়ে দেখে সে মরে গেছে। রাতে কি রকমে ঠাণ্ডা লেগে তার ফুসফুস ফুলে উঠেছিল, অল্পক্ষণ কষ্ট পাবার পরই তার মৃত্যু হয়। যাইহৌক শাহবাহাদুরের জন্যে আমরা দুঃখ করবনা, বনের বাঘের পক্ষে তার

জীবনটা সুখেই কেটেছিল, কখনো খাবার কষ্ট পায়নি, কত লোকের আদর যত্ন পেয়েছিল, আর মৃত্যুও যেন তাকে ভালবেসে নিয়ে গিয়েছিল, বেশীক্ষণ বেশী কিছু কষ্ট দেয়নি।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

হিমালয়ে একদিন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জয়ন্তী ষ্টেশনের কয়েক পা উত্তর পশ্চিমকোণে এই নদীটী নদীটীরও নাম জয়ন্তী। ইহারই উত্তর পারে বিরাটকায় দিগন্তব্যাপী হিমালয়। জয়ন্তী নদী ইংরাজও ভোটান অধিকারের সীমা নির্দ্দেশক প্রাকৃতিক চিহ্ন। ইহার এ পারে ইংরেজের ও ওপারে ভোটানের অধিকার। আলিপুর দুয়ার হইতে জয়ন্তী পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ মাইল ব্যাপী স্থান ইংরেজের অধিকার ভুক্ত। এই স্থান দখল করিবার পূর্ব্বে ইংরেজ রাজ ভোটানরাজকে নগদ বিশ হাজার টাকা সেলামী দিয়াছিলেন। এখনও এই স্থানের খাজনা বাবদ ভোটানাধিপতি ইংরেজের নিকট হইতে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন।

জয়ন্তী নদীর তীরে বসিয়া আমরা আট বন্ধু ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া চিড়া খাইতে লাগিলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ সম্মুখে পাথরের গুঁড়ি ভাসাইয়া ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বেগবতী স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে। ওপারে বিরাট, বিপুল, বিশাল দৃশ্য হিমালয়, কি সুন্দর কি সুন্দর! যে দিকে চাই আঁখি জুড়ায়, যাহা দেখি তাহাতেই প্রাণ মুগ্ধ করে।

বহুক্ষণ এস্থানে বসিয়া রহিলাম বহু ক্ষণ এস্থানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কতকক্ষণ পরে চমক ভাঙ্গিল চাহিয়া দেখি তত ক্ষণে জ্যোৎস্নাটুকু অস্ত গিয়াছে। আমার হাত ধরাধরি করিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম এবং মালগাড়ি আশ্রয় করিয়া সে রাত্রির মত প্যাক্ হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পরদিন জয়ন্তী নদী পার হইয়া মহাকাল যাওয়ার কথা। মহাকাল ভুটিয়াদের প্রধান তীর্থ। মহাকাল পর্ব্বতের উপর তাঁহাদের মহাকাল নামক ভগবান প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির দিন সমস্ত ভুটিয়া এস্থানে মিলিত হইয়া মহোৎসব সহকারে মহাকালের পূজা করে।

অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া নিকটস্থ বুনিয়া পল্লী হইতে একজন গাইড্ ডাকিয়া অনিলাম এবং তাহার অধিনায়কতায় আমরা মহাকাল দর্শনে যাত্রা করিলাম। জয়ন্তী নদী পার হইয়া হিমালয়ের গা দিয়া চলিতে চলিতে দক্ষিণে অত্যুচ্চ মহাকাল-পর্ব্বতের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে গুহার মধ্যে মহাকালদেব প্রতিষ্ঠিত।

মহাকাল যাওয়ার পথ অত্যন্ত দুর্গম। একে তো পার্ব্বত্য নদী ভয়ঙ্কর বেগশালিনী, তাহার উপর বর্ষাকালে ইহা চতুর্দ্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত পথটাকেই আটক করিয়া রাখিয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া এইরূপ কত নদী যে আমাদিগকে পার হইতে হইল, এবং পার হওয়ার সময়ে জলের স্রোতে কতবার যে পড়িতে হইল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইহাতেই কি আবার নিস্তার আছে?—এক এক স্থানের সঙ্কীর্ণ, পিছল ও উচ্চনীচ অতিক্রম করিতে যেন আমাদের নাভীশ্বাস উপস্থিত।

এইরূপ প্রায় চারি মাইল পথ হাটিয়া একটা জলপ্রপাতের সম্মুখে আসিলাম। এই প্রপাতটী দেখিবার জিনিষ বটে! প্রায় ৩০০ হাত উপর হইতে একটা জলস্রোত শূন্যপথে নীচে নামিয়া আসিতেছে অর্দ্ধপথ আসিতে না আসিতেই স্রোতটী সূক্ষ্মতম শত ধারায় বিভক্ত হইয়া মাটীতে প্রায় ৫০ হাত স্থান ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই প্রপাতটী যে স্থানে ভূমিস্পর্শ করিয়াছে সে স্থানের মাটী একেবারে গৈরিকময়ী। জল লাগিয়া মাটি ভিজিয়া গৈরিক রস নির্গত হইতেছে, সে রস ধারায় অল্প জল লালে-লাল হইয়া গিয়াছে।

এস্থানে দাঁড়াইয়া কালিদাসের "গৈরিকময়ী ধাতুময়্যাম্" বাক্যটী স্মরণ করিলাম। মুহূর্ত্ত পরেই আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় আরো এক মাইল হাঁটিয়া এবারে মহাকালের পাদমূলে পঁহুছিলাম।

মহাকাল পর্ব্বতটী তিন হাজার ফিটের অধিক উচ্চ। উপরে উঠিবার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও পিচ্ছল। ভুটিয়ারা বলে বাবার (মহাকালকে তাহারা 'বাবা' বলে) ভক্ত ছাড়া এ পথে কেহ উঠিতে পারে না।

পাহাড়ের প্রায় এক পা পথ, তাহাও আবার বিষম পিচ্ছল। এক জন আর এক জনকে ঠেলিয়া ধরিয়া, লতা পাতা ধরিতে ধরিতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় সকলে মহাকালের শিখরে উঠিলাম। এই স্থানটী মন্দিরের দ্বার প্রান্ত; ইহার উপরও প্রায় ২০ ফিট উচ্চে পর্ব্বতের উপর মন্দিরাকৃতি একটি গুহা আছে, তাহাই প্রকৃত মন্দির। দ্বার প্রান্ত দিয়া এই মন্দিরে উঠিবার পথ অতি ভয়ানক; স্বাভাবিক কোন পথই নাই, দ্বার প্রান্ত হইতে মন্দির দ্বার পর্য্যন্ত খাড়া করিয়া একটি লতা দেওয়া আছে, তাহা ধরিয়া ধরিয়া উঠিতে হয়। এই পথটুকু তালগাছের খাড়াই এর মত এমন ভয়ানক, যে কেহ হঠাৎ এস্থান হইতে পড়িয়া গেলে তাহার দেহ অবাধে তিন হাজার ফিট উপত্যকা ভূমিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যায়, নিচে মধ্য দেশে আশ্রয়ের সম্ভাবনা মাত্র থাকে না। আমরা রক্তের সম্পর্কাধীন হইলে এ পথে যে একে অন্যকে সহজে উঠিতে দিতাম, সেরূপ বোধ হয় না। এক বন্ধু যখন উপরে উঠিয়া পড়িলেন, তখন বাহাদুরী হারাইবার ভয়ে অন্য সকলে কষ্টেসৃষ্টে উঠিতে লাগিলাম, কাঁপিতে কাঁপিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোন প্রকারে তো মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এখন মন্দির প্রবেশ, সেও এক বিষম সমস্যা! দ্বার দেশে সংলগ্ন এক খানি পাথর মন্দির দ্বারটীকে দুই ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। স্থূল দেহের পক্ষে এ সঙ্কীর্ণ পথে গলিয়া ভিতরে যাওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদেরও এক জন মোটা ছিলেন, কাত হইয়া দ্বার গলিতে যাইয়া তিনি তো বিষম বিপদ করিয়া তুলিলেন। একে তো মোটা, তার উপর শুইয়া কাইত হইয়াছেন, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় তখন তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিতেই আমাদের গলদঘর্ম্ম! যাক্, কোন প্রকারে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বাহিরে রাখিয়া আমরা সাত জন ভিতরে গেলাম। হতাশ বন্ধু বাহিরে বসিয়া তখন মন্দিরের গায়ে লোহার তারে বাঁধা ঘন্টা নাড়িয়া "দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে" লাগিলেন!

মন্দিরের ভিতর গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে তো অবাক হইলাম, হায়, ইহা দেখিবার জন্যই এত কষ্ট! মন্দিরের ভিতর জোড়া জোড়া তিন খানি ক্ষুদ্র পাথর, ইহার মধ্যে এক খানি অপেক্ষাকৃত একটু বড়। এই বড় পাথর খানির মাথার উপরে ছাদে সংলগ্ন জটাকৃতি কয়েক খানি পাথর হইতে জল চুয়াইয়া পড়িতেছে। ভুটিয়াগণ এই জটাকৃতি পাথরগুলিকে মহাকালের জটা ও জোড়া পাথর তিন খানিকে যথাক্রমে মহাকাল, গৌরী ও নন্দী বলিয়া থাকে। ইহা অধিকক্ষণ দেখিবার জন্য আমরা আর আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে মন্দির ত্যাগ করিয়া গাইডের প্রদর্শিত পথে আমরা জয়ন্তী ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ষ্টেশনে পঁহুছিতে পঁহুছিতে বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছিল। ভোরের গাড়ী ছাড়া এস্থান হইতে ফিরিবার উপায় নাই। বক্সার রোডে ইংরেজদের শৈলদুর্গ দেখিয়া বাসায় ফিরিবার কথা, সেখানেও এই ভোরের গাড়ীতে যাইতে হয়। কাজেই সেদিনের মত চিড়া চিবাইয়া ও মালগাড়ীতে আশ্রয় লইয়া আমাদিগকে জয়ন্তীতে কাল যাপন করিতে হইল।

পরদিন ভোরে ডাউন্ ট্রেনে আমরা বক্সার অভিমুখে রওনা হইলাম। ৮॥ টার সময় গাড়ী বক্সার রোড্ ষ্টেশনে পঁহুছিল। আমরা এস্থানে নামিয়া বক্সার পাহাড়ে ইংরেজ দুর্গ দেখিবার জন্য তরাইর পথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড শাল শিশু প্রভৃতি অগণিত বৃক্ষ। তাহার উপর নানা সুন্দর পক্ষী জোড়ায় জোড়ায় বসিয়া মধুর কূজন করিতেছে। সমস্ত পথটী আশ্রমোচিত গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। পক্ষীর ঝঙ্কার এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সরসতার সঞ্চার করিয়া দিতেছে।

বিস্তীর্ণ তরাইর পথে ঘন্টা খানেক চলিয়া আমরা সাঁতরাকড়ি নামক স্থানে পঁহুছিলাম। এস্থানে বিকানীর বাসী সওদাগরের খান দুই দোকান আছে। এই সাঁতরা কড়ির পরেই বক্সার দুর্গে পঁহুছিবার দুইটী পথ; একটি

অত্যন্ত দুরূহ অথচ সোজা, দ্বিতীয়টী ঘুরানো সিঁড়ির মত কাটা কিন্তু দীর্ঘ। আমরা শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াই পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে নানা প্রকার ঝরণা দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে একটা বৃহৎ ঝরণার কাছে যাইয়া সকলে জলে নামিয়া অবগাহন স্নান করিয়া তৃপ্ত হইলাম। নির্ঝরিণীর সুশীতল জলধারা গায়ে লাগিয়া শরীরের উত্তাপ, মনের অবসাদ সকলই যেন ধুইয়া গেল! স্নানান্তে পাথরের গায় কলার পাতা পাতিয়া চিড়া চিবাইয়া ক্ষুধা দূর করিলাম। পরে কেহবা পাথরের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া নাক ডাকা আরম্ভ করিয়া দিলেন, কেহবা পাহাড়ের বুকে জলক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। ঝরণার প্রখর স্রোতের প্রতিকূল পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, উহাদিগকে ধরিয়া ও পুনরায় ছাড়িয়া দিয়া আমরা তামাসা দেখিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার হাঁটা আরম্ভ হইল। ঊর্দ্ধপথে চলিতে চলিতে, চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত পার হইয়া চলিলাম। চারিদিকে অগণিত পাহাড়ের চূড়া, সমুদ্রের সুনীল তরঙ্গরাজির মত সারি বাঁধিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

পর্ব্বতপথের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমাদের বক্সার বাজারে পঁহুছিতে বেলা প্রায় একটা হইল। এই সময় বিশ্রামের জন্য আবার একটু আশ্রয়ের আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে আর একবার আসাতে এস্থানটী আমাদের এক জনের পরিচিত ছিল। তিনিই অগ্রণী হইয়া আমাদিগকে সতীশ পাঁড়ে মহাশয়ের বাসায় লইয়া গেলেন। পোষ্টমাষ্টার, কেরাণী প্রভৃতিকে লইয়া বক্সার পাহাড়ে ৪।৫ জন বাঙ্গালীর বাস। সতীশ পাঁড়ে ইঁহাদেরই অন্যতম। ইনি বক্সার দুর্গে কমি-শারিয়েটের হেড্‌বাবু। লোকটী সজ্জন, অমায়িক, মধুরভাষী ও অতিথি বৎসল। আমাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া ইনি সসম্ভ্রমে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং আমাদের বাসাদির জন্য নিজের একটি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। সতীশবাবুর খরচে সেস্থানে বসিয়া জলখাবারের ব্যবস্থাটীও সুসম্পন্ন হইল। আহারান্তে আমরা স্থানীয় হাঁসপাতাল, হাট বাজার ও ভুটিয়াপল্লী দেখিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট ইণ্টার প্রেটার জনৈক ভুটিয়ার সঙ্গে পরিচিত হইলাম এবং সতীশবাবুর মুখে ভুটিয়া ও গারোদের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শুনিলাম।

ইতিমধ্যে রৌদ্রের তেজ কমিয়া আসিতেছিল। আমরা বক্সার পাহাড়ে ইংরেজদুর্গ, চৌকীমন্দির (watch tower) প্রভৃতি দেখিবার জন্য উঠিলাম।

সতীশবাবুর বাসা হইতে বক্সার দুর্গে যাইতে ভিন্ন একটা পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। এই দুর্গে ও তাহার চারিদিকে জঙ্গলাকীর্ণ আড্ডা সমূহে ইংরাজ পক্ষের ৪০০ রাজপুত সৈন্য আছে। সীমান্তের দস্যুপ্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল ভুটিয়াদিগকে দমন রাখিবার জন্য এরূপ আয়োজন করা হইয়াছে।

বক্সার দুর্গটী সমতল ভূমি হইতে ২১০০ ফিট উচ্চ। ইহার উপর তিন দিকে যথাক্রমে ৩০০, ৫০০ ও ৭০০ ফিট উচ্চ তিনটী শৈলশৃঙ্গোপরি ইংরেজ পক্ষীয় তিনটী চৌকী-মন্দির ও দুর্গশৃঙ্গের মধ্যগত অধিত্যকা সৈন্যদের ক্রীড়া ভূমি।

আমরা সতীশবাবুর সুপারিশ চিঠি লইয়া দুর্গের সুবেদারের সঙ্গে দেখা করিয়া দুর্গদর্শনের অনুমতি চাহিলাম। সুবেদার সযত্নে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দুর্গমধ্যস্থ অস্ত্রশস্ত্রাদি, সৈনিকাবাস, হাঁসপাতাল প্রভৃতি দেখাইতে এবং সৈনিক-জীবনের ক্লেশময় কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। এস্থানে সকল দেখিয়া শুনিয়া চৌকীমন্দির দেখিতে গেলাম।

সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বোচ্চ চৌকীমন্দিরটীতেই আরোহণ করিলাম। এ স্থানের এই ত্রিতল অট্টালিকাটীই চৌকী-মন্দির নামে খ্যাত। অপর শৃঙ্গ দুইটীর উপরেও এরূপ দুইটী চৌকীমন্দির আছে।

চৌকীমন্দিরের উপর উঠিলে চারিদিকের দৃশ্যাবলী সুন্দররূপে দেখা গেল। তখনও সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল। আমরা মন্দির হইতে নামিয়া পাহাড় বাহিয়া আরো উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। অনতিদূরে একটী

আমগাছের উপর বসিয়া কয়েকটা রক্তবর্ণ পাখী শিষ্ দিতেছিল; মাথার উপরে পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি ভুটিয়া বালক ভুজালী হাতে গরু চড়াইতেছিল।

এই সময়ে সূর্য্য প্রায় অস্ত যাইতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের আভা অতিদূরস্থ নদীর উপর পড়িয়াছিল।

অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া দেখিতে পাইলাম, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, তদুপরি পর্ব্বত যোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অন্য দিকে বৃক্ষ লতা সমাকীর্ণ অসীম দৃশ্য সুস্পষ্ট সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে! এই দৃশ্যের মধ্যে মধ্যে আঁকা বাঁকা কত নদী উপনদী সকলই রৌদ্রদীপ্ত উজ্জ্বল রেখাকারে দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে পাহাড়ের এক দিকে রৌদ্রের কিরণ খেলিতেছে, আবার তাহার পাশের শৃঙ্গটীকেই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ ঢাকিয়া রাখিয়াছে! আলোক-অঁধারের এ এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! দূরে দেখিতে পাইলাম, অই যে তরঙ্গের মত পর্ব্বতের শ্রেণী ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে, উহারই একাংশে ঐ যে খাসিয়া, ঐ যে জয়ান্তিয়া অই যে আসাম, চিত্রপটের ছবির মত লাগিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে স্বর্ণময় শৃঙ্গটী অই যে দেখা যাইতেছে, উহারই নাম কাঞ্চনশৃঙ্গ। আসামের পাদমূল চুম্বন করিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইতেছে, কোচবিহারের মধ্য দিয়া তোর্ষার ভীম তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে, অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে তাহার জলরাশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্দ্দিকের এমন উজ্জ্বল দৃশ্যে মনপ্রাণ যখন অমৃতময় হইয়া উঠিতেছিল, তখন অকস্মাৎ একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ খাসিয়া পর্ব্বতের উপরে দেখা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেঘখানি ক্রমে ক্রমে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য সমুজ্জ্বল পাহাড়ের দৃশ্য অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। মেঘখানি সরিতে সরিতে কতক চুলুচলা পাহাড়ের দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কতক বা আমাদের গায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অতি সূক্ষ্ম জলধারা ঝির্ ঝির্ করিয়া গায়ে পড়িয়া আমাদিগকে সামান্য ভিজাইয়া দিল। ক্ষণপরে আবার রৌদ্রদীপ্ত বিশ্ব যেমন হাসিতেছিল, তেমনি করিয়া চতুর্দ্দিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আলোক আঁধারের এ মহা-অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমরা পুলকে আত্মহারা হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া ঘনাইয়া আসিতে না আসিতে আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। তখনও রাজপুত সৈন্যগণ ফুটবল খেলিতেছিল। আমাদের চারিজন বন্ধু কিছু কালের জন্য তাহাদের সঙ্গে একবাজি লড়িয়া আসিল।

মঙ্গলবার আমরা দুর্গশৃঙ্গ ত্যাগ করিয়া বক্সার রোড ষ্টেশনে প্রাতের গাড়ি ধরিলাম। এই গাড়িতে দুপুর ১১২টায় কোচবিহারে পঁহুছিয়া সকলে স্ব স্ব বাসায় ফিরিলাম।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

বিদায় সঙ্গীত।

লর্ড রিপন যখন ভারত হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন, তখন কোন সাপ্তাহিক পত্রে এই কবিতাটী প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড রিপন আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা কতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কবিতাটী তাহা প্রকাশ করিতেছে।

১

কাঙ্গাল ভারতে, অনাথ করিয়ে;
ভারত-সুহৃদ, রিপন যায়,
ভারত নিবাসী কে আছ কোথায়,
নিকটে আসিয়ে সুধাও তাঁয়।
যে আশা করিলে, যে কৃপা লভিলে,
যেই কৃতজ্ঞতা ধরিলে বুকে,
দেখাও আসিয়ে, ত্যজিতে তাঁহায়
কত ব্যথা আজ বাজিছে বুকে।
রিপনের জয় বল সবে মুখে,
লিখ সবে বুকে রিপন নাম,
রিপন-মঙ্গল সুখদ সংগীতে
পরিপূর্ণ কর ভারত ধাম।
পতিতে দয়াল, দীনে ন্যায়পর
ভারতের সখা রিপন যায়,

ভারত নিবাসী আলস ত্যজিয়ে
আয় আয় আয় ছুটিয়ে আয়।

২

দাঁড়াও রিপন, ক্ষণেকের তরে
ফিরায়ে নয়ন নেহার পাছে,
সজল নয়নে ভারত ভুবন
পিছনে তোমার দাঁড়ায়ে আছে।
হারানিধি পেয়ে দরিদ্র যেমতি
রাখে জড়াইয়া সতত বুকে,
তেমতি তোমারে হৃদি,পরে ধরি
ভারত সন্তান আছিল সুখে।
সে সুখে তাহারে বঞ্চিত করিয়ে
কোন্ প্রাণে তুমি চলিয়ে যাও ?
ত্রিংশতি কোটী ভারত সন্তান
কাতরে দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া চাও।
তোমারি দয়াতে, তোমারি মায়াতে
লালিত পালিত ভারতবাসী,
হের হে রিপন, সবারি বদনে
এখনও পিপাসা রয়েছে ভাসি।

৩

একান্ত ত্যজিবে রিপন যদি হে,
কি দিব তোমারে বিদায় কালে,
অনন্ত দারিদ্র্য অনন্ত যাতনা
লিখিল যে বিধি ভারত ভালে।
দুঃখীর সম্বল নয়নের জল,
মর্ম্ম উছলিত আশীষ আর,
রত্নগর্ভা যেই ভারত খনিতে
আছে মাত্র এই রতন তার।
ত্রিংশতি কোটি ভারত সন্তান,
দেহ অশ্রুবিম্ব কবি-করতলে,
কৃতজ্ঞতা ডোরে গাঁথিয়ে মালিকা
দেই পরাইয়া রিপন গলে।
ত্রিংশতি কোটী কণ্ঠে গাহ জয়,
পরিপ্লুত হোক জগত তায়,
ভারত ত্যজিয়ে ভারত সুহৃদ
রিপন দম্পতি ভবনে যায়।

৪

এস হিমাচল ! আন দ্রুতগতি
কৈলাস হইতে শিব বিল্বদল,
যাও মা জাহ্নবি, লয়ে এস ত্বরা
ব্রহ্ম কমণ্ডলু হ'তে পূত জল।
মলয় ত্যজিয়ে আইস মারুত,
রিপনের সাথে সিন্ধু পথে ধাও,
ভারত জলধি, হৃদয়ে করিয়ে
রিপন দম্পতি লইয়ে যাও।
যথা তথা রহ হে রিপন তুমি,
ভারত সন্তান এই ভিক্ষা মাগে,
মনে যেন থাকে, তব সিংহাসন
ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগে।
হও দীর্ঘজীবী করি আশীর্ব্বাদ,
হোক তব যশ জগতময় ,
কিন্তু এ অনাথ ভারত সন্তানে
দীন বলি যেন অন্তরে রয়।

জীবনের পথে।

১২ই কার্ত্তিক।

আমার মনে ভাল হইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা অনবরত উদয় হইতেছে। প্রথম কর্ত্তব্য আমার, পড়াতে যাহাতে সকলের চেয়ে ভাল হইতে পারি, তাহা করা। আমার বাবা মা যে আশা করিয়া আমায় শিক্ষা দিতেছেন, তাহা যেন সফল হয়, আমায় তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে কত হাজার বালিকা আছে, যাহারা কোন দিন লেখাপড়ার কোন সুবিধা পাইবে না, আমি বাবা মার দয়ায় সে সৌভাগ্য পাইয়াছি, সুতরাং বিধাতার এই দানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমায় করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন গৃহকর্ম্মে নিপুণতা, শিল্প কর্ম্ম ও রাঁধিতে পারা ইহাও আমায় শিখিতে হইবে। আমি পিতামাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ

সন্তান, সুতরাং বাবার বিশেষতঃ মার শ্রমভার বহন করিবার অধিকার সর্ব্বাগ্রে আমারই; আমাকে ইহা করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল হইতে হইবে।

১৫ই কার্ত্তিক। বাজে বই, বিশেষতঃ গল্প পড়িবার আকর্ষণ আমার এক বিষম দুর্ব্বলতা। যাহা হাতের কাছে পাই, তাহাই পড়িতে আমার প্রবল ইচ্ছা হয়। আমার মনে হয়, ইহা দ্বারা আমি ভাষায় দক্ষতা লাভ করিব। কিন্তু নভেল পড়িবার এই ঝোঁকে আমার এক দিকে অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, দেখিতেছি। অন্য গভীর বিষয় পড়িবার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি ইহাতে আমি ক্রমে ক্রমে হারাইতেছি। আমি দেখি, মাসিক পত্র খুলিয়া সর্ব্বাগ্রে গল্প পড়িতেই আমার আগ্রহ হয়। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র গল্প পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা শেষ না করিয়া আমি উঠি না, স্কুলের পড়া ফেলিয়া আমি তাহাই আগে পড়িতে বসি। কাল শনিবার বলিয়া স্কুল ছুটি ছিল,সারাদিন নবেল পড়িয়াছি; তাহার পর রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া পড়িয়াছি; সকাল বেলা ঘুমে এমন শরীর আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, যে আজ আর সকালে উপাসনার জন্য মন্দিরে যাই নাই। মার কাছে শুনিলাম, উপাসনা ও উপদেশ খুব ভাল হইয়াছিল। শুনিয়া আমার মনে বড় ধিক্কার আসিতেছে, আমার এমন দুর্গতি কেন হইল? ভাল বিষয় শুনিবার ইচ্ছা অপেক্ষা এই সকল তুচ্ছ সুখ আমার বেশী ভাল লাগিবে কেন?

২৫এ কার্ত্তিক। আমার মার অনেকগুলি অসাধারণ গুণ আছে। এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, পরদুঃখ কাতর হৃদয় আমি দেখি নাই। সংসারের সকল কাজ মা এমন দক্ষতা সহকারে করেন। নিজের হাতে দুইবেলা রাঁধিয়া আমাদের খাওয়ান, বাড়ীর সমুদয় সেলাই স্বহস্তে করেন, আমাদের পড়া বলিয়া দেন, ইহা ভিন্ন বাহিরের কত কাজ আমার মা করেন। আমাদের পাড়ার সকল বাড়ীতে মার যাতায়াত, মা সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লন, কাহারও পীড়া হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবা করা, বাড়ী হইতে পথ্য প্রস্তুত করিয়া রোগীর জন্য লইয়া যাওয়া, তাহাদের কাপড় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া এই সকল মা করেন। অমল বাবুর একটী ছেলে ভয়ানক রক্তাতিসারে দশ দিন ভুগিয়া কাল বিকালে মারা গেল। এমন বিপদ, যে আবার কাল রাত্রি একটার সময় তাঁহার একটী মেয়ে হইল। মা এতদিন রুগ্ন ছেলেটীর সকল সেবা করিয়াছেন। কাল অবধি তাহাদের বাড়ীতেই আছেন, সমুদয় করিতেছেন; অমল বাবুর স্ত্রীর বয়স অল্প; বাড়ীতে আর কেহ নাই, সুতরাং মা না গেলে কি হইত জানি না। মা বাহিরে যাওয়াতে গৃহকর্ম্মের ভার ও ভাই বোনদের দেখা শুনা অনেক আমাকেই বহন করিতে হইতেছে, আমি এখন আগের চেয়ে গৃহকর্ম্মে অনেকটা দক্ষ হইয়াছি, এখন আর গৃহকর্ম্ম আমার বিষম বোঝা বলিয়া মনে হয় না। ইহা হইতে আমি দেখিলাম, কর্ত্তব্য দূর হইতে যত বিরক্তিকর ও অসহ্য বোধ হয়, প্রসন্ন ও ধীরভাবে তাহা করিতে অগ্রসর হইলে তাহার তিক্ততা আর থাকে না। আশা করি, আমার জীবনে এমন দিন অবশ্যই হইবে, যখন সুচারুরূপে গৃহকর্ম্ম করিয়া আমি তৃপ্তি, আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিব।

১লা অগ্রহায়ণ।—ইন্দিরার সঙ্গে আমার ভালবাসা দিন দিন বাড়িতেছে। আমি ইন্দিরাকে খুব ভালবাসি সেও আমায় ভালবাসে। ইন্দিরা যদিও ক্লাসে পড়া পারে না, তবুও আমি উহার সঙ্গে মিশিয়া দেখিতেছি, উহার ভাল ভাল গুণ আছে; মন খুব উদার ও সরল আর ব্যবহার বড় অমায়িক, এতবড় ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কেমন অসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, কোন প্রকার অহঙ্কার প্রকাশ পায় না। আমাকে সে খুব ভালবাসে, ঠিক যেন আপনার বোনের মত। মা কিন্তু আমার উহার সঙ্গে অত ভালবাসা ভালবাসেননা, বলেন, তুমি এখন হইতে সাবধান না হইলে এই বন্ধুত্ব হইতে অনেক বিপদে পড়িবে। আমি ইহার অর্থ বুঝি না। সে দিন ইন্দিরার জন্মদিনে সে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সে গাড়ী পাঠাইয়া আমায় লইয়া গিয়াছিল। বিকাল বেলা গিয়াছিলাম, আর পরদিন স্কুলে তাহার গাড়ীতে আসিয়াছিলাম। তাহাদের বাড়ী কি বড় ও সুন্দর। এমন পরিপাটী করিয়া সাজান কি বলিব। বসিবার ঘরের মেজেতে সুন্দর

নরম গালিচা পাতা, তাহাতে কি সুন্দর দৃশ্য সকল বোনা! সে ঘরের আসবাবই বা কি চমৎকার! কত কত ছোট ছোট জিনিষ দিয়া সে ঘর সাজাইয়াছে। বিদ্যুতের আলো পাখা, চলিতেছে। দেওয়ালেও কত ছবি, স্ফটিকের চমৎকার আধারে নির্ম্মল জলে রক্ত ও স্বর্ণ বর্ণের মাছগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইন্দিরা তাহার জন্মদিনে একখানা কোমল নীলবর্ণের শাড়ী আরও মুক্তা হার নীলপাথরে গাঁথা একছড়া হার পড়িয়াছিল, তাহাকে সে অলঙ্কার ও কাপড়ে খুব মানাইয়াছিল। রাত্রে ফনোগ্রাফে অনেক সুকণ্ঠ গায়ক গায়িকার মধুর সঙ্গীত শুনিলাম, তাহার পর ইন্দিরাও তাহার দাদা দুইজনে একত্রে সেতার ও বেহালা বাজাইয়া গান করিল। রাত্রিতে খাওয়ার পর ইন্দিরার দাদা আমাদের দুইজনকে থিয়েটার দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখন থিয়েটার দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি দুইটা। চৈতন্যলীলা অভিনয় হইল। থিয়েটারের গান, অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় নিপুণতা, দৃশ্যপট এ সমুদয়ই যেন আমার নিকট যেন এক মায়ারাজ্যের সৃজন করিল। অভিনয় দর্শনের যে এক আশ্চর্য্য শিক্ষাদানের শক্তি আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মা আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম শুনিয়া আমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, বলিয়াছেন, এমন জানিলে আমি তোমাকে উহাদের বাড়ী যাইতে দিতাম না। তিনি আমায় বলিলেন তুমি কেন থিয়েটারে গেলে? ইন্দিরা যখন লইয়া যাইতে চাহিল, আমি তখন কিরূপে না বলিতাম? তাহা কি অত্যন্ত অসভ্য ব্যবহার হইত না? পরের বাড়ী গিয়া কিরূপে তাহা করিতে পারিতাম? তাহা ভিন্ন থিয়েটারে যাওয়া যে দোষের কথা, তাহাত আমি জানিতাম না। এই ঘটনায় মা আমার উপর যেরূপ রাগ করিয়া আছেন, তাহাতে আমার তাঁহার কাছে যাইতে সাহস হয় না; তিনি থিয়েটার দেখার উপর বিষম চটা। তিনি বলেন যে থিয়েটারগুলি এমন কুস্থান, যে ভদ্র ঘরের মেয়েদের কথা দূরে থাকুক, কাহারও উহার ত্রিসীমায় যাওয়া উচিত নয়। আমি যখন বলিলাম যে চৈতন্য লীলা অভিনয় হইয়াছিল এবং এই অভিনয় দেখিয়া আমার মন খুব ভাল হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য যখন সন্ন্যাস লইলেন হরিনাম প্রচার করিবার জন্য শচীমাতা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ও সুখের নবদ্বীপ ছাড়িয়া ভিখারী সাজিলেন সেই অংশ ও তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত কর সঙ্কীর্ত্তন টুকু আমার মনে অতিশয় গভীর ভাবের উদয় করিয়াছিল তখনি মা আরও বিরক্ত হইলেন, বলিলেন ঐ সকল লোকের মুখে আবার চৈতন্যের ধর্ম্ম ভাব প্রকাশ? তাহা শুনিয়া আবার মনে উচ্চভাবের উদয়! আর কিছু মা বলেন নাই, কিন্তু যেমন গম্ভীর হইয়া আছেন, তাহাতে আমি বুঝিতেছি, যে আমি থিয়েটারে গিয়া বিষম দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। মার এক এক বিষয়ে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতা আছে আমার মনে হয়। অবশ্য আমি তাঁহার সমালোচনা করিতেছি না। যাহা হউক আমার মন এই ঘটনায় বড় উদ্বিগ্ন রহিয়াছে। আমার ভয় হইতেছে, আমার আর ইন্দিরার সঙ্গে মেশা হইবেনা। মা বোধ হয় প্রতিকূলতা করিবেন। (ক্রমশঃ)

ধ্রুবোপাখ্যান।

সাধনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭৭

প্রগাঢ় ব্যাকুল প্রাণে এ হেন সময়,
ভক্ত ধ্রুব অগ্নিময় তপস্যায় রত;
কত বিঘ্ন সাধনায় কিন্তু সে নির্ভয়,
ভক্তিতে উন্মত্ত প্রায় রহে অবিরত!

৭৮

আহা! কি যে চমৎকার ভক্তের জীবন,
নাহি নিদ্রা অনশন অম্লান বদনে;
বৃক্ষের গলিত পত্র বদরী ভক্ষণ,
নিশিদিন অবিশ্রান্ত মগন সাধনে!

৭৯

শুনেছেন গুরুমুখে ঐরূপ সাধন,
হইবে দ্বাদশ বর্ষ করিতে তাঁহার;
তীব্র সাধনেতে তাই উৎসাহিত প্রাণ,
ধ্যায়েন সে দেব পদ যাহা সর্ব্ব সার।

৮০

শশব্যস্ত মহাভীত হেরি দেবগণ,
ভক্তের সে জ্যোতির্ম্ময় কঠোর সাধন,
মহা দেবতার পাশে করিয়া গমন,
করেন বিনয়ে সবে আত্ম নিবেদন।

৮১

কঠোর তপস্যা ব্রতে আছে ধ্রুব রত,
থাকে তব দত্ত পদ বল কোন বলে?
লহ যত অধিকার, দিলে অবিরত,
দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব আর যত প্রদানিলে!"

৮২

শুনিয়া পরম দেব নিরর্থ বচন,
কহিলেন "ইথে নাহি ভয়ের কারণ
বাঞ্ছেনা আমার ধ্রুব ত্রিবিশ্বের ধন,
চাহে শুধু জগতের দুর্লভ রতন।

৮৩

"হেরি ব্যাকুলতা, ভিক্ষা ক্রন্দন তাহার,
হইয়াছে সুচঞ্চল আমার হৃদয়;
জানাইব 'ধ্রুবলোক' আবাস তাহার,
সাজাইব ফল ফুলে চির শোভাময়।"

৮৪

ঐ হের অদূরেতে শোভে 'ধ্রুবলোক'
সংসারের মাঝে মোরা খুঁজিয়া বেড়াই;
হরির চরণ প্রান্তে অনন্ত পুলক
পায় কি মলিন আত্মা দেখিবারে তাই?

৮৫

ঐ অবারিত দ্বার রয়েছে খুলিয়া
প্রবেশিতে অনিবার বাঞ্ছে যেই জন
পিপাসু অন্তরে দ্বারে আঘাতে কাঁদিয়া,
ঐ শুন, কে ডাকিছে এস বৎসগণ।

৮৬

ধ্রুবলোক স্বর্গলোক আনন্দের ধাম,
অক্ষম জগত লোক বর্ণিতে তাহায়,
ভক্তগণ প্রেমস্বরে গান অবিরাম,
যে লোক মহিমা গীতি সুদীর্ঘ গাথায়!

৮৭

গভীর সাধন মাঝে ধ্রুব বার বার,
ডাকিতেছে উচ্চে আহা! কত ব্যাকুলিয়া,
কেহ শুনিল না হেথা দেখিল না আর,
কি আসিছে শিশু মুখে থাকিয়া থাকিয়া।

৮৮

"কোথাহে অরণ্য মাঝে হে দীন শরণ,
বালকের প্রতি তুমি হলে না সদয়;
দেখ প্রভো! কত আর করিব রোদন,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হ'ল বক্ষ শুষ্ক প্রায়!

৮৯

"কিন্তু প্রভো! যত কেন কর বিড়ম্বন,
যাইব না গৃহে ফিরে না দিলে দর্শন,
বাঁধিলাম তব পদে এ তপ্ত জীবন,
এস এস, দয়াময় দুঃখ নিবারণ।

৯০

এই যেন প্রভো! তব চরণ কমল,
তাড়িতের মত, আহা! তাপিতের বুকে
প্রকাশি নিমেষে পুনঃ অন্তর্হিত হ'ল,
ভাসিল আকুল প্রাণ অদর্শন শোকে।

৯১

প্রভো!
ইচ্ছে না তাপিত মন খুলিতে নয়ন,
তব অগ্নিময় সত্তা হারায় আবার;
সাধ শুধু রহি মগ্ন হে নয়নাঞ্জন,
নিরখি মানস পটে তোমা অনিবার।

সিদ্ধি লাভ।

৯২

ক্রমাগত ভক্ত ধ্রুব দ্বাদশ বৎসর,
সাধিলেন হরিপদ, জীবন সহায়;
কত দিনে দরশনে হাসিল অন্তর,
আর কি ইচ্ছেন ধ্রুব ছাড়িবারে তাঁয়?

৯৩

তপস্যার বলে ধ্রুব আজি ভাগ্যবান,
সুপ্রসন্ন দয়াময় অতঃপর ধ্রুবে;

শুধালেন, বৎস! তুমি কহ মমস্থান,
কোন্ বর চাহ, লহ, পূর্ণ কাম হবে।

১৪

ধ্রুব কহিলেন "প্রভো! অন্য কোন ধন,
নাহি চাহি পেয়ে তব চরণ দর্শন,
ছার অন্য ধনে প্রভো! কোন প্রয়োজন?
অতুল তোমার ওই প্রফুল্ল আনন।"

১৫

তথাস্তু হে বৎস! হও সিদ্ধ মনোরথ।"
আসিল এ দেব বাণী ধ্রুবের অন্তর,
কাঁপিল স্বর্গীয় বলে, মিলিল সম্পদ,
শিশু ধ্রুব সিদ্ধ আজি জগতে অমর।

শ্রীঅনঙ্গ চন্দ্র দত্ত।

ধাঁধার উত্তর।

১। ৬টী ঘটী—৬
৮টী বাটী—২
২খানা থালা—৮

১৬টী ১৬

২। প্রথম অর্থাৎ প্রাতঃকালের হাটে ১ম পুত্র ১ সের দরে ৭ সের ৭ সাত টাকায় বিক্রী করিল এবং কনিষ্ঠ ১ সের দরে ৯ সের ৯ টাকায় বিক্রী করিল। তার পর বৈকালের হাটে জ্যেষ্ঠ টাকায় ১১ সের হিঃ অবশিষ্ট ৩৩ সের ৩ টাকায় এবং কনিষ্ঠ অবশিষ্ট ১১ সের ১ টাকায় বিক্রী করিল তাহাতে জ্যেষ্ঠ ৭+৩৩ সেরে ৭+৩ অর্থাৎ এক মনে ১০ এবং কনিষ্ঠ ৯+১১ সেরে ৯+১ অর্থাৎ আধ মনে ১০ পাইল।

নিম্ন লিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীবৈদ্যনাথ শেঠ, শ্রীকানাই লাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসোমনাথ মৈত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস, Members of the Boys' own Library, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীশান্তিনাথ বসু, শ্রীহরেশলাল চৌধুরী, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীজগদীশচন্দ্র ভৌমিক, শ্রীরবীন্দ্রকান্ত রায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, শ্রীবায়ে তালি সেখ, শ্রীসরোজ রঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযোগীন্দ্র নাথ আগরওয়ালা, N. N. De Esqr. শ্রীমন্মথমোহন সরকার, শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় অধিকারী।

নিম্ন লিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

কুমরা লীলা রায়, শ্রীবিমলাংশু ভূষণ মিত্র, শ্রীহিমাদ্রি কুমার শর্ম্মা, শ্রীঅহিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রকৃষ্ণ কুণ্ডু, কুমারী মমতাময়ী দেবী, শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ বসু, শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, শ্রীশৈলেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীক্ষীরোদ বিহারী গুপ্ত; শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দে, শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ ঘটক, শ্রীঅবনীভূষণ দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতী সরোজ বালা সেন, শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরোহিনীকুমার দাস, শ্রীমতী রেণুকা দেবী, শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি মিত্র, শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধানন্দিনী কান্ত দে, শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমৌলী ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুশীলা দেবী।

নূতন ধাঁধা।

১। একশত টাকা সাতটী কৌটায় এরূপে ভাগ করিয়া রাখ যে, কোন একব্যক্তি এক হইতে একশত পর্য্যন্ত যত টাকা চাহিবে, কতকগুলি কৌটা প্রদান করিলেই তাহার প্রার্থিত অর্থ প্রদত্ত হইবে।

২। বৃদ্ধ এক রাখি গেল একুশ বলদ,
চারি পুত্র ভাগ ল'তে গণিল সম্পদ,
তৃতীয়াংশ প্রথমের, চতুর্থাংশ দ্বিতীয়ের,
ষষ্ঠ ও অষ্ট ভাগ তৃতীয় চতুর্থের,
এইরূপে ভাগ করি দাও তাহাদের।

২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

পারস্যের নূতন শাহ

ART PRESS

মুকুল
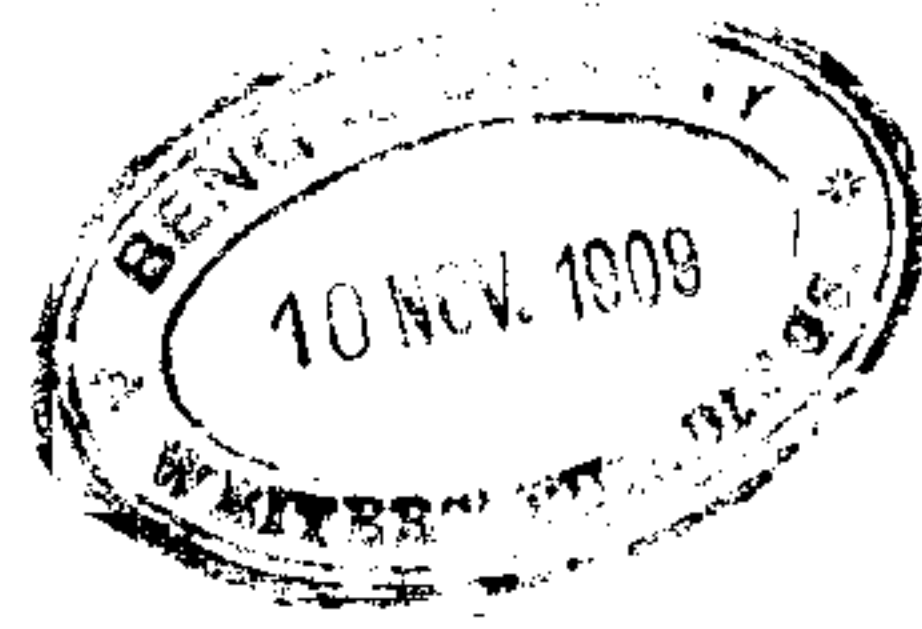
১৫শ ভাগ। | ভাদ্র, ১৩১৬। | ৫ম সংখ্যা।

বালক রাজা।

তোমাদের মধ্যে কাহাকেও যদি কেহ আসিয়া বলে, যে "তুমি রাজা হইয়াছ," তাহা হইলে তাহার মনের ভাব কেমন হয়? কল্পনা করিয়া দেখ দেখি। বোধ হয়, সে আনন্দে লাফাইয়া উঠে। কিন্তু রাজা হওয়া যেমন সৌভাগ্য বলিয়া সাধারণের মনে হয়, বোধ হয়, তাহা নহে। অন্ততঃ একটী বালকের নিকট তাহা মনে হয় নাই। রাজা হইয়াছে সংবাদ শুনিয়া কাঁদিবার কথা কি কখনও শুনিয়াছ? কিন্তু সে দিন সত্যসত্যই তাহা ঘটিয়াছিল। পারস্যদেশের বর্ত্তমান রাজা এক জন বালক, বয়স এগার বৎসর। তাঁহাকে যখন বলা হইল, যে তিনি রাজা হইয়াছেন, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এগার বছরের ছেলে, সে বেচারী হয়ত একটী ভাল লাটিম পাইলে ইহার অপেক্ষা বেশী সুখী হইত। ইনি বোধ হয়, এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজা। পোর্টুগাল দেশের রাজাও বালক, কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। পারস্য দেশের এই নূতন রাজার নাম সুলতান আহমেদ মির্জা। ইহার পক্ষে সিংহাসনের পথ সুখের হয় নাই। তাহা মুখ দেখিয়াই অনুমান করিতে পারা যায়। সকল বালক বালিকারই বোধ ইহার প্রতি সহানুভূতি হইবে।

ইঁহার পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া দেশের লোক এই একাদশ বর্ষের বালককে রাজা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে পারস্য দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যে বিবাদ যাইতেছে। দেশের লোকেরা পারস্যদেশে অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। অনেক বৎসর ধরিয়া এই জন্য নানা চেষ্টা করার পর তিন বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশে পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাতেও বিবাদ মিটিল না; সর্ব্বদাই রাজার ও পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে মনোমালিন্য হইতেছিল। বর্ত্তমান রাজার পিতা মহম্মদ আলি মির্জা দেড় বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে, যখন রাজা হন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে পার্লিয়ামেণ্টের নির্দ্ধারণ অনুসারে রাজ্য শাসন করিবেন, কিন্তু পরে তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। সেই জন্য দেশের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুলতান বন্দী হইয়াছেন। বিজয়ী সৈন্যেরা তাঁহার আর কোনও অনিষ্ট করেন নাই; কেবল তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজা করিয়াছেন। বালককে যখন রাজা হওয়ার সংবাদ দিয়া পিতা মাতার নিকট হইতে আনিতে যাওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি অনেক কাঁদিয়াছিলেন। ইহাই

স্বাভাবিক। এই দুর্ব্বলতার জন্য আমাদেরও তাঁহাকে ভাল বাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতেই ইচ্ছা করিতেছে। পিতামাতাকে ছাড়িয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে যাইতে যে বালক কাঁদে, সে সম্মানেরই যোগ্য। সুলতান আহমেদ মির্জার কান্না থামে না দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন এ বাড়ীতে কান্না নিষেধ। তখন তিনি চক্ষু মুছিয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময় সভাসদেরা যখন বলিলেন, যে "আমরা আশা করি, আপনি সুশাসক হইবেন।" তখন বালক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ভগবানের নামে বলিতেছি, আমি চেষ্টা করিব।" একাদশ বর্ষের বালকের মস্তকে এ কি গুরুতর ভার! ইঁহার জন্য কাহার না সহানুভূতি হয়? আমরা আশা করি, যে গুরুভার তাঁহার দুর্ব্বল স্কন্ধে পড়িয়াছে, এই বালক তাহার উপযুক্ত হইবেন।

হস্তী।

মুকুলের পাঠকপাঠিকাগণ, তোমরা হস্তী সম্বন্ধে অনেক কথা পুস্তকে পড়িয়াছ। আমি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে আজ আরও দু চারিটী কথা শুনাইব।

সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন চন্দ্রও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। এমন কি তোমাদের পরিচিত তারকা গুলি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল মাত্র। তখন সমস্ত পৃথিবী জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বড় বড় গাছ এবং অন্ধকারময় ঝোপগুলি বনের ভীষণতা বৃদ্ধি করিয়া বিরাজিত ছিল। তখনও মানুষের জন্ম হয় নাই। কেবল মাত্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জন্তু এবং অসংখ্য অতিকায় সরীসৃপ সাইবিরিয়ার গভীর অরণ্যে বিচরণ করিত। সেই সকল অদ্ভুত নামধারী প্রকাণ্ড জন্তুর প্রতিকৃতি ও বিবরণ তোমরা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত 'সে কালের কথায়' পড়িয়া থাকিবে। এক বার সেখানে ভয়ানক শীত পড়ে। তাহাতে নদী, খাল, ও বিলের জল সমস্ত জমাট হইয়া যায়। তখন অনবরত বরফ পড়িতে থাকে এবং গাছগুলি সকলই পত্রশূন্য হইয়া পড়ে। এরূপ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে ঐ সমস্ত প্রাণীবংশ অধিকাংশই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখনও সাইবিরিয়ার পাহাড়ে এবং জলাভূমিতে তাহাদের বহু কঙ্কাল পতিত রহিয়াছে।

অবশেষে যখন শীত কমিয়া গেল এবং সূর্য্যকিরণে কুয়াসা দূর হইল, তখন মাঠ এবং গাছগুলি আবার সবুজ বর্ণ ধারণ করিল। সে সময় নূতন পত্রে আবৃত গাছের ছায়ায় দু একটী জন্তুকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত সত্য, কিন্তু সে গুলির আকৃতি এখন আর তেমন বড় রহিল না। কিন্তু একটা জন্তু যেন পূর্ব্বকালের সাক্ষ্য দিবার জন্যই ততটা ছোট হইল না। এখন হয় ত বুঝিতে পারিয়াছ, সে জন্তুটা কি! সেটা হাতী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

হাতীর শরীরটা বাস্তবিকই কদাকার এবং অসম্ভব রকমের বড়। দেখিতে বোধ হয়, যেন একটী বালক তাহার অপক্ক হস্তে ইহাকে গঠন করিয়াছে। তাহার পা দেখিলে হাসি পায়। পাগুলির সংস্কার হওয়া একান্তই উচিত। শরীরটার মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত মাংসগুলি ছাঁটিয়া ফেলা দরকার। এ লেজটায় উহাকে নিশ্চয়ই মানায় না। এমন জন্তুটার লেজটা আরও সুন্দর হওয়া উচিত।

তাহাকে তোমরা যতই বিশ্রী বল না, কেন, সে কিন্তু অতটা হেয় নয়। উহা অপেক্ষা ঢের সুন্দর প্রাণী আছে, সত্য, কিন্তু সে তাহাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। আরও একটা বিষয়ে সে সকলকে জিতিয়াছে। তাহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটীর মধ্য দিয়া সাপের মত একটা লম্বা শুঁড় নামিয়াছে। সে উহা দ্বারা এমন সকল কাজ করিতে পারে, যাহা তোমরা মানুষ হইয়াও বহু ক্লেশে দুই হাতে করিয়া উঠিতে পার না।

এসিয়ার দেশ সকল অত্যন্ত বড় এবং পথগুলিও অতি দীর্ঘ। এজন্যই এখানে অশ্ব অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং সহিষ্ণু জন্তুর প্রয়োজন। হস্তী সকল এক দিকে যেমন বলশালী, পক্ষান্তরে তেমনই শান্ত।

সুতরাং পূর্ব্বকালে তাহারা ভার বহন এবং যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত হইত।

আমরা বহু শত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসে হাতীর উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া জানি না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহারা যেরূপ ছিল, এখনও অবিকল তাহাই রহিয়াছে। তাহারা এত কাল মানুষের সঙ্গে থাকিয়াও উত্তরাধিকার সূত্রে রাখিয়া যাইবার উপযোগী নূতন কোনও কিছু শিক্ষা করে নাই। হাতী খুব তাড়াতাড়ি একটী নূতন বিষয় শিখিতে পারে বটে, কিন্তু উহাদের প্রত্যেককেই উহা নূতন করিয়া শিক্ষা দিতে হয়।

বাস্তবিক, দেখিতে গেলে, আর কোনও বন্য জন্তু এরূপ হাজার হাজার বৎসর নির্ব্বিবাদে মানুষের সহিত একত্র বাস করিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু মানুষ কখন যে তাহাদের গুণের পরিচয় পাইল, তাহা আমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না। তোমরা দেখিতে পাও যে, যে জাতিই নূতন কিছু আবিষ্কার করুক না কেন, তাহা সমস্তই তাহাদের কথাবার্ত্তায় এবং শিল্পকর্ম্মে প্রকাশ পায়। আমরা প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের ধর্ম্মমন্দিরে হস্তীর খোদিত মূর্ত্তি দেখিতেছি। ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পার, হস্তী আমাদের কেবল এক বৎসর, দুই বৎসর ধরিয়া পরিচিত নহে। কত হাজার হাজার বৎসর হইতেই তাহারা আমাদের উপকার করিয়া আসিতেছে। খৃষ্টের জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে, হিরোডোটাস নামক এক জন গ্রীক পর্য্যাটক বেবিলনে ভ্রমণ করেন। তিনি ঐ নগরের দৈনিক কার্য্যে বহুসংখ্যক হস্তী নিযুক্ত দেখিতে পান। তোমরা দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহের নাম শুনিয়াছ। ইনিই খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম হস্তীর আমদানী করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ভূমধ্য সাগরের তীরস্থ জাতি সমূহ ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিল। হস্তীর ভার বহনে পটুতা ও অসাধারণ শিক্ষাক্ষমতা দেখিয়া উহারা যার পর নাই বিস্মিত হইল। আমাদের দেশের হস্তী দ্বারা কত প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, তোমাদিগকে আর বলিতে হইবে না। তোমরা হস্তীর চতুরতা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছ।

সম্ভবতঃ তোমরা সকলেই সারকাস্ পার্টিতে হস্তীর নানাবিধ ক্রীড়া দেখিয়াছ। যখন তাহারা প্রকাণ্ড শরীরটা লইয়া নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতে থাকে, তখন মনে একটু দুঃখ হয়, আবার হাসিও পায়। ভালবাসা পাইলে হাতী যে কত অদ্ভুত শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তাহাদের প্রতি কুব্যবহার করিলে, তাহারা আবার প্রতিশোধ লইতেও ছাড়ে না।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এক জন ভদ্র মহিলা, ডিউক অব ওয়েলিংটনকে উপহার স্বরূপ একটী হস্তী দান করেন। চিজুইকে ডিউক মহোদয়ের একটী উদ্যান ছিল। সেখানে তিনি হাতীটার জন্য একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে যেন মনের সুখে বেড়াইতে পারে, এই জন্য সেই গৃহের নিকটেই একটী খোলা মাঠও ছিল। তাহার রক্ষার জন্য যে মাহুত নিযুক্ত ছিল, সে হাতীটাকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। মাহুত ডাকিবামাত্র হাতীটা দাঁড়াইতে এবং তাহার আদেশে শুঁড় দিয়া ঝাঁটা ধরিয়া ঘাসের উপরের শুষ্ক পত্র ঝাড়িয়া ফেলিত। তাহার পর অতি সাবধানে একটী বড় বালতি জলে পুরিয়া তাহার মাহুতের নিকট লইয়া আসিত এবং তাহার মাহুত ঐ জল গাছের গোড়ায় সেচন করিত। জল সেচন শেষ হইলে, হাতীকে গাজর এবং জল খাইতে দেওয়া হইত। কিন্তু তাহার রক্ষক সেই জল লইয়া তাহার সহিত তামাসা করিত। সে একটা 'সোডা ওয়াটারের' বোতলের মুখ দৃঢ়রূপে ছিপি বদ্ধ করিয়া হাতীটার সম্মুখে ধরিয়া বলিত; "জল খাও"। হাতীটা রক্ষকের হাত হইতে বোতলটী লইয়া পায়ের নিকট একটু কাত্ করিয়া ধরিত। তাহার পর সে শুঁড় দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছিপি খুলিয়া সমস্ত জল নিঃশেষে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিত। ইহাতে এক ফোঁটা জলও মাটীতে পড়িতে পারিত না। জল পান করা শেষ হইলে সে বোতলটা তাহার রক্ষকের হাতে ফিরাইয়া দিত।

আমাদের দেশে অনেক সময়, হাতীর উপর সন্তান রক্ষার ভার দেওয়া হয়। সে তাহাদের কেমন যত্ন করে তাহা দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কোনও ভদ্রলোক একটী পোষা হাতীর উপর তাঁহার ছোট ছেলে রক্ষার ভার দেন। সে প্রতিদিন শিশুটীর দোলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাছি তাড়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইত। যখন ছেলেটি অধীর হইয়া চীৎকার করিতে থাকিত, তখন হাতী দোলাটী নাড়িত। তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে সে শিশুটিকে আস্তে আস্তে দোলা হইতে নামাইয়া মাটীতে ছাড়িয়া দিত, শিশুটী তাহার পায়ের চারি ধারে হামাগুড়ি দিত। অবশেষে শিশুটী তাহার এরূপ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে, হাতী নিকটে না থাকিলে সে একেবারেই আহার করিত না।

বন্য অবস্থায় হাতীর স্বভাব অতি অদ্ভুত। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার জঙ্গলে উহারা দলে দলে বিচরণ করে। বস্তুতঃ প্রতি দলই এক একটী পরিবার স্বরূপ। উহারা সকলে একই পিতামহ হইতে উদ্ভূত। তাহারা নিজ দলের সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ হিসাব রাখে। ইহাদের সংখ্যা দশটীর অন্যূন এবং বিশটীর অনধিক। তাহারা সহজেই অপর দলের সঙ্গে মিশামিশি করিতে পারে। অনেক সময় তাহারা দুই তিন দল একত্র হইয়া খাদ্যান্বেষণে বাহির হয়। কিন্তু যদিও উহারা পরস্পর বন্ধুভাবে ব্যবহার করে, তথাপি প্রতি দলই অপর সকল দল হইতে এরূপ গৌরবের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকে, যেন তাহারা সকলেই কিছু উচ্চ জাতীয়। যদি কখনও কোন হতভাগ্য নিজ দল হারাইয়া অপর দলে মিশিতে চেষ্টা করে, তবে সে উপহাসাস্পদ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উপহাসের পাত্র হইয়া থাকিতে পারিলেও বেচারা বাঁচে। কিন্তু তাহা কি আর হয়? দলের সকলে একত্র হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। তাহার পর যদি সেই হতভাগ্য হতাশ হইয়া কোনও অসদুপায় অবলম্বন করে, তবে তাহাকে সেই অপরাধের দণ্ড স্বরূপ জীবন হারাইতে হয়।

হস্তী সকল সুশৃঙ্খলে ও বিধিমতে বাস করে। তাহারা নিজ দলকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন একটী বলশালী অথবা সুচতুর নায়ক বাছিয়া লয়। স্ত্রী হস্তীর বুদ্ধি অপর সকলের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ হইলে, তাহাকে অনেক সময় চালক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, একবার নায়ক নিযুক্ত হইলে, সমস্ত দলটী তাহার আদেশ প্রতিপালনে যত্নের ত্রুটি করে না। এমন কি, তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য আপনাদের প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় না।

তোমরা সকলেই, জান যে, গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে জলের বড়ই অভাব। এমন কি, জল রক্ষার জন্য যে সমস্ত পুষ্করিণী খনন করা হয়, তাহাও অনেক সময় শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে মেজর স্কিনার নামক এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাড়ে বিশ্রাম করিবার জন্য আইসেন। পুষ্করিণীর জল অত্যন্ত কম ছিল এবং নিকটে আর কোনও জলাশয় ছিল না। পুষ্করিণীটির তিন পাড় বেশ পরিষ্কার এবং অপর পাড়ে গভীর অরণ্য। সেই অরণ্য মধ্যে এক দল হস্তী রাত্রির অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিল যেন, অন্ধকারে নিরাপদে জল পান করিতে পারে। হস্তীর স্বভাব মেজর স্কিনারের বেশ জানা ছিল। সুতরাং তিনি অনুচরদিগকে ঘুমাইতে আদেশ দিয়া পুষ্করিণীর এক কোণে একটী প্রকাণ্ড গাছে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু হাতীগুলিও সে রাত্রে বিশেষ সতর্ক ছিল বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল, কারণ তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাছের উপর বসিয়া রহিলেন, কিন্তু কোনও সাড়া শব্দও পাইলেন না।

তাহার পর হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড হাতীকে সেই গভীর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর দিকে আসিতে দেখা গেল। সে তাহার কুলার মত কাণ দুটী খাড়া করিয়া ছোট ছোট চক্ষু দুটী দিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল; যেন সে কিছু চুরি করিতে আসিয়াছে। সে কতক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে জলের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু জলপান করিবার কোনও উদ্যোগ করিল না। বোধ হয়, সে সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া একা জলপান করাটা নিতান্তই অন্যায় মনে করিয়া থাকিবে। সুতরাং সে অপরাপর সঙ্গীদিগকে আনিবার জন্য চলিল। পুষ্করিণী হইতে এক শত

গজ দূরে আসিবা মাত্র আরও পাঁচটা হাতী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। পূর্ব্বের মত সাবধান হইয়া সে ইহাদিগকে এমন একটা জায়গায় লইয়া গেল, যেখান হইতে যেন তাহারা সমস্ত গ্রাম ও বন স্পষ্টরূপে দেখিতে পারে। এরূপ ভাবে ত সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল। তাহার পর তাহাদের রক্ষার জন্য যাহা করিতে হয়, সমস্ত করিয়া, সে সমগ্র দলটাকে আনিবার জন্য প্রস্থান করিল। সে দলটা সাধারণ দল অপেক্ষা ন্যূনকল্পে ৪।৫ গুণ বড় হইবে। সমস্তই একেবারে চুপ, কোথাও কোন শব্দ মাত্র নাই। তখন দলস্থ সমস্ত হস্তী পূর্ব্বের পাঁচটী পাহাড়াওয়ালার নিকট আসিয়া সকলেই এক সঙ্গে থামিয়া গেল। আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত হাতীটা কোথাও কোন মানুষ, সিংহ অথবা বাঘ লুক্কায়িত রহিয়াছে কিনা, সমস্ত ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। শেষে অনুমতি দেওয়া হইলে তাহারা সকলে আনন্দে শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে সেই পুষ্করিণীতে গিয়া নামিল। কেহ জল পান করিতে লাগিল, কেহ কাদা মাখিতে লাগিল, আবার কেহ বা জলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তাহাদের আর আনন্দ ধরে না। যেন তাহারা এক বৎসর ধরিয়া জল খাইতে পায় নাই। এদিকে মেজর স্কিনার সেই গাছে বসিয়া কৌতূহলের সহিত ব্যাপারখানা দেখিতেছিলেন। যখন তাহারা আনন্দে একেবারে অধীর, তখন তিনি আস্তে আস্তে একখানা ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। অত সামান্য শব্দ যে এরূপ গোলমালের মধ্যে তাহাদের কাণে পৌছিবে, তাহা তাহার ধারণা ছিল না, যাহা হউক, মুহূর্ত্তমধ্যেই পুষ্করিণী ছাড়িয়া সকলে সদল বলে উর্দ্ধশ্বাসে বনের দিকে ছুটিয়া পালাইল।

বাস্তবিক হস্তী দল অন্যূন একশত মাইল ভ্রমণ না করিয়া প্রায়ই পুষ্করিণীর সন্ধান পায় না। এবং তেমন অবস্থায় আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই তাহাদের সহায়। তাহারা কোনও শুষ্ক নদীর পাড়ে আসিয়া যখন দেখে বালুকা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখনই তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না। কিন্তু সহজেই তাহারা বুঝিতে পারে যে, ঐ বালুকার নীচে জল আছে। তেমন অবস্থায় উহারা কিরূপে জল পান করে জান? তাহারাও এক একটী সুচতুর ইঞ্জিনিয়ার। তাহারা বেশ জানে, যদি সোজাসোজি নীচের দিকে গর্ত্ত করে, তবে উহাদের অত বড় শরীরটার চাপেই গর্ত্তটী পুরিয়া যাইবে,—আর জলখাওয়া হইবে না। এই অসুবিধা কিরূপে দূর করিতে হয়, তাহা তাহারা অনেক অধ্যবসায়ের ফলে শিখিয়াছে। তাহারা গর্ত্তের একটা দিক ঢালু করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া জলের অপেক্ষা করিতে থাকে। অনেক ধৈর্য্যাবলম্বনের পর তবে জলপান করিতে পারে।

সিংহল দ্বীপের কাউণ্টার নামক একজন ধর্ম্মযাজক হস্তীর বুদ্ধিবল সম্বন্ধে আর একটী সুন্দর গল্প বিবৃত করিয়াছেন। সিংহলে একটী চাউলের গুদাম পাহারা দিবার জন্য কয়েকজন দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ কোনও নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটী বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সেখানে পাঠান হয়। একটী বন্যহস্তী নিকটে নির্জ্জন বনে লুকাইয়াছিল। তাহারা রওয়ানা হইবামাত্র সে গুদামের দিকে আসিয়া উহা বিশেষরূপে দেখিয়া পুনরায় যথা স্থানে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে সুশৃঙ্খলিত সেনার ন্যায় আর একদল হস্তী লইয়া পুনরায় সেখানে আসিল। গুদামটী যেন কেহ সহজে লুঠ করিতে না পারে, এই জন্য ছাদের উপর একটী মাত্র দরজা রাখা হইয়াছিল। মই দিয়া উপরে উঠিলে তবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করা যাইত। হাতীগুলি বাড়ীটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া প্রবেশ দ্বারের সন্ধান পাইল। কিন্তু প্রবেশ করিবার কোনও উপায় না দেখিয়া তাহারা সকলে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মনোনিবেশ করিল। কি যে পরামর্শ হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে, দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড হাতী বাড়ীটীর এক কোণ দাঁত দিয়া ঠেলিয়া ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার দেখাদেখি আরও কতকগুলি ঐ কার্য্যে লাগিয়া গেল। প্রথম দল পরিশ্রান্ত হইলে আর এক দল আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। কিন্তু বাড়ীটী সুরক্ষিত হওয়াতে তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল! কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিরত

হইল না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহারা এমনি করিয়া ঠেলিতে লাগিল যে, অবিলম্বে ইট খসিয়া গেল। পরে তাহারা অতি সহজেই দেওয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া এক এক দল করিয়া গুদামে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে এক দল ইচ্ছামত উদর পূর্ণ করিয়া বাহিরে আসিয়া পাহারা দিতে লাগিল, আর এক এক দল করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। এরূপভাবে সকলেই পেট ভরিয়া আসিয়াছে, কেবলমাত্র একদলের এখনও খাওয়া শেষ হয় নাই। এমন সময় প্রহরীগণ দূর হইতে সৈন্যগণকে দেখিয়া বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল। ইহা শুনিয়া সকলেই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া শুঁড় উর্দ্ধে তুলিয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পালাইল।

হাতী কোন্ জিনিষ খুব পছন্দ করে আবার কোন্ জিনিষ পছন্দ করে না, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে সে বিবরণের আর শেষ হইবে না। মানুষ যে পর্য্যন্ত না ইহাদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিয়া লয় সে পর্য্যন্ত তাহারা মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করে। বিশেষতঃ সিংহলে শ্বেতকায় দিগকে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণা করে। বস্তুতঃ নূতন অথবা অদ্ভুত রকমের প্রাণীর সহিত তাহারা মিশে না। যে কোনও পরিচিত জন্তুর সহিত উহারা বাস করিতে পারে। হরিণ, মহিষ প্রভৃতির সঙ্গে উহারা একত্রে আহার বিহার করে। কিন্তু তাহারা উহাদিগের বড় বিশেষ সংবাদ লয় না। যতদূর বলা যায়, অপরিচিত গৃহ পালিত পশু ছোট হইলেও উহারা তাহাদিগকে দেখিলে খুব ভয় পায়। অথচ পরিচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জন্তু দেখিলেও তাহাদের ভয় হয় না। ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি নিকটে গেলে উহারা বড়ই বিরক্ত হয়। ইহার কারণ কেবল মেলামেশার অভাব। সে যাহা হউক, কুকুরকে উহারা আরও ভয়ানক উৎপাত বলিয়া মনে করে। কুকুরের অত চতুরতা এবং ডাক হাঁক তাহারা একেবারেই পছন্দ করে না। উহাদের যেন আত্ম সম্মান নাই কেবলই ঘেউ ঘেউ। সকল প্রকার কুকুরের মধ্যে ইহারা স্কচ নামক এক জাতীয় কুকুরকেই অত্যন্ত ভয় করে। একদিন এই জাতীয় একটী কুকুর একটা হাতীর শুঁড়ে এমনি করিয়া কামড়াইয়া ধরিল যে হাতীটা ভয়ে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। কুকুরটাও কিছু ভয় পাইল। সে প্রথমতঃ উহাকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু হাতীটা উঠিতে না উঠিতেই সে আবার সাহস করিয়া করিয়া উহাকে আক্রমণ করিল। হস্তী ত একেবারে পাগল! তাহার মাথায় আর বুদ্ধি খেলে না। সে শুঁড় উপরের দিকে তুলিয়া পশ্চাতে হটিল। আর সম্মুখের পা দ্বারা কুকুরটাকে আঘাত করিতে লাগিল। ভাগ্যে তাহার রক্ষক আসিয়া কুকুরটাকে তাড়াইয়া দিল; তাহা না হইলে সে যাত্রা তাহাকে প্রাণভয়ে পালাইতে হইত।

গ্রীস দেশীয় প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ইসপ্ হাতী অথবা স্কচ্ কুকুরের কথা অবগত থাকিলে, তিনি উহাদের বিষয়ে নিশ্চয়ই একটী গল্প লিখিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময়ে গ্রীসে উহাদের একটীও ছিল না।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা।

[Andrew Lang প্রণীত Animal Story Book হইতে গৃহীত]

অর্ঘ্য-দান।

পাঁচটী ছেলে পাণ্ডু রাজার
দ্রোণের শিক্ষাগুণে,
আস্তে আস্তে উঠ্‌লো হয়ে
পণ্ডিত মহারণে।
দেশ বিদেশে যশ তাঁদের
পড়্‌লো শীঘ্র ছেয়ে,
দ্রোণের কাছে শিক্ষা নিতে
অনেকে এলো ধেয়ে।
তাদের মাঝে একলব্য
অতি আস্তে গিয়ে,
ঢিপ্ করে সে কল্লে প্রণাম
দ্রোণের পাটী ছুঁয়ে।

জিজ্ঞেস করেন বুড়ো বামুন
আশীষ করে তায়,
"কি হে বাপু কোন কাজেতে
এসেছ হেথায় ?
ধীরে ধীরে মধুর স্বরে
একটী একটী করে,
বলে বালক "আসছি তব
শিষ্য হবার তরে।"
তাতে কিন্তু নারাজ অতি
পণ্ডিত মহাশয়,
মাথা নেড়ে বল্লেন তিনি
"তাকি ওহে হয়!"
ব্যথা পেয়ে মনের মাঝে
প্রণাম করে তাঁয়,
চলিল বালক ধীর পদে
অন্য পথে হায়!
প্রবেশিল গভীর বনে
জগদীশে স্মরে,
গোপনে সে পূজা করে
দ্রোণের মূর্ত্তি গড়ে।
কালক্রমে শিক্ষাগুণে
হ'ল অতি বীর।
শিক্ষাগুণে হলেন তিনি
আরো নম্র ধীর।
চক্ষু মুদে নিবিড় বনে
বসে আছেন বীর,
সম্মুখেতে গুরুমূর্ত্তি
হাতে ধনুক তীর।
এমন সময় শিকারী কুকুর
উঠ্‌লো সেথা ডেকে,
সাতটী তীর বিঁধে দিলেন
সেই কুকুরের মুখে।
কাণ্ড দেখে অবাক হ'ল
পাণ্ডু পুত্রগণ,
জিজ্ঞাসিলেন দ্রোণাচার্য্য
'কেবা হেন জন ?'
"ওহে বাপু তুমি কেবা ?
হার মানালে যে!
কোথা হতে আস্‌ছ তুমি
তোমার গুরু কে ?"
চক্ষু রেখে দ্রোণের প্রতি
ধীরে বালক বলে,
"তুমিই প্রভু গুরু আমার
আমি তোমার ছেলে।
নিরাশ হয়ে যে দিন প্রভু
হেথায় চলে আসি,
সে দিন তব মূর্ত্তি গড়ি
আঁখি নীরে ভাসি।
তুমি গুরু, পিতা তুমি,
তুমি শিখাও মোরে ;
তুমি শিখাও অস্ত্র বিদ্যা
নিজ হাতে ধরে।
হেন কালে অর্জ্জুনেরে
হেরি ক্ষুণ্ণ অতি,
কৌশল করি মনে মনে
দ্রোণ মহামতি।
মাথা নেড়ে একলব্যে
সম্ভাষিয়ে বলে,
'দক্ষিণাটা দিতে হবে
মোর শিষ্য হলে।'
করজোড়ে বলে বীর
"আমি ভাগ্যবান্,
বলুন গুরু দয়া করে
কি আপনি চান ?"
"তুষ্ট যদি আমায় বাছা
কর্ত্তে তুমি চাও,
ডান হাতের বুড়ো আঙুল
কেটে মোরে দাও।"

হৃষ্ট হয়ে একলব্য
নিজে কেটে নিয়ে,
গুরু পদে ছিন্ন অঙ্গ
অর্ঘ্য দিল গিয়ে।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাস গুপ্ত. বি,এ।

শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবীতে যিনি বড় হইয়া প্রচুর মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হন, তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও সমাজকে উচ্চ করিয়া তুলেন। কেহ বিদ্যা ও সম্মান লাভ করিয়া যশস্বী হইলে তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই সেই গৌরবে আপনাদিগকে ও গৌরবান্বিত মনে করেন। এতদ্ভিন্ন গ্রামবাসী এক জেলার অধিবাসী, এবং দেশ বাসী সকলেই তাঁহার নাম লইয়া গৌরব করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আর এক জন বাঙ্গালী কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতির সম্মানিত পদে আসীন হইয়াছেন। যাঁহারা জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন, পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে উপকার পাওয়া যায়। আমরা এই কৃতী পুরুষের জীবন চরিত যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তোমাদিগকে শুনাইব।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মালিয়াড়া নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৃহে থাকিয়াই বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন না হইলেও সংসারে তাঁহার কোন অভাব ছিল না। ধর্ম্মপ্রাণ মধুসূদন সরল মনে প্রসন্ন চিত্তে সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেন। পঞ্চম বৎসরে বালক দিগম্বরকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি সেই স্কুল হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর পিতা তাঁহাকে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এখানে তাঁহার মেধার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষক মহাশয়গণ চমৎকৃত হইলেন। বালক দিগম্বর বৎসর বৎসর প্রতি শ্রেণীতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৭৫ খৃঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

তৎপরে দিগম্বর এফ্, এ, পড়িবার জন্য পাটনা কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে চলিয়া আসেন। তিনি ক্রমে এফ্, এ, বি, এ, এম্, এ, সকল পরীক্ষাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর বি, এল্, পরীক্ষাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া একটি স্বর্ণপদক বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এইরূপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া দিগম্বর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন।

কিন্তু দিগম্বরের স্বাস্থ্য কখনও ভাল ছিল না। অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং বিদ্যা দ্বারা তিনি অল্পদিনেই হাইকোর্টে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার বিস্তর অর্থাগম হইতেছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কলিকাতায় থাকিতে পারিলেন না। চিকিৎসকগণ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পরামর্শ দিলেন। দিগম্বর অগত্যা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গের অঞ্চলে চলিয়া গেলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিতেই শরীর অনেকটা ভাল হইল। দিগম্বর মুঙ্গেরেই ওকালতী আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে পাটনা কলেজে আইনের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। দিগম্বর ঐ কার্য্যটি পাইবার জন্য খুব চেষ্টা করেন, কিন্তু পাইলেন না। ভগবান কি ভাবে কাহার মঙ্গল সাধন করেন, বুঝা যায় না। তিনি যদি পাটনা কলেজের ঐ কার্য্যটি পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর তাঁহার হাইকোর্টে আসা হইত না!

চারি বৎসর মুঙ্গেরে থাকার পর দিগম্বর বাবুর শরীর বেশ সুস্থ ও সবল হইল। তখন তিনি আবার হাইকোর্টে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকে অন্যরূপ উপদেশ দিলেন, তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া ১৮৯১ খৃঃ অব্দে পুনরায় হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করিলেন।
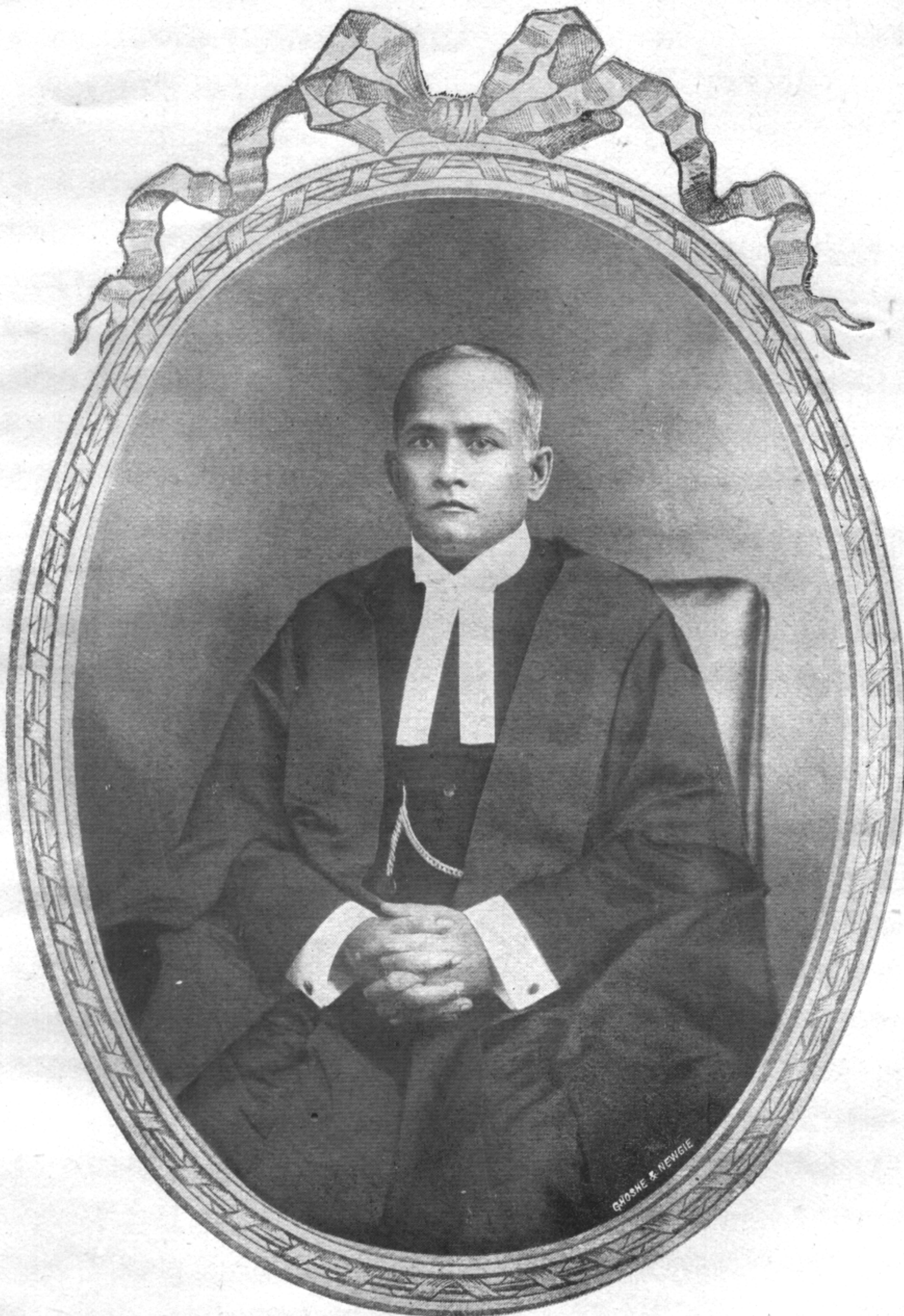
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়।

Mohila Press, 27, 29, Pataldanga St., Calcutta.

দিগম্বর কর্ম্মনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ এবং ধর্ম্মভীরু লোক। তিনি বিজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগকে যেরূপ মান্য করিয়া থাকেন, তরুণ বয়স্ক নূতন উকিলগণকেও তেমনি ভালবাসেন এবং সর্ব্বদা সাহায্য করেন। হিন্দু আইনে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। অমায়িক এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছেন।

এক দিন দেখিয়াছি, এক জন পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোক দিগম্বর বাবুকে তাঁহার মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র শীঘ্র দেখিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছেন। দিগম্বর বাবু তখন অন্য একটা মোকদ্দমার কাগজ দেখিতেছিলেন। ভদ্রলোকটির আগ্রহ দেখিয়া দিগম্বর বাবু বলিলেন, "প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা ব্যবস্থা আছে। যাঁহার কাগজ দেখিতেছি, ইনি দূরদেশে আছেন, মোকদ্দমার খরচ পাঠাইয়া সকল ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। ইহাঁর কাজ আগে না করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব। আপনি ত সম্মুখেই রহিয়াছেন, আপনার কাগজ ইহার পরেই দেখিতেছি।" এই বলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া তৎপর সেই ভদ্রলোকটির মোকদ্দমার নথি হাতে লইলেন।

বিচার পতি সার রবার্ট র‍্যাম্পিনি দিগম্বর বাবুকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তাঁহার এক খানি বৃহৎ গ্রন্থের ("দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন") নূতন সংস্করণ কালে দিগম্বর বাবু তৎপ্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন 'বঙ্গদেশের প্রজাসত্ব বিষয়ক আইন' খানিরও নূতন সংস্করণে দিগম্বর বাবুর উপরই র‍্যাম্পিনি মহোদয় ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

গত মে মাসে হাইকোর্টের মাননীয় চিফ্ জষ্টিস্ ধীমান্, সূক্ষ্মদর্শী, সার লরেন্স্ মহোদয় এক দিন হঠাৎ দিগম্বর বাবু ডাকিয়া পাঠান। দিগম্বর বাবু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র প্রবীণ চীফ্ জষ্টিস্ মহোদয় দিগম্বর বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি এবং চরিত্রের বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এক মাসের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। দিগম্বর বাবু স্বীকার করিলেন। হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস মহাশয় কঠিন রোগে শয্যাশায়ী আছেন। তাঁহার শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য প্রথমতঃ দিগম্বর বাবু নিযুক্ত হন। শুনিতেছি, এখন তিনি হাইকোর্টের পঞ্চদশ বিচারপতির পদে 'পাকা' হইয়াছেন।

দিগম্বর বাবু কখনও ভাবেন নাই, যে হাইকোর্টের জজ হইবেন এবং তাহার জন্য কখনও কোনরূপ চেষ্টাও করেন নাই। সাধু দিগম্বর অযাচিত রূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতির সম্মানিত পদ লাভ করিলেন। যে যতটুক সৎকার্য্য করে, ভগবান তাহাকে তাহার অধিক পুরস্কার দিয়া থাকেন। ভাল হইলে, ভাল কাজ করিলে, সত্যকথা বলিলে, তাহার পুরস্কার এখানেই পাওয়া যায়। কিছু দিন ভাল হইয়া দেখ, এ কথা সত্য কি না।

দিগম্বর চিরদিনই আড়ম্বর ভালবাসেন না। এখনকার দিনে এমন নীরবকর্ম্মা প্রায় দেখা যায় না। লোক চক্ষুর অন্তরালে অক্লান্তভাবে দিগম্বর কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার সংশ্রবে যিনি গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ।

বুধ।

সৌরজগতে যে সকল গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, তন্মধ্যে যে গ্রহ সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তাহার নাম 'বুধ'। বুধের আয়তন ক্ষুদ্র এবং তাহা সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী, যে যখন তাহাকে সূর্য্য হইতে সর্ব্বাধিক দূরে দেখা যায়, তখনও তাহা সূর্য্যের কিরণজালের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, এই জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়া বহু দিন পর্য্যবেক্ষণ না করিলে তাহাকে সহজে দেখা যায় না। এই অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাচীন হিন্দু, আরবীয় ও গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদিগের নিকট বুধ বিশেষ পরিচিত ছিল। গ্রীক কবিগণ বুধকে নিয়ত সূর্য্যের কাছাকাছি চলিতে দেখিয়া, তাহাকে 'সূর্য্যদূত' নাম দিয়াছিলেন।

সূর্য্য হইতে বুধের গড় দূরত্ব প্রায় ৩, ৫৯, ৫৮, ০০০ তিন কোটি উনষাট লক্ষ আটান্ন হাজার মাইল; ইহা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ১৩ ভাগের ৫ ভাগ মাত্র। এই দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না; যখন বুধ সূর্য্যের সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার দূরত্ব ২, ৮৫, ৬৯ ০০০ মাইল এবং যখন সর্ব্বাধিক দূরবর্ত্তী হয় তখন ৪, ৩৬, ৪৭, ০০০ মাইল হইয়া থাকে। বুধ একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার সময় তাহার দূরত্বে যে পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, অপর কোন গ্রহে সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না। সূর্য্য বুধের কক্ষের যে নাভিতে অবস্থিত, কক্ষের মধ্যবিন্দু হইতে তাহা অনেক বেশী দূরে থাকাতেই, সূর্য্য হইতে গ্রহের দূরত্বের এইরূপ বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

বুধ প্রায় ৮৮ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহাকে যদি 'বুধ-বৎসর' বলা যায় তবে দেখা যায় যে আমাদের এক বৎসর পূর্ণ হইতে বুধের চারি বৎসরের বেশী লাগে। বুধের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত; এজন্য তাহার আবর্ত্তন কালে আমরা সময় সময় তাহাকে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী দেখিতে পাই। পার্শ্বস্থ চিত্রে মনে কর 'স' সূর্য্য, 'ব' বুধ এবং 'প' পৃথিবী। বুধ যখন 'ব' বিন্দুতে থাকে তখন উহা সূর্য্য ও
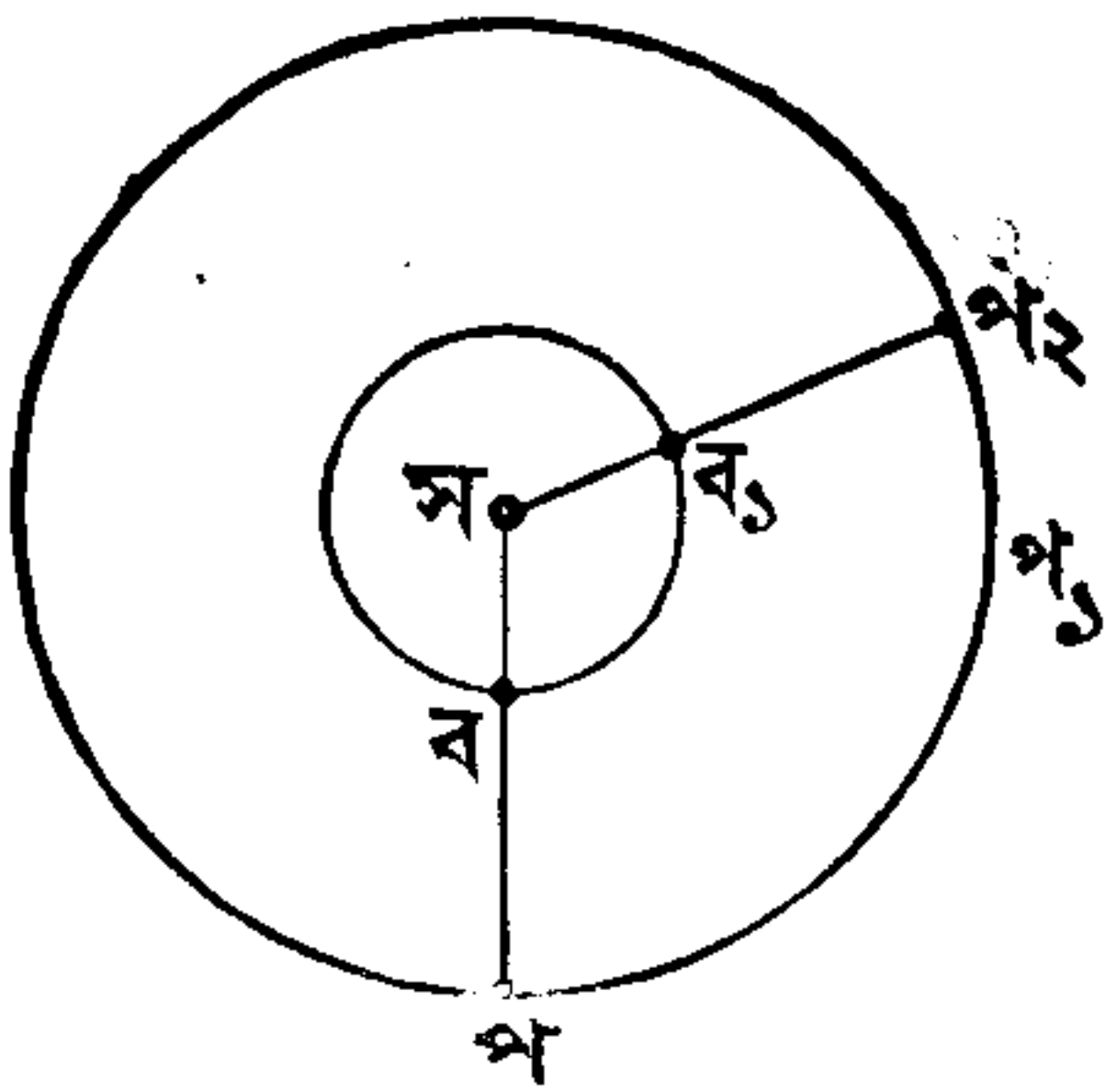
পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয়। তৎপর এক আবর্ত্তন, পূর্ণ করিয়া বুধ যখন পুনরায় 'ব' বিন্দুতে আসে তখন এক 'বুধ-বৎসর' পূর্ণ হয়। কিন্তু সেই অবসরে পৃথিবী প, বিন্দুতে গমন করে, অতএব বুধ পুনরায় সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইতে আরও বেশী দিন লাগিয়া থাকে। গণনা দ্বারা দেখা যায়, যে বুধ 'ব' বিন্দু ছাড়াইয়া আরও ২৮ দিন চলিলে, অর্থাৎ পৃথিবী যখন 'প' বিন্দুতে গমন করে, তখন 'ব' বিন্দুতে তাহা সূর্য্যও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয়। একারণ বুধকে একবার সূর্য্যমধ্যবর্ত্তী হইবার প্রায় ১১৬ দিন পরে পুনরায় ঐ অবস্থায় দেখা যায়।

চিত্র দৃষ্টে ইহাও জানা যায় যে পৃথিবী যখন 'প' হইতে 'প' বিন্দুর দিগে চলিতে থাকে, তখন বুধ আপন কক্ষে আবর্ত্তন করিতে করিতে একবার সূর্য্যের অগ্রে ও একবার পশ্চাতে চলিতে দেখা যায়। বুধ ৮৮ দিনে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করে, এ কারণ তাহার গতি পৃথিবী অপেক্ষা দ্রুত। অতএব 'ব' বিন্দু ছাড়াইয়া চলিবার সময় তাহাকে ক্রমশঃ সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখা যায়; তখন বুধ সূর্য্যের অগ্রে উদয় হইতে আরম্ভ করে। এইরূপ চলিতে চলিতে কিয়দ্দিন পরে তাহার অগ্রগমন বন্ধ হইয়া তাহাকে বিপরীত দিকে চলিতে দেখা যায়; তখন উহা সূর্য্যের অপর দিকস্থ কক্ষাংশে ঘুরিয়া যায়। ক্রমে তাহা সূর্য্যের যে দিকে পৃথিবী অবস্থিত, তাহার বিপরীত দিকে সূর্য্যের অন্তরালে চলিয়া যায়, এবং তাহার পর সূর্য্যের পশ্চাদগমন করে, তখন তাহাকে সূর্য্যের পরে অস্ত যাইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায়, যে বুধ সূর্য্য হইতে বেশী দূরে গমন করিতে পারে না; একারণ যখন উহার অগ্র কিম্বা পশ্চাদগমন অত্যধিক হয়, তখনও সূর্য্যের উদয়াস্ত কাল হইতে তাহার উদয়াস্ত কালের অন্তর ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিটের বেশী হয় না। এ দিকে ঊষালোক সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় এবং গোধূলির আলোক সূর্য্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পরে পর্য্যন্ত পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া রাখে। তখন বুধ ঐ আলোকে আচ্ছন্ন থাকাতে তাহাকে সহজে চক্ষে দেখা যায় না। কেবল ঐ আলোকের সীমা অতিক্রম করিলেই অল্পক্ষণের (প্রায় আধ ঘণ্টার অনধিক কালের) জন্য তাহাকে কিছু দিন ঊষার পূর্ব্বে অথবা গোধূলির পরে দেখা যাইতে পারে;

কিন্তু তখন বুধ আকাশের এত নিম্নভাগে থাকে, যে ভূবায়ু বিশেষ পরিষ্কার না থাকিলে মুক্ত নেত্রে বুধ দর্শন সহজে মানুষের ভাগে ঘটে না। বুধের ব্যাস প্রায় ৩০০৮ তিন হাজার আট মাইল। ইহার দেহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ১৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র; ইহাকে মানদণ্ডে তৌলাইতে পারিলে দেখা যাইবে যে তাহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ১৫ ভাগের এক ভাগ হইবে। বুধের আয়তনের পরিমাণে ওজন বেশী হওয়াতে ইহা প্রমাণ হয়, যে বুধ পৃথিবীর অপেক্ষা গাঢ়তর পদার্থ দ্বারা গঠিত। ঐ পদার্থের গাঢ়তা পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার গাঢ়তার প্রায় ১১/৪ গুণ। ইহা জানা আবশ্যক, যে সৌরজগতে বুধের ন্যায় গাঢ় ও কঠিন গ্রহ আর একটিও নাই। বুধের দৈহিক উত্তাপ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাহা দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না, যে আমরা ধরা পৃষ্ঠ ছাড়িয়া বুধের পৃষ্ঠে গমন করিলে সেখান হইতে অধিকতর শীত অনুভব করিব। বুধ সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তাহাতে সূর্য্যের আলোক অত্যন্ত প্রখর অনুভূত হইবে, এ কারণ তাহার পৃষ্ঠদেশে রৌদ্রের তেজ আমাদের অসহনীয় হইবে। আমরা সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে যে পরিমাণ উত্তাপ পাই, বুধে সূর্য্য কিরণের উত্তাপ তাহার প্রায় ৭ গুণ। বুধের দেহের বর্ণ সীসের ন্যায়; কিন্তু সূর্য্যের আলোক তাহাতে প্রতিফলিত হওয়াতে আমরা তাহাকে তারার ন্যায় উজ্জ্বল দেখিয়া থাকি। বুধে ভূবায়ুর ন্যায় কোন বাষ্পীয় আবরণের লেশমাত্র দেখা যায় না।

বুধ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিবার সময় তাহাকে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া ঘুরিতে দেখা যায়; এ জন্য তাহার এক আবর্ত্তন কালে আমরা পৃথিবী হইতে তাহাকে স্বীয় মেরুদণ্ডে একবার ঘুরিতে দেখিলেও, সূর্য্য হইতে তাহার কোনও আবর্ত্তন দেখা যায় না। ইহা হইতে সহজে বুঝা যায়, যে বুধের একাংশে নিয়ত দিন ও অপরাংশে নিয়ত রাত্রি থাকে। অনেক দিন হইতে বহু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন, যে বুধ প্রায় ২৪১/৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে; অর্থাৎ বুধের এক অহোরাত্র আমাদের অহোরাত্র হইতে কিঞ্চিৎ বেশী। কিন্তু অল্প দিন হইল এক জন ইতালীয় পণ্ডিত বহু পরীক্ষার পর ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে বুধ সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেই একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে ঘুরিয়া যায়; এ জন্য তাহার একমুখ নিয়ত সূর্য্যের দিকে থাকে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে কোন জিনিষের ওজন যে পরিমাণ হইয়া থাকে, ঐ জিনিষকে বুধের উপর লইয়া গেলে দেখা যাইবে, যে তথায় তাহার ওজন এখানকার অর্দ্ধেকেরও কম হইবে। এখান হইতে এক সের ওজনের কোন জিনিষ বুধে লইয়া গেলে তথায় তাহার ওজন ৭১/২ ছটাক মাত্র হইবে, ইহার কারণ এই যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে কোন জিনিষ যে বলে পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, বুধের আয়তনের ক্ষুদ্রতা হেতু তাহার পৃষ্ঠদেশে ঐ বল তদপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে।

বুধের কোনও উপগ্রহ নাই। কিন্তু প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ ইয়ুরোপের কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন, যে বুধের কক্ষের ভিতরে অপর একটি ক্ষুদ্র গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহা সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী এবং বুধাপেক্ষা অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্র হওয়াতে আমরা তাহাকে কোন মতে চক্ষে দেখিতে পাই না। এক বার এক জন ফরাশি পণ্ডিত দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্য দেহ পরীক্ষা করিবার সময় দেখিতে পাইলেন, যে তাহার উপর দিয়া একটি কাল বিন্দু চলিয়া যাইতেছে'। এক জন বিখ্যাত জ্যোতিষী এই সংবাদ পাইয়া ঐ বিন্দুর গতি গণনা করিয়া স্থির করিলেন, যে উহা বুধান্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে একটি কাল বিন্দুরূপে সূর্য্যদেহে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ইহার নাম 'বৈশ্বানর' রাখিয়াছিলেন এবং তাহার গতি দৃষ্টে গণনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে যদি উহা একটি গ্রহ হয়, তবে তাহা সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্বের প্রায় ৩ ভাগের এক ভাগ দূরে থাকিয়া প্রায় ১৯ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে, তিনি উহার আকৃতি দেখিয়া ইহাও গণনা করিয়াছিলেন যে ঐ

গ্রহের ব্যাস বুধের ব্যাসের এক তৃতীয়াংশের বেশী নহে। কিন্তু এ যাবৎ গ্রহের অপর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি একজন আমেরিকান জ্যোতিষী নানা যুক্তি দেখাইয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে বুধের কক্ষের অভ্যন্তরে কোন গ্রহ থাকার সম্ভাবনা নাই। আমরা সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝিতে পারি, যে যেখানে বুধকে চক্ষে দেখিতে এত কষ্ট হয়, সেখানে তাহা হইতেও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন গ্রহ থাকিলে তাহাকে চক্ষে ত দেখা যাইতেই পারে না, দূরবীক্ষণ দ্বারাও সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সূর্য্যের গাত্রে একটি কালিমার আকারে, অথবা পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণ কালে তাহার বিম্বের খুব নিকটে ভিন্ন অন্য কোন অবস্থায় তাহাকে দেখা যাইতে পারে না।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বন্য পশুর অদ্ভুত মনুষ্য প্রীতি।

দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ হডসন সাহেব "লাপ্লাটায় প্রাণীতত্ত্ব সন্ধানী" নামক গ্রন্থে সেই প্রদেশের নানাপ্রকার জীবজন্তুর অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা মুকুলের পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট তাঁহার গ্রন্থ হইতে দুই একটি জন্তুর কৌতুকাবহ কাহিনী বলিব।

তিনি যে স্থানের পশু পক্ষীদিগের বিবরণ এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, তাহার অধিকংশ স্থানই 'প্যামাপাস' নামক কাশজাতীয় এক প্রকার তৃণে আচ্ছাদিত। বসন্ত সমাগমে যখন এই তৃণের শীর্ষদেশে তুষার শুভ্র পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হয়, তখন সেই বহু যোজন বিস্তৃত বিশাল 'প্যামপাস প্রান্তর, বিচিত্র শোভায় দর্শকের নয়ন মুগ্ধ করিতে থাকে। এই তৃণাচ্ছাদিত বিশাল ভূমিখণ্ড নানাপ্রকার জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ; ইহাদের মধ্যে পুমার (দক্ষিণ আমেরিকার সিংহ) চরিত্র বড় বিস্ময়াবহ! ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে ছয় ফিট, তাহার মধ্যে লেজটি প্রায় দুই ফিট। কিন্তু মস্তক নিতান্ত ছোট বলিয়া তাহাদিগকে আকারানুসারে ক্ষুদ্র দেখায়। ইহাদিগের ন্যায় ভয়ানক ও হিংস্র জন্তু সেই প্রদেশে আর নাই। ইহারা কেবল হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্যামপাস প্রান্তরের জীবজন্তুকে তাড়না করিয়া দলে দলে তাহাদিগকে নিহত করিতে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হিংস্র জন্তু জাগুয়ারের (চিতাবাঘ) সহিত যুদ্ধ করিতেও ইহারা ভীত হয় না; জাগুয়ার সম্মুখে পড়িলে অমনি পুমা তাহার পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং একটু সুবিধা পাইলেই পিঠে পড়িয়া দন্তাঘাতে তাহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পুমা 'প্যামপাস' প্রান্তরের সমস্ত জীবজন্তুর ভীতির কারণ হইয়াও মানুষের সম্মুখে পড়িলে নিতান্ত দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করে! তখন তাহাদের উগ্রতা কোথায় চলিয়া যায়। তাহারা মানুষকে আক্রমণ করা দূরে থাকুক, আক্রান্ত হইলে একটি বিড়াল কিংবা কুকুর যতটা সাহসের পরিচয় প্রদান করে, তাহাদিগের নিকট হইতে তাহাও দেখা যায় না; বরং তাহাদের তখনকার কাতরতা দেখিলে মনুষ্য মাত্রেরই তাহাদিগের প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়; তখন তাহারা আক্রমণকারীর দিকে চাহিয়া অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে। তাহারা এরূপ মনুষ্য ভক্ত, যে, ক্ষুধিত হইলেও, একটি নিদ্রিত শিশুকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে না, বরং এমন অনেক ঘটনা শুনা যায়, যে পুমা মানুষকে অন্যান্য জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনা হইতে যুদ্ধ করিয়া আক্রমণকারী জন্তুকে বিনাশ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে হডসন সাহেব তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে যে উদাহরণ দিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

একবার ৩০।৩৫ জন যুবাপুরুষ একত্রে শিকারে বহির্গত হয়, যখন সকলে শিকারে মত্ত, হরিণ প্রভৃতি জন্তুর পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তখন এক জন শিকারী অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে সকলের অলক্ষ্যে ভূমিতে পড়িয়া যায়। শিকার শেষ হইলে সকলে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সেই সঙ্গীটিকে

পাওয়া গেল না, কেবল আরোহীহীন অশ্বটি সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল। পর দিন সকলে মিলিয়া তাহার অন্বেষণে আবার শিকারে বহির্গত হইল। অনেক অন্বেষণের পর সে পূর্ব্ব দিবসের শিকারের স্থানে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রাত্রে সে যে অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, তাহা এই। সে বলে, যে অন্ধকার হইবার ঘণ্টা খানেক পরে একটা পুমা তাহার নিকট আসিয়া বসিল, কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। রাত্রি যখন গভীর হইতে লাগিল, তখন পুমাটি কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল, একবার তাহার দিকে আসে, আবার দূরে চলিয়া যায়। অবশেষে একবার অনেকক্ষণের জন্য তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া এবার আর সে ফিরিয়া আসিবেনা এই ভাবিয়া আহত শিকারী ঘুমাইয়া পড়িল। অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের ভীষণ চীৎকারে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া হাতে ভর দিয়া উঠিয়া দেখিল, একটা চিতাবাঘ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু মুখটি তাহার পশ্চাৎ দিকে ফিরান, দেখিয়া মনে হয়, কাহারও উপর যেন তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ রহিয়াছে। বাঘ তখনই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই পুমার গর্জ্জন শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল, যে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে এই চিতা বাঘটি তাহাকে অনেকবার আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পুমা তাহার রক্ষক হইয়া তাহাকে এই ভীষণ জন্তুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পর তাহাদিগকে আর দেখা গেল না।

১৫১৫ শকে দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে Beneous Ayres এর স্প্যানিস উপনিবেশবাসীদিগকে একটি প্রাচীর বেষ্টিত নগরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ইণ্ডিয়ানদিগের দৌরাত্ম্যে বাহির হইতে তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্য আসিবার পথ রুদ্ধ হওয়াতে দলে দলে লোক অন্নাভাবে মরিতে লাগিল, কেহ কেহ ইঁদুর প্রভৃতি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল। সেই সময় একজন অল্পবয়স্কা রমণী ক্ষুদ্র জন্তুর অন্বেষণে নগর হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়েন। ইণ্ডিয়ানেরা তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাদের গ্রামে ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার কয়েক মাস পরে উপনিবেশ কর্ত্তা কাপ্তেন রুইজ অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে ইণ্ডিয়ানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার প্রতি এক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেন। এই রমণীটি ইচ্ছা করিয়া ইণ্ডিয়ানদিগের নিকট গিয়াছে,তাঁহার মনে এই সন্দেহের উদয় হয়। বিচারে এই রমণীর মৃত্যু দণ্ড হয়। তখন তাহাকে বৃক্ষমূলে বাঁধিয়া হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক খাওয়ান স্থির হইল। তদনুসারে নগর হইতে কিছু দূরে এক বৃক্ষ মূলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইল। দুই দিন দুই রাত্রি এরূপ থাকার পর তৃতীয় দিবস কয়েক জন সৈনিক পুরুষ তাহার অস্থি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে না এই ভাবিয়া দেখিতে গিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অক্ষতাবস্থায় দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, যে একটি পুমা প্রতি রাত্রি তাহার নিকট বসিয়া থাকিয়া তাহাকে অন্যান্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য কাহিনী শ্রবণ করিয়া উপনিবেশ কর্ত্তা তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন।

ব্রহ্মপুত্র-স্নান।

সেবারে বুধাষ্টমীর যোগ ছিল। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীর সহিত বুধবারের সংযোগ হইলে ব্রহ্মপুত্র-স্নানের পক্ষে সেদিন অত্যন্ত শুভ বলিয়া গণ্য হয়। এই সংযোগ বহু বৎসর পরে কদাচিৎ এক আধবার ঘটিয়া থাকে,—যেবার ঘটে, সেবার ব্রহ্মপুত্রের তীর ও নীর স্নানার্থীর সমাগমে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে নাঙ্গলবন্ধ ব্রহ্মপুত্র-স্নানের প্রসিদ্ধ তীর্থ। স্থানটী নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব্বসীমায় ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। প্রতি

বৎসর চৈত্র মাসে, অশোকাষ্টমীর দিন, ব্রহ্মপুত্র-স্নান উপলক্ষে নাঙ্গলবন্ধে দেশ-বিদেশস্থ বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। স্কন্দ পুরাণের মতে ঐ দিন পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ, নদী ও সাগর আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হয়। *

নাঙ্গলবন্ধের নাম পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এই নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তদ্‌সূত্রে জানা যায়, বলরাম নাঙ্গল বা লাঙ্গল-চালনা দ্বারা এই নদের সৃজন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় ভীম যখন গদাঘাতে অন্যায়রূপে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন তখন বলরাম তীর্থ-পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন। বর্ত্তমান নাঙ্গলবন্ধ নামক স্থানে পঁহুছিয়া তিনি দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ পান। বলরাম দুর্য্যোধনের গুরু,—শিষ্যের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায় আচরণের সংবাদ গুরুর অন্তঃকরণে দারুণ রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল;—তিনি অন্যায়-সহা ধরিত্রীর উচ্ছেদসাধনার্থে মৃত্তিকাবক্ষে হস্তস্থিত লাঙ্গলের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বিপদের আশঙ্কায় দেবগণ সন্ত্রস্ত হইয়া অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্তবস্তুতি দ্বারা বলরামের সন্তোষ বিধান করিয়া ধরিত্রীর উচ্ছেদ-সাধন-কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। বলরামের হলাকর্ষণে তখন ঐ স্থানে যে খাতের সৃজন হইয়াছিল, তাহাই নাঙ্গলবন্ধ অর্থাৎ নাঙ্গলবন্ধের ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত।

নাঙ্গলবন্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী ব্যতীত সম্বৎসরের অপর কোনদিন এ স্থানের কিছুই মাহাত্ম্য থাকে না। এ সম্বন্ধেও জনবাদ অপর একটি আখ্যানের উল্লেখ করিয়া থাকে। এই আখ্যানে প্রকাশ, দেবতাদের স্তবস্তুতিতে সন্তোষ লাভ করিয়া বলরাম যখন মৃত্তিকাবক্ষ হইতে হলাগ্র উত্তোলিত করিলেন, তখন সেই রন্ধ্রপথে মূর্ত্তিমান ব্রহ্মপুত্র-নদ বাহির হইয়া আসিয়া বলরামকে বলিল, 'প্রভু, যখন আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তখন আমায় এমন একটা মাহাত্ম্যও দান করুন যার বলে আমি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।' বলরাম বলিলেন,—রোস বাপু তোমায় আমি সকল তীর্থের সেরা করিয়া রাখিব। তুমি এস্থানে অপেক্ষা কর—আমি চট্ করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া তীর্থগুলিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছি, ফিরিয়া আসিয়াই তোমার সহিত পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের মিলন ঘটাইয়া দিব, তুমি সমস্ত তীর্থের রাজা হইয়া একেলা যাবতীয়তীর্থের ফল দান করিতে পারিবে।' এই বলিয়াই বলরাম পুনরায় তীর্থপর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ব্রহ্মপুত্র যেস্থানে দাঁড়াইয়াছে, ঠিক তাহারই পশ্চাতে শীতলাক্ষা-নদী অপরূপ লীলা-ভঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, ব্রহ্মপুত্র পিছন ফিরিয়া তাহা দেখিতে পাইল বালসুলভ ক্রীড়া-কৌতুকের উৎসাহে তাহার হৃদয়ও নাচিয়া উঠিল—ব্রহ্মপত্র শীতলাক্ষার দিকে ছুটিয়া চলিল। এই সময়ে পৃথিবীর সকল তীর্থ সঙ্গে লইয়া বলরামও নাঙ্গলবন্ধে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের অবাধ্যতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং এই বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তাহার জল পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। ব্রহ্মপুত্র স্বকৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বলরামের পায়ে পড়িয়া বিস্তর কান্নাকাটি করিল। তাহার ফলে এই শাপান্ত হইল—বৎসরের মধ্যে একদিন পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রকে আশ্রয় করিবে, সেইদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে যে স্নান করিবে তাহার সকল পাপের অবসান হইবে। এই শাপান্ত-অনুসারে প্রতিবৎসর চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী-তিথিতে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ আসিয়া ব্রহ্মপুত্রকে আশ্রয় করে। তাই শুক্লাষ্টমী ব্রহ্মপুত্র-স্নানের যোগ বলিয়া গণ্য হয়।

সেবারে এই অষ্টমীর সহিত বুধবারের সংযোগ হওয়ায় ব্রহ্মপুত্র-স্নানের পক্ষে মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। দেশ-বিদেশস্থ অসংখ্য স্নানার্থী অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবার উদ্দেশে নাঙ্গলবন্ধে ছুটিয়া আসিয়াছে নারায়ণগঞ্জ হইতে

* "পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়ান্তু চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীং॥"

নাঙ্গলবন্ধ পর্য্যন্ত দুই ক্রোশ-ব্যাপী স্থান—পথ ঘাট হাট মাঠ সমস্তই তীর্থযাত্রীর সমাগমে লোকে লোকারণ্য।

রেল-কোম্পানীর স্পেশাল বন্দোবস্তানুসারে স্নানের পূর্ব্বদিন হইতে ঢাকা ও নারাণয়গঞ্জে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেণ চলিতেছে। আমরা ঢাকার বাসা হইতে ভোর তিনটার ট্রেণে নারায়ণগঞ্জে রওনা হইলাম। হাজার হাজার যাত্রী লইয়া ট্রেণ আধ ঘণ্টার মধ্যে নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইল।

শীতলাক্ষার এপারে ও ওপারে নারায়ণগঞ্জ ও মদন-গঞ্জ। পদব্রজগামীর পক্ষে মদনগঞ্জের পথে নাঙ্গলবন্ধে যাওয়ার সুবিধা। নারায়ণগঞ্জ হইতে মদনগঞ্জে যাইবার জন্য খেয়া-নৌকার বন্দোবস্ত আছে। জল-পথে যাত্রীদিগকে নাঙ্গলবন্ধে পঁহুছাইবার জন্য নেভিগেশন কোম্পানী একখানি লঞ্চেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা স্নানার্থী বন্ধুগণ আপন আপন চরণ-দুখানির শক্তির প্রতিই বিশেষ আস্থাবান ছিলাম। সুতরাং লঞ্চের উপর উহার ভার চাপাইবার পক্ষে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া খেয়া-নৌকা-আশ্রয়ের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। উপেক্ষার অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ষ্টীম্-লঞ্চ শীতলাক্ষার তরঙ্গ ঠেলিয়া ছুটিয়া চলিল।

তখনও পূর্ব্বদিক সম্পূর্ণ ফরসা হইয়া উঠে নাই। শীতলাক্ষার অপর পারের জমাট আঁধার ভোরের আলোয় ধূসর হইয়া উঠিতেছিল। ব্যাপারীদের নৌকার আলো ছইয়ের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া জোনাকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল।

ভোরের জোয়ারের প্রতীক্ষায় যে সকল যাত্রী ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াছিল, নৌকা খুলিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা মাঝিকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল—মাঝি হাই তুলিতে তুলিতে গাত্রোত্থান করিয়া নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে তাম্রকূটের বন্দোবস্তে মনঃসংযোগ করিল। যাহারা গাছ-তলায় কম্বল পাতিয়া শুইয়া রাত্রি যাপন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বস্থ সঙ্গীকে জাগাইবার উদ্দেশ্যে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল—সঙ্গী 'আঁ-উ' করিয়া একবার জাগিয়া আবার পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিল; সদ্য-জাগ্রত কোন যাত্রী গুণ গুণ স্বরে 'কেলেসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী' ইত্যাদি নাম-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে এক দল যাত্রী নদী পারী দিয়া যাইতেছিল—খঞ্জনীর তালের সঙ্গে সঙ্গে মিহি ও মোটা গলায় ভজনের সুরে সঙ্গীত উঠিয়াছিল—

'ডুবু ডুবু করে নৌকা, মাল-গুড়া তলায়,
জন্মের মত মানব-তরী অইতো ডুবে' যায়,
—রে—রে—
ঘোর কলিকাল হরিবোল!'

খেয়া-নৌকায় লোক ধরে না। মাঝিরা হটো হটো করিয়া ভাগাইয়া দিয়াও যাত্রীদিগকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। এক হাটু জল ভাঙিয়া ছুটিয়া গিয়া কেহ কেহ নৌকায় উঠিয়া পড়িতেছে। লোকের ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে কোন বৃদ্ধ তল্পী-তল্পা সমেত নদীর কিনারায় চিৎপাত হইয়া পড়িতেছে এবং উঠিয়া গায়ের কাদা মুছিতে মুছিতে অনির্দ্দিষ্ট অনিষ্টকারীর সঙ্গে নৈকট্য সম্পর্ক পাতাইয়া দাঁত খিচাইয়া মধুর গালি বর্ষণ করিতেছে।

একবার যাত্রীসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কিছু অল্প দেখিয়া আমরা খেয়া-নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। নৌকা মাঝ গাঙ্গে আসিতে না আসিতে লংক্লথের-নূতন-সার্ট-গায়ে, ৫ মূল্যের-পেন্সিল-কানে কালো এক ছোকরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে ৴১০ হারে পারের কড়ি আদায় করিতে লগিল। ছোকরাটী খেয়া-নৌকার সরকার।

মদনগঞ্জে পঁহুছিয়া দেখিলাম, পিপীলিকার মত সার বাঁধিয়া যাত্রীর দল রাস্তা পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু। পুরুষ-যাত্রীর মাথায় এক একটি প্রকাণ্ড বেচ্‌কা ও ডান হাতে এক একটী হুঁকা। হুঁকাটীর শীর্ষদেশে সংলগ্ন শৃঙ্খলটী যাত্রীর পাদক্ষেপের তালে তালে হুঁকার কাঠে লাগিয়া ঠুক্-ঠনন্ ঠুক্-ঠনন্ রবে মিহি আওয়াজ করিতেছে। দড়ি-বাঁধা এক একটি পিতলের ঘটী হাতে লইয়া সীমন্তিনীরা নাকের

রসকলি দোলাইতে দোলাইতে পুরুষ-যাত্রীর পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অগ্র-পশ্চাতের শোভা-যাত্রা দেখিতে দেখিতে ও যাত্রীবৃন্দের কোলাহল শুনিতে শুনিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দূর হইতেই তীর্থক্ষেত্র অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল সন্নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম 'নস্থানং তিল-ধারণম্'—যাত্রীর ভিড়ে জল-স্থল কানায় কানায় একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল,—

১। ৭টী কৌটার এক একটীতে ১, ২, ৩, ৭, ১৪, ২৮, ৪৫, টাকা যথাক্রমে রাখিলে ঠিক উত্তর হইবে।

ইহাই আর একরূপ ভাবে সাজাইতে পারা যায়; যথা,—

কৌটা	টাকা
১ম	১৲
২য়	২৲
৩য়	৪৲
৪র্থ	৮৲
৫ম	১৬৲
৬ষ্ঠ	৩২৲
৭ম	৩৭৲

২। একজন প্রতিবেশীর নিকট হইতে ৩টী বলদ চাহিয়া লইয়া আইস। তাহা হইলে ২১টী বলদ আর ৩টী বলদে ২৪টী বলদ হইল। ২৪টী বলদ হইতে ভাগ করিয়া

প্রথম পুত্র তৃতীয়াংশ	৮টী
দ্বিতীয় পুত্র চতুর্থাংশ	৬টী
তৃতীয় পুত্র ষষ্ঠ অংশ	৪টী
চতুর্থ পুত্র অষ্ট অংশ	৩টী
	২১টী

যে ৩টী বলদ চাহিয়া আনা হইয়াছিল তাহা ভাগের পরে ফেরৎ দেওয়া গেল।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটা ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,—

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীনবনীকান্ত বসু, শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবনীকান্ত সেন, Rai N. N. Dey Bahadur, শ্রীমতি সরযুবালা দেবী, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল, শ্রীমতি প্রভাবতী রায়, শ্রীরাসবিহারী বসু, শ্রীঅবনীভূষণ দত্ত, শ্রীরোহিণী কুমার দাস, শ্রীমতি সুহাসিনী সেন গুপ্তা, শ্রীভবাণীচরণ পাহারী, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীহরিনারায়ণ সেন, শ্রীশান্তিনাথ বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতি স্নেহলতা দেবী, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীতিনকড়ি মিত্র, শ্রীবিমলাভূষণ মিত্র, মুকুল, শ্রীবিভুপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, শ্রীকুঞ্জবিহারী মণ্ডল, শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিরোদবিহারী সেন গুপ্ত, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকমলাপদ ভট্টাচার্য্য, কুমারী মমতাময়ী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, মোহাম্মদ ইয়াসিন, শ্রীব্রজমোদন দত্ত, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত গুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র কুমার ঘোষ, ইরেশলাল চৌধুরী, শ্রীকালিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কিরণবালা রায়, শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন বসাক, শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, Members of the Boy's own Library.

নূতন ধাঁধা।

১। চারিবর্ণে নাম তার, বীর সেই হয়।
পদ তার কেটে নিলে, নদী মধ্যে রয়।
পুনরায় পদ তার করিলে কর্ত্তন।
সর্ব্বদাই আকাশেতে করে বিচরণ।
মধ্য দ্বি অক্ষর যদি করহ কর্ত্তন।
প্রাণী-দেহে পুনঃ তার পাবে দরশন।

নিম্নের স্থানগুলি পূর্ণ করিয়া একটি একটি প্রবাদ বাক্য করিতে হইবে।

২। গ—মে—জু— —ন।
য—ক্ষ—খা—ত—ক্ষ— —শ।
—ই—মা— —চে—কা—মা—ভা—।
—দো— —ণ্ডি—দো—ঘা—।
মু—না—ম—ভ্র— —।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

আণ্ট এমি।

ART PRESS

মুকুল

১৫শ ভাগ। } আশ্বিন, ১৩১৬। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পরের জন্য বাঁচা।

কিছু দিন হইতে তোমাদিগকে একটী সুন্দর জীবনের কথা বলিব বলিব মনে করিতেছি, যাহা হইতে পরের জন্য বাঁচা কাহাকে বলে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। প্রায় এক বৎসর হইল, তিনি আমাদের এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তিনি আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরের সেবাতে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ছোট ছোট বালকবালিকার কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। তাহাদের কাছে তিনি এমি মাসী (Aunt Amy) নামে পরিচিত ছিলেন। আমাদের যেমন নীতিবিদ্যালয় এবং তাহার মুকুল, বিলাতে তেমনি অনেক নীতিবিদ্যালয় আছে, এবং Young Days নামে ছেলেদের জন্য এক খানি মাসিক পত্রিকা আছে। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি এই মাসিক পত্রিকার সাহায্যে বালক বালিকাদিগকে ভাল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি যে কত পরিশ্রম করিতেন, কত অর্থব্যয় করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া মনে হইত, ছেলেমেয়েগুলি যেন তাঁহার আপনারই কেহ। লোকে যে তাঁহাকে "এমি মাসী" নাম দিয়াছিল, সে নাম বাস্তবিকই সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল, মেরিয়ান প্রিচার্ড। ১৮৪৬ সালের নবেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এক জন শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তিনি কন্যার শিক্ষার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাঁহার পিতা ফ্রেঞ্চ এবং জর্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পারিস এবং জর্ম্মানি দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেরিয়ানের যখন বয়স চব্বিশ বৎসর, তখন আর্থার ইয়ঙ্ নামক এক জন প্রতিভাশালী পণ্ডিত যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার দুই বৎসর পরে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে সেই যুবকের মৃত্যু হয়। মেরিয়ান আমরণ তাঁহার স্মৃতি সযত্নে হৃদয়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি যে এমি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা আর্থার ইয়াঙের নামের প্রথম অক্ষর এবং নিজের মেরিয়ান নামের প্রথম অক্ষর A m y মিশাইয়া হইয়াছিল। তিনি যে সমুদয় প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিতেন তাহাতে এমি নাম স্বাক্ষর করিতেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক তিনি আর্থার ইয়ঙের উদ্দেশে নিম্নলিখিতরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, "যিনি আমার জীবন উজ্জ্বল এবং পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার পবিত্র

ভালবাসারূপ মহাসমুদ্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিতে এই পুস্তক উৎসর্গিত হইল।” যে রমণী দীর্ঘ জীবনব্যাপী শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত প্রথম বয়সের ভালবাসার স্মৃতি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই ভক্তি হয়।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে এমি আর্থারকে হারান। এখন হইতে তিনি আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরের সেবাতে অর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন। সকল সুখের আশা চূর্ণ হইয়া গেলেও যে জীবনে কাজ থাকে, এমি তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি নীতিবিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। এখন হইতে সেই কার্য্যে তিনি সমুদয় মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তিনি নানাস্থানে গিয়া নীতিবিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, বালকবালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার সহায়তার জন্য পুস্তকাদি লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রণীত অনেক সুন্দর সুন্দর পুস্তক আছে। অনেক দিন ধরিয়া তিনি নীতিবিদ্যালয়ের মাসিক পত্রিকাদির সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন উপদেশ, অর্থাদির দ্বারা তিনি বালক বালিকাদিগের জন্য অনেক করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে কত লোকে এ জন্য ঋণী আছেন।

এমি কেবল বালকবালিকাদিগের মানসিক উন্নতির চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেননা। তিনি দেখিয়াছিলেন, যে অনেক দরিদ্র বালক বালিকা রোগের সময় উপযুক্ত পথ্য এবং শুশ্রূষার অভাবে কষ্ট পায় এবং অনেক সময়ে প্রাণ হারায়। এই জন্য প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে উইনিফ্রেড হাউস নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল বালকবালিকা কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া যাহাদের কিছু দিন বিশেষ পথ্য ও শুশ্রূষার প্রয়োজন, তাহাদিগকে সেখানে রাখা হয়। এই আশ্রমটীর দ্বারা বহুসংখ্যক বালক বালিকা জীবন পাইয়াছে। এমি ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি ইহার সম্পাদিকা ছিলেন; ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন, অনেক সময়ে রুগ্ন বালক বালিকাদের সেবা করিতেন, শয্যা পার্শ্বে বসিয়া গল্প শুনাইয়া, আদর করিয়া তাহাদের মায়ের অভাব মোচন করিতেন। এখন হইতেই তাঁহার মাসী নাম। এমি বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার নিজের সন্তান ছিল না, কিন্তু কত অসহায় বালক বালিকা তাঁহাকে পাইয়া মায়ের অভাব ভুলিয়া ছিল। কত দরিদ্র গৃহে তিনি আশার আলোক সঞ্চার করিয়াছিলেন। কত দরিদ্র পিতামাতা তাঁহার করুণার জন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়াছিলেন। এইত জীবন। কেবল নিজে সুখ ভোগ করাই কি জীবনের লক্ষ্য? যিনি আপনি দুঃখ পাইয়াও পরকে সুখী করিয়া মরিতে পারেন, তাঁহারই মনুষ্য জন্ম সার্থক।

অভাগা।

ভেবোনা জনমাবধি ঘুরিতেছি, পথে পথে,
ভেবোনা বিশাল বিশ্বে কেহ নাহি মম সাথে,
একেলা ঢালিনা অশ্রু, এই কথা মনে রেখো,
যদি পার মধুস্বরে কখনও বা ডেকে দেখো।
ধরণী সুধায় পূর্ণ, সব ছিল মধুভরা,
ফুলে মকরন্দ ছিল, ধরা ছিল সুধা পোরা
কলকণ্ঠ গেত ভাল, ঢেলে দিত পরিমল,
সারা বিশ্ব মোর সুখে আনন্দেতে ঢল ঢল।

অন্তরে ভাসিত কত মনোহর সুখছবি
আমায় প্রসন্ন দেখে হাসিত তরুণ রবি।
হৃদয় আশায় পূর্ণ, বুক ভরা ভালবাসা,
মানসে খেলিত সদা উচ্চ ভাব উচ্চ আশা
সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ চিত্তপটে আছে লেখা,
মানসে দেবতা মম সতত যে দেন দেখা।

মেজ মামা।

আশ্বিন মাস, পূজা আসিয়াছে। গ্রামে তিন চারি বাড়ীতে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঢাকের বাজনাতে গ্রামখানি মাতাইয়া তুলিতেছে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ত একমাস ধরিয়া পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন দেদের বাড়ীতে কুমার আসিয়া বাঁশ ও খড় দিয়া প্রতিমার কাঠাম বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া ছিল, সেদিন গ্রামের সব ছেলে মেয়ে সেখানে জড় হইয়া ছিল; তাহার পর হইতে প্রতিদিন দুটীতে চারটীতে মিলিয়া এবাড়ী ওবাড়ী প্রতিমা কত দূর হইল দেখিতে যাওয়া তাহাদের একটী নিত্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ কাঠাম শেষ হইয়াছে, আজ সরকারদের বাড়ীতে গায়ে মাটী দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে; কাল মিত্রদের বাড়ীতে দোমেটে আরম্ভ হইবে, ছেলেদের মহলে ক্রমাগত এই সব সংবাদ আসিতেছে, যাইতেছে। আজ কাল কার সহরের ছেলে মেয়েরা এসব কথার বোধ হয় মানেই বোঝে না। কিন্তু আমাদের ছেলে বেলায় পল্লীগ্রামে এই সকল খবর এখানকার ছেলেদের কাছে বুয়র যুদ্ধ বা রুষ জাপান যুদ্ধের খবর যেমন তেমনি ছিল। পূজার দিনের এক মাস দেড় মাস আগে কুম্ভকার আসিয়া বাঁশের গায়ে খড় বাঁধিয়া প্রতিমা তৈয়ার করে। তাহার পরে তাহাতে কাদা মাখিয়া প্রথমে প্রতিমার মাথা গড়ায় না, পালিশও করে না, কেবল শরীরটা হাত পা গুলি এক রকম করিয়া খাড়া করে। ইহাকেই বলে একমেটে করা। এই পর্য্যন্ত হইলে নির্ম্মাণ কার্য্য কিছুদিন বন্ধ থাকে; কাদা শুকাইলে কিছুদিন পরে আবার সেই কারিকর আসিয়া প্রতিমা দোমেটে করিতে আরম্ভ করে। তখন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অসুর প্রভৃতি সকলের মাথা লাগান হয়। উপরে ভাল কাদা দিয়া তাহাদের গা বেশ পালিশ করা হয়। তখন প্রতিমা দেখিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর হয়। এই সময় হইতেই ছেলে মেয়েদের জনতা আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ অসুর আর সিংহই তাহাদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করে। সিংহ অসুরের বাম হস্তের কনুইএর কাছে কামড়াইয়া ধরিয়াছে; দুর্গা ঠাকুরাণী তাহার ঘাড়ে পা দিয়া চাপিতেছেন, বুকে এক বর্শা বসাইয়া দিয়াছেন, অসুর তথাপি না দমিয়া ডান হাতের তলোয়ার দিয়া সিংহকে কাটিতে যাইতেছে, এ দৃশ্য ছেলেরা শত বার দেখিয়াও তৃপ্ত হয় না। সেকালে ত আর এত ছবির বই ও কাগজ ছিল না; বৎসরান্তে এক দুর্গাপূজার প্রতিমাই তাহাদের সৌন্দর্য্য পিপাসা তৃপ্তি করিবার এক মাত্র উপায় ছিল। তাই যে কয় দিন পারে,তাহারা প্রাণ ভরিয়া প্রতিমা দেখিয়া লইত। বিশেষতঃ যখন রং দেওয়া আরম্ভ হইত, তখন হইতে আর তাহাদের আহার নিদ্রা থাকিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসিয়া তাহারা তাই দেখিত। প্রথমে সকল প্রতিমার গায়ে এক পোঁচ দুই পোঁচ সাদা রং মাখান হইত; তার পর ভিন্ন ভিন্ন ঠাকুরের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন রং ফলান হইত। দুর্গা ও লক্ষ্মীর গায়ে হলদে রঙ্ দিত সরস্বতীকে সফেদা মাখাইয়া সাদা ধবধবে করিয়া তুলিত; গণেশকে লাল রঙে, অসুরকে সবুজ রঙে ভূষিত করা হইত। ছেলে মেয়েদের মধ্যে এক এক জনের এক একটী প্রিয় ঠাকুর থাকে; কেহ লক্ষ্মীকে ভালবাসে, কেহ সরস্বতীর বিশেষ ভক্ত, কেহ কেহ বা বেচারী অসুরের দুঃখে তাহার পক্ষপাতী; এই সকল লইয়া তাহাদের মধ্যে কখন কখন ঝগড়াও হয়। ঠাকুরের গায়ে রঙ দেওয়া হইলে জল চিত্র করা আরম্ভ হয়; প্রতিমার উপরে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে একটা অংশ থাকে, তাহাতে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ, রামরাবণের যুদ্ধ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস প্রভৃতি চিত্র করা হয়। চিত্রকর যখন একটীর পর একটী ছবি ফুটাইয়া তুলিতে থাকে, তখন ছেলে মেয়েদের আর আনন্দ ধরে না। কাহাকেও কাহাকেও দাদা বা কাকা বা আর কেহ আসিয়া কান ধরিয়া খাইতে লইয়া যাইতে হয়। প্রতিমা নির্ম্মাণের শেষ অঙ্ক যখন মালাকর আসিয়া প্রতিমার গায়ে রাংতা লাগায়। পূজার দুই এক দিন পূর্ব্বে আসিয়া মালাকর ডাকের গহনা দিয়া লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতিকে সুন্দর করিয়া সাজায়। এই সময়ে বুড়োরা পর্য্যন্ত আসিতে আরম্ভ করেন; কাহাদের বাড়ীর ঠাকুর ভাল সাজান হইবে তাহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে; যাহারা যত বেশী টাকা খরচ করিবে, তাহাদের ঠাকুরের তত ভাল সাজ হইবে; সেকালে ত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা পর্য্যন্ত সাজে ব্যয় হইত। কাহাদেরও ঠাকুরের সাজ রূপালী রাংতার, যারা বেশী টাকা খরচ করিতে পারে তারা সোণালি দিয়া

সাজায়। কবে মালাকর আসিয়া ঠাকুর সাজাইতে আরম্ভ করিবে, গ্রামের ছেলে মেয়েরা ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করে। কখনও কখনও পূজার দিন ভোর বেলা পর্য্যন্ত ঠাকুরের সাজ চলে। তাহার পরে যখন ঢুলিরা আসিয়া ঢাকে বাড়ী দেয়, তখন তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। সে কি আনন্দ!

ইতিমধ্যে বাড়ীতে আর এক আনন্দের ঢেউ উঠিয়াছে। সকল বাড়ীতেই পূজার জন্য কিছু না কিছু আয়োজন আছে। গৃহিণীরা দশ পনর দিন পূর্ব্ব হইতে সকল ঘরের ঝুল ঝাড়িয়া নূতন করিয়া লেপিতেছেন; কোনও বাড়ীতে বা নারিকেল কুরিয়া নারিকেলের সন্দেশ তৈয়ারির আয়োজন হইতেছে, কোথাও বা ঝুরির নাড়ু, কোথাও বা তিলের নাড়ু; সকলেই এক উৎসাহ ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ব্যস্ত। কর্ত্তারা পূজার কাপড়ের ভাবনায় অস্থির। যাহাদের টাকা নাই, তাহারা কি করিয়া সকলের কাপড় হইবে, সেই ভাবনায় অস্থির; আর যাহাদের টাকার ভাবনা নাই, তাহারা কাপড় পছন্দ লইয়া ব্যস্ত। দোকানে যাওয়া আসা পড়িয়া গিয়াছে; প্রথমে যে কাপড় আনিলেন, তাহা হয়ত বাড়ীর লোকেরা পছন্দ করিলেন না, তাহা ফিরাইয়া আবার অন্য রকম কাপড় আন; তাহাও যদি পছন্দ না হয়,তবে আবার অন্যত্র চেষ্টা। ছেলে মেয়েরা কাপড়ের জন্য ধুম লাগাইয়াছে। যাহাদের কাপড় আসিয়াছে, তাহারা তাহা পাইবামাত্র সঙ্গীদিগকে দেখাইতে ছুটিতেছে। সঙ্গীদের কাপড় দেখিয়া যাহাদের তখনও কাপড় হয় নাই তাহারা স্বভাবতঃই অস্থির-হইতেছে; কেহবা মায়ের কাছে গিয়া নূতন কাপড়ের জন্য উৎপাত করিতেছে, কেহবা বাবার সঙ্গে দোকানে যাই-তেছে, কেহবা কাঁদিতেছে, আর যাহারা নিতান্ত শান্ত ছেলে, তাহারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই বিষণ্ণ মুখ কিন্তু দুষ্টু ছেলেদের উৎপাত অপেক্ষা মা বাপের হৃদয়কে অধিক ক্লিষ্ট করিতেছে।

সমস্ত গ্রামখানি এইরূপ পূজার আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা দুই ভাই সেবার মামার বাড়ীতে আছি। আমাদের বয়স তখন আট দশ বৎসরের বেশী ছিল না। আমাদের বাড়ীতে কোনও ধুম ধাম নাই। বড় মামা বিদেশে কাজ করেন; সেবার পূজার ছুটী পান নাই, বাড়ীতে আসিবেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে পরিবারে একটী শোকের ঘটনাও হইয়াছিল। বাড়ীতে কেবল দাদা মহাশয়, ছোট দুই মামা, তাঁহারা কোনও কাজ কর্ম্ম করেন না, আর বড় মাসী, তিনি বিধবা। আমরা অনেক সময় মামার বাড়ীতেই থাকিতাম। আমাদের নিজেদের গ্রামে ভাল স্কুল ছিল না, মামার বাড়ী থাকিয়া আমরা সেখানকার স্কুল পড়িতাম। আমার পিতার অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না; আমাদের মা ছোট অনেকগুলি ভাই বোন ও গৃহকার্য্য লইয়া বিব্রত থাকিতেন; কতকটা বোধ হয়, সেজন্যও আমাদিগকে মামার বাড়ী রাখিয়াছিলেন।

সপ্তমী চলিয়া গেল; প্রথম পূজা হইয়া গেল। আমরা সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিতে গেলাম। সঙ্গীরা প্রায় সকলেই নূতন কাপড় পরিয়া গিয়াছিল, আমাদের তখনও কাপড় আসে নাই। আমরা পুরাতন কাপড় পরিয়াই গেলাম। মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলাম না। পূজার মন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ভিড় ঠেলিয়া সকলেই সম্মুখে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। আবার এক এক দল, এক বাড়ীতে ঠাকুর দেখিয়া অন্য বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছে, তখন তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য আর পাঁচ দল ছুটিতেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া কত জন পিষিয়া যাইবার মত হইতেছে। লোকের ভিড়, ঢাকের বাজনা, ধূপের গন্ধ সে এক মহাব্যাপার। কোনও কোনও বাড়ীতে থাকিয়া থাকিয়া লাল নীল আলো জ্বালান হইতেছে। রাত্রি প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত আমরা এবাড়ী ওবাড়ী আরতি দেখিয়া ফিরিলাম।

পরের দিনও আমাদের কাপড় আসিলনা। সঙ্গীদের মধ্যে যাহাদের কাপড় আগে আসে নাই, আজ তাহাদের প্রায় সকলেরই কাপড় আসিল। আমাদের মুখ আরও শুষ্ক হইল। দাদামহাশয়ের হাতে বোধ হয় টাকা ছিল না, অথবা মনে করিয়াছিলেন, বাবা আমাদের জন্য

কাপড় পাঠাইবেন। যে কারণেই হউক আমাদের কাপড় আসিল না। নবমীর দিনও চলিয়া গেল। বিজয়া দশমীর দিন দুপর বেলা পাড়ার সকল ছোট ছেলে মেয়ে নূতন কাপড় পরিয়া সাজিতেছে। ছেলেরা ইহাকে উহাকে ধরিয়া আপনাদের কাপড় কোঁচাইয়া লইতেছে। আমরা দুইটী ভাই বিরস বদনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু কাপড় পাই নাই বলিয়া কোন উপদ্রব করি নাই, কাঁদিও নাই। আমরা বুঝিয়াছিলাম, এবার আমাদের কাপড় হইল না। দাদামহাশয়ও বোধ হয়, আমাদিগকে সেইরূপ কিছু বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। পাড়ার সকলে বিসর্জ্জন দেখিতে যাইতে বাহির হইতেছে। এমন সময় মেজ মামা ছুটিতে ছুটিতে আমাদের জন্য সুন্দর কল্কাপেড়ে শান্তিপুরে কাপড় লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা ত কাপড় দেখিয়া আনন্দে আট খানা হইয়া গেলাম। মেজ মামার বয়স তখন বোধ হয়, কুড়ি বৎসর হইবে; তখন পর্য্যন্ত কোনও কাজকর্ম্ম করেন নাই। বাড়ীতে ছিলেন। আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বোধ হয়, মনে খুব ব্যথা পাইয়া থাকিবেন। সে দিন নিকটবর্ত্তী গ্রামে হাট ছিল। যখন দেখিলেন আমাদের কাপড় হইল না, জানি না কোথা হইতে টাকা যোগাড় করিয়া কাহাকেও না বলিয়া হাটে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই রৌদ্রে ছুটিতে ছুটিতে হাটে গিয়াছেন, এবং আসিয়াছেন, পাছে সময়ে পৌঁছিতে না পারেন। বাড়ীর সকলেই আমাদের কাপড় দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। আমরা নূতন কাপড় পরিয়া সকলের সঙ্গে বিসর্জ্জন দেখিতে গেলাম। সে দিনকার সেই আনন্দ শৈশবের সকল স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। পূজার কাপড় কতবার পাইয়াছি। কিন্তু কেবল সেবারকার সেই কল্কাপেড়ে কাপড়ের কথাই মনে আছে। এখনও যেন চোখের সম্মুখে তাহা দেখিতেছি।

ইহার অল্পদিন পরেই মেজ মামার মৃত্যু হইল। মেজ মামার কথা আর কিছুই মনে পড়ে না। তাঁহার চেহারাটাও ভাল মনে নাই। কিন্তু সেই যে বিজয়ার কাপড় দেওয়ার স্মৃতি, তাহা বুঝি কখনও ভুলিব না।

বিলাতী রমণীর গৃহস্থালী।

বিলাতের মত নূতন ও বিস্ময়কর স্থানে গিয়া যত জিনিষ দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বিলাতী রমণীর গৃহস্থালীর কথা সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। এমন সুব্যবস্থায় সংসার চালান আমি অন্য কোথাও কখনও দেখি নাই। আমার কেবল মনে হয়, অমন গৃহিণীর জন্যই বিলাত এত ক্ষমতাশালী ও উন্নত। এ বিষয়ে দুই একটী কথা এই প্রবন্ধে বলিব।

সে জনতার দেশে কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকল লোকের জন্যই নানা প্রকার থাকিবার স্থান আছে; যথা হোটেল, এপার্টমেণ্ট, বোর্ডিং হাউস্ ও কোন পরিবারে একত্রে থাকা ইত্যাদি। হোটেলে খরচ বড় বেশী পড়ে। খুব সামান্য যে গুলি, সেখানেও কেবল থাকিতে ও প্রাতে পাউরুটি, মাখন ও চা খাইতে সাড়ে তিন শিলিং লাগে, তা ছাড়া আর তিন বার আহারের খরচ ভিন্ন। এপার্টমেণ্টে থাকা খুব সস্তা। সাদাসিদে ভাবে থাকিলে সপ্তাহে এক পাউণ্ড বা পনর টাকায় থাকা যায়। সেখানে ঘর ভাড়া লইয়া থাকার ব্যবস্থা, বাড়ীওয়ালীর সহিত থাকাও চলে, সর্ব্বশুদ্ধ পনর টাকায় হওয়া সম্ভব। সকাল বিকালে ও সন্ধ্যায় খাবার তিনি প্রতি জনের ঘরে ঘরে পাঠাইয়া দেন। একত্র ভোজনের ব্যবস্থা নাই। সুসজ্জিত একটি বা দুটি ঘরের থাকিবার ও শুইবার ব্যবস্থা, তাহার সকল কাজ বাড়ীওয়ালীর মেয়েরাই প্রায় করেন। জুতা ঝাড়া ঘর ঝাড়া প্রভৃতি সংসারের সকল কাজই তাঁহারা নিজে করিয়া থাকেন। সে কাজের দেশে কোনও কাজ করিতেই কেহ ঘৃণা মনে করে না। বোর্ডিংও এপার্টমেণ্টের মত, কেবল এক ঘরে একত্রে এক সময়ে আহার করিবার নিয়ম। এখানে খরচ কিছু বেশি লাগে, কোনও লোকের সহিত তাহার বাড়ীতে একত্র থাকারও প্রথা আছে, সকলেই আগ্রহ করিয়া স্বদেশী বিদেশী সকল লোককেই লয়। হয় বাড়ীর কর্ত্রী অথবা তাহার মেয়েরাই সংসারের সকল কাজ করে। একত্র থাকা, একত্র

খাওয়া ঠিক যেন আপনার লোকের মত। এখানে থাকা ব্যয়সাধ্য প্রায় ২৫ হইতে ৩০এর কমে হয় না। ইহাদের সকল গুলিতেই রমণী জাতির তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়, তাঁহারাই সকল কর্ম্মকর্ত্রী। সে দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোকের উপযোগী সামান্য কাজ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না।

আমি এই সকল থাকিবার স্থানে মাঝে মাঝে অবস্থান করিতাম। উদ্দেশ্য, নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে নানা অবস্থায় মেশা ও তাহাদের মনের ভাব ও কার্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করা।

আর একটি কথা বোধ হয়, এই স্থানে বলা বাহুল্য হইবে না। সেটি এই, যে বিলাতের মত স্বাধীন দেশে রমণী সকল বিষয়েই পুরুষের ডান হাত হইয়া সাহায্য করেন। সে দেশে কম পরিশ্রমের কাজগুলি অধিকাংশ রমণীরা করেন। পোষ্টআফিস বা টেলিগ্রাফ বা টেলিফোঁ বা হিসাব কেতাব রাখা, দোকানে বসিয়া বেচ কেনা করা এ সকলই রমণীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে পুরুষদের সে সকল কার্য্যে অধিকার নাই। ইহার এক কারণ, রমণীদের স্বাধীন বৃত্তি লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া, আর দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের অল্প বেতনে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার দেশে স্ত্রীলোকের স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন আর গৃহের ব্যবস্থা ইহা রাজ্যের প্রধান নিয়ম। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না থাকিলে জাতিগত স্বাধীনতা কি কখনও থাকিতে পারে? আমাদের এ দেশে কিন্তু ঠিক তাহার উল্টা রীতি। সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন এমন করিয়া বাঁধা, যে রমণী জাতির কোথাও স্বাধীন ভাবে দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাঁহারা পুরুষের মুখাপেক্ষী না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। কুমারী অবস্থায় পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অধীনে থাকার নিষ্ঠুর নিয়মে কেবল তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হানি হয় নাই, আমাদের জাতিগত স্বাধীনতাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ স্বাধীন শিক্ষা ও স্বাধীন ভাব আছে বলিয়াই ইংরাজনারীরা যে সকল কার্য্যে নিয়োজিত হন, সকল গুলিই অতি সুচারুরূপে সমাধা করেন। সংসার করা, ঘরকন্না প্রভৃতি কার্য্যেও এই কথা সমান ভাবে প্রযুজ্য। এখানে সেই কথাই বলিব।

আমি যতগুলি স্থানে এইরূপ সংসারের মধ্যে ছিলাম, তাহার একটীর কথা বিস্তারিত বলিব। এটি লণ্ডনের উত্তর দিকে "হাইভোট" নামক স্থানে অবস্থিত। এ স্থানটি উচ্চ পাহাড়ের মত ও ইহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে সুন্দর সুন্দর বাগান ও বেড়াইবার স্থান আছে। এক পেনী দুই পেনী দিয়া চারিদিকে সকল স্থানে অতি অল্প সময়ে যাতায়াতের নানারূপ সুবিধা আছে। "বস্" নামক বড় গাড়ি, মাটির নীচে রেল, সুড়ঙ্গের ভিতর টিউব, বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ি ইত্যাদি। আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, সেটী একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট গলির মধ্যে অবস্থিত, দুধারে দুতালা তেতালা বাড়ী। একটুও স্থান খালি নাই। গলির সম্মুখে ও পশ্চাতে বাগান। তাহা নানা ফুলে ভরা। ঐ সকল দেশে সম্মুখের দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। ঘণ্টা বাজাইলে খুলিয়া দেওয়া হয়। দরজার ছিদ্র দিয়া ডাক হরকরা চিঠি পত্র ভিতরে ফেলিয়া দেয়। প্রবেশ করিয়াই একটি সুসজ্জিত সাধারণ বসিবার ঘর, তাহাতে ছবি ও গৃহসজ্জা আছে তাহার আশে পাশে উপর ও নীচে শুইবার ও বসিবার অন্যান্য ঘর।

সে জনতার স্থানে জায়গার এত দাম; যে দুতালা তিন তালা বাড়ীর নীচেতেও মাটির তলে এক তালা আছে। এই স্থানেই রান্না ও খাওয়া হয় এবং অনেকে থাকেন। সে সকল স্থানও স্যাঁতস্যাঁতে নয়। আলোক ও গৃহসজ্জা দিয়া অতি সুন্দর ভাবে সাজান। সে শীতের দেশে সকল ঘরেই অগ্নিকুণ্ড বা আগুন পোহাইবার স্থান আছে। বিলাতে সকল বাড়ীতে স্নান করিবার ঘর নাই। যখন স্নান করিবার আবশ্যক হয়, বাহিরে যাইয়া স্নান করিবার স্থানে তিন বা দুই পেনী দিয়া স্নান করিতে হয়। সে সকল স্থানে বন্ধ ঘরে অপর্য্যাপ্ত জলে অবগাহন স্নান ও ফোয়ারার জলে স্নান বড়ই আরামের। এমন কি, সাঁতার দিবার স্থানও আছে।

এই বারে রান্না ও ভাণ্ডার ঘরের কথা বলি। রান্না ঘরটি শোবার ঘরের মত পরিষ্কার। তাতে রাঁধিবার জন্য লোহার ষ্টোভ আছে। গ্যাস, বিজলী, বা কয়লা দিয়া রাঁধা হয়। বড় ধোঁয়া হইবার যো নাই, একটি চিমনী দিয়া ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়। চারি দিকে বিভিন্ন আবশ্যক জিনিষ রাখিবার জন্য আলমারী এবং তাক বা কুলঙ্গী আছে। ময়লা বা মাটি কোথাও একটুও নাই। সেই একটি লোহার উনুনেই এক সঙ্গে অনেক প্রকার রাঁধিবার আয়োজন। মধ্যে আগুন আর তাহার চারিপাশে রাঁধিবার স্থান। কোনটিতে ভাজা, কোনটিতে সিদ্ধ, কোনটিতে সেঁকা, কোনওটীতে গরম জল করিবার উপায় আছে। আবার তাহার এক স্থানে প্রস্তুত খাবার গুলি গরম রাখিবার বন্দোবস্ত। এমন সুশৃঙ্খলরূপে কাজগুলি সম্পন্ন হয়, যে একটু অনর্থক খরচ বা সময় ও শক্তির অপচয় হয় না। রান্না ঘরেও সুন্দর বসিবার স্থান আছে। সপ্তাহে এক দিন করিয়া কাপড় কাচিবার নিয়ম আছে। সে দেশে সকলেই প্রায় নিজের কাপড় কাচেন ও সেলাই করেন। সকল কাজেরই নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময় আছে। কোনও সময়ই বৃথা অপব্যয় হইতে দেন না।

রান্নাঘরের পাশের ঘরে আহারের স্থান। সুন্দররূপে সাজান ঘরের মাঝে একটি টেবিল, তাহার চারি পাশে চেয়ার দেওয়া, নিকটে একটি আলমারী ও তাহার উপর আহার্য্য দ্রব্যগুলি সাজান ও ঢাকা থাকে। সেই স্থান হইতে লইয়া সেগুলি মেজের উপর মধ্যস্থানে রাখা হয়। সকলে আপনার আপনার অংশ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে স্বতন্ত্র চামচ দিয়া উঠাইয়া লইয়া আহার করে। সকল বিষয়েই কি সুন্দর পরিপাটী বন্দোবস্ত। গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রী একধারে প্রধান স্থানে বসেন। আর ছেলে মেয়ে গুলি ও অতিথিরা চারিধারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া অতি মিষ্টালাপ করিতে করিতে আহার করেন। খাদ্যগুলি সারবান, শুষ্ক এবং সংখ্যায় ও পরিমাণে অল্প। তাহার একটুও ফেলা যায় না। যাহা বাকি থাকে, তাহা পরে আহারের জন্য রাখা হয়।

পাতের হাড়গুলিও যত্নে সংরক্ষিত হয়। তাহারও দাম ও বিনিময় আছে। সপ্তাহান্তে এক হাড়ের ব্যবসায়ী আসিয়া সেগুলি লইয়া যায় ও বিনিময়ে অন্য কিছু দেয়, ছাইগুলিও এরূপে রক্ষিত হইয়া মুখ ধুইবার ও বাসন মাজিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। উনানের বাকি কয়লা গুলি জল দিয়া নিবাইয়া ও পৃথক করিয়া পর দিনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ছাইগুলি সপ্তাহেতে বিনিময়ে লইয়া যাইবার লোক আছে। রাঁধার পরও ষ্টোভে যে আঁচ থাকে, চেয়ার লইয়া তাহার চারিদিকে বসিয়া আগুন পোহান হয়। যে ভিজা কাপড় থাকে, চারিদিকে মেলিয়া দিয়া সারা রাত তাহা শুকান হয়। এমন কর্ম্মদক্ষতা, এমন মিতব্যয়, অন্য কোথাও দেখি নাই।

এত লোকের কাজ, অথচ অনেক সংসারেই ঝি বা চাকর নাই। সকল কাজ ঘরের লোকেই করেন। ঘর বাড়ী ঝাড়া, রাঁধা বাড়া, বিছানা করা ইত্যাদি। সকল কাজ ঠিক সময়ে হইতেই হইবে, সেই দৃঢ় নিয়ম থাকাতেই এত কাজ করিবার সময় হয়। আহারের সময় অতীত করিয়া বাড়ী ফিরিলে সে দিন আর সামান্য রুটি ও মাখন ভিন্ন আর কিছুই আহার করিতে পাওয়া যাইবে না।

যথা সময়ে এই সকল কাজ একত্র পড়িয়া শেষ করিয়া তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সাজ সজ্জা করিয়া বসে। অবসর করিয়া প্রতিদিনই এক একবার আপন আপন প্রিয়জনের সহিত খানিকটা বেড়াইয়া আসে। তখন তুমি তাহাদের সুসজ্জিত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলে চিনিতে পারিবে না। আনন্দ, উৎসাহ ও সঙ্গীতে তখন তাহাদের দেহ মন ভরা। তাহাদের একত্র পাশাপাশি পা ফেলিয়া চলিবার কালে দেখিলে কত শক্তি ও আনন্দের ভাব দেখা যায়। কার্য্যের সময় একাগ্রচিত্তে কাজ ও আনন্দের সময় অন্য সকল কথা ভুলিয়া আনন্দ, এই তাহাদের রীতি। কোনও কাজই তাহাদের নিকট হেয় নয়। অথচ নিজে এমন যে সুন্দর বেশ পড়িয়া নগরের পথ দিয়া চলিতেছেন, সেগুলি সকলই তাহার অবসর

কালে আপনার হাতেই সেলাই করা কাজ; অতি কম খরচে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রতি দিন সন্ধ্যা আটটার আমরা একত্রে আহার করিতাম। তখন আমরা সকলে দিনের কাজ করিয়া ও তাহারাও সংসারের কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করিয়া সুন্দর বেশ ভুষা করিয়া আগুন পোহাইবার স্থানে আসিয়া বসিত। সন্ধ্যাবেলা এইরূপ সুন্দর সংসর্গে সেই অগ্নিকুণ্ডের স্থান কি সুন্দর হইত। তখন আনন্দ ও শান্তি ভিন্ন আর কোনও ভাব মনে থাকে না। কথায় বলে "Evening fire side in an English home" অর্থাৎ ইংরাজ গৃহে সন্ধ্যাবেলা আগুন পোহাবার স্থান।" দিনের কাজ শেষ করিয়া নিশ্চিন্তমনে একত্র বসিয়া সকলে গল্প করা যেন স্বর্গীয় আনন্দের মত। রমণীরা পিয়ানো বাজাইয়া গান করেন। ছেলেরা চারিধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে। এমন সুন্দর স্থান আমি আর কোথাও দেখি নাই! আমাদের এদেশে কবে এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইবে।

দুই রাজপুত্র।

এক ছিল রাজা। তাঁর প্রথম রাণীর দুই ছেলে। রূপ আর বসন্ত। প্রথম রাণী মারা গেল। রাজা আর এক রাণী বিয়ে করলেন। সতীনের ছেলে রূপ বসন্ত নতুন রাণীর দু চক্ষের বিষ। নিজের পেটের ছেলে নেই, রূপই পাবে বাপের সিংহাসন; এ কি সৎমার সহ্য হয়! কিন্তু কিছু বল্‌তে পারেন না; ছেলে দুটি রাজার যে বড় আদরের!

রূপ বসন্তর পায়রা ছিল ঝাঁকে ঝাঁক। নোটন, গেরোবাজ, মুক্‌খি, লক্কা আরো কত কি। রোজ বৈকালে পাঠশালা থেকে এসে দু'ভায়ে পায়রাগুলিকে নিয়ে কত খেলা, কত খাওয়ানো, কত আদর! আকাশে যখন তারা ঝাঁক বেঁধে উড়ত, যেন মেঘের ঘটা।

একদিন হ'ল কি? একটা পায়রা উড়ে গিয়ে ছোট রাণীর ছাতে গিয়ে বসল। রাণী তখন বৈকালে ছাতে বসে হাওয়া খাচ্ছেন, আর একগাছি মালা গাঁথছেন। রাণী বল্লেন, ঐ ত দেখি রাজকুমারদের পায়রা, পায়রা লুকিয়ে রাখলে ছেলে দুটো আর বাঁচবে না, তাদের যে পায়রাগত প্রাণ। এই বলে রাণী পায়রাটি খপ্ করে ধরে একটা চুপড়ীর মধ্যে ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রেখে দিলেন।

এ দিকে রাজকুমারেরা দেখলে, পায়রা ছোটরাণীর ছাতে গিয়ে বসল, কিন্তু আর ফিরে আসে না, তারা কত শিশ্ দিয়ে ডাকলে, তবুও এলোনা তারা ভাবলে এ কি হ'ল? যাই একবার রাণীমার ছাতে উঠে দেখে আসি এই বলে, ছোটরাণী যেখানে বসে মালা গাঁথছিলেন সেই খানে এসে দুই ভাই হাজির। ছোটরাণী যেন কিছুই জানেন না! বল্লেন "কি বাবা রূপ, কি বাবা বসন্ত! কি মনে করে?"

রূপ বল্লে "মা, আমার একটা পায়রা এসে এখানে উড়ে বসেছিল, কোথায় গেল দেখেছ?"

রাণী বল্লেন "পায়রা টায়রা তো কই দেখিনি! আমি সেই কখন থেকে মালা গাঁথছি। হ্যাঁ, একটা কাক এসে একবার ঐ থামটার উপর বসেছিল বটে!"

এই কথা শুনে রাজপুত্রদের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল; সেটা তাদের বড় সখের পায়রা, সে পায়রার নাকি জুড়ি নেই; সাতসমুদ্রের পার থেকে কোন্-এক দেশের রাজা মহারাজকে এই পায়রাটি ভেট দেয়।

এক দাই ছিল; সেই রূপ বসন্তকে মানুষ করেছিল সে ছিল ছাতের পাশে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে। সে আগাগোড়া সবই দেখছিল। তার আর সহ্য হলনা। সে ত ছুটে এসে চুপড়ীটা তুলে ধরলে, অমনি পায়রাটা ফট্ ফট্ করে উড়ে গেল। তখন রাজপুত্রদের মুখে হাসি ধরে না। কিন্তু ছোট রাণীর মুখ একেবারে সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল!

সেদিন ত যায়। পরের দিন আবার সেই পায়রাটা উড়ে গিয়ে ছোট রাণীর ছাতে গিয়ে বসল। ছোট রাণী আবার তাকে ঝুড়িচাপা দিয়ে রেখে দিলেন। রাজপুত্রেরা তাড়াতাড়ি ছুটে এল 'পায়রা কই? পায়রা কই' রাণী

রেগে উঠে বল্লেন, "রোজ রোজ পায়রা পায়রা! আমাকে জ্বালাতন করলে দেখছি।"

বসন্ত কাকতি মিনতি করে বল্লে, "দাওনা মা! পায়রাটা" রাণী আরো চটে উঠে বল্লেন, "তোর পায়রা কোন্ চুলোয় গেছে কে জানে!"

রূপ আর থাক্‌তে পারলে না, সে বলে উঠল, "কাল তো তুমি চুরি করে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছিলে!"

রাণী বল্লেন, "অ্যাঁ! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে চোর বলিস্!"

রাণী রাগে গর গর করতে করতে গোসা ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

রাজপুত্রেরা তাড়াতাড়ি ঝুড়ি খুলে পায়রা নিয়ে সেখান থেকে দৌড় দিলে।

(২)

রাজা এসে দেখেন রাণী গোসা ঘরে শুয়ে। গায়ে নেই গহনা, চুল এলো। চোখ দুটী কেঁদে কেঁদে জবার মত লাল। কি হয়েছে? ব্যাপার কি? রাণীর মুখে কথাই নেই, কেবল ফোঁস ফোঁস করে কান্না। রাজা শুধাইলেন, "কি হয়েছে?"

রাণী বল্লেন, "হয়েছে আমার মাথা, আমার মুণ্ড!"

রাজা বল্লেন, "কার মরণদশা ঘটেছে, তোমাকে কাঁদালে কে? একবার বল, কাকে বনে পাঠাব, গর্দ্দান নিতে হবে কার?"

রাণী বল্লেন, "কারো না, কারো না। সকলের চক্ষু শূল আমি, আমাকেই বনবাস দাও, সকল বালাই চুকে যাক্!"

রাজা বল্লেন, "সে কি কথা?"

রাণী বল্লেন, "তোমার রূপ বসন্ত আমাকে চোর বলে আমি এ প্রাণ রাখব না।"

রাণীর এত রাগ দেখে রাজা ভাবলেন, তবে ত রাজপুত্রেরা রাণীকে খুবই অপমান করেছে! দাও তাদের নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে!

(৩)

দুই ভাই বনবাসে চলেছে; যে পায়রার জন্য আজ তাদের নির্ব্বাসন, সেই পায়রাগুলিকে ছেড়ে যেতে তাদের প্রাণ কাঁদতে লাগল।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুই ভাই চলেছে, দেখতে দেখতে বাপের রাজ্য শেষ হ'ল; তার পরই বন; ভীষণ বন! বাইরে থেকে সেই বনের চেহারা দেখে মনে হয়, যে সারি সারি প্রকাণ্ড দৈত্য গিলতে আসছে, তাদের প্রাণ আঁৎকে উঠলো!

বন একেই অন্ধকার, তার উপর রাত হয়ে এল। আর চোখে দেখা যায় না। ঘোড়া দুটো সমস্ত দিন দৌড়ে আর চলতে চায় না। রাজপুত্রদেরও আর শরীর বয়না। বনের শেষ যে কোথায়, তা ঠিক নাই, মনে হ'ল যেন পৃথিবীর সমস্তটা জুড়ে সেই বন। সে বনের শেষ নেই!

রূপ, বসন্তকে ডেকে বল্লে, "ভাই, ঘোড়া থামাও, এইখানেই আজকের মত বিশ্রাম করি।"

বসন্ত বল্লে, "বেশ দাদা, সেই ভালো।"

রূপ বল্লে, "বসন্ত! তুমি ছেলেমানুষ তোমার বড় কষ্ট হয়েছে, তুমি ঘুমোও, আমি জেগে পাহারা দি।"

বসন্ত বল্লে, "সে কি হয় দাদা! আমার কিছু কষ্ট হয়নি; তোমাকে দেখে বরঞ্চ বোধ হচ্ছে, তোমার শরীর ভেঙে পড়েছে, তুমি বিশ্রাম কর, আমি পাহারা দি।"

রূপ বল্লে, "তবে এক কাজ কর; তুমি খানিক ঘুমোও, আমি পাহারা দিই; আমি খানিক ঘুমুই, তুমি পাহারা দাও।"

কে প্রথমে জাগবে, তাই নিয়ে দুজনে খানিক তর্ক করলে। ছোট ভাই গোঁ ধরে বসল, সেই প্রথম জাগ্‌বে। পাছে বসন্তের মনে কষ্ট হয়, সেই জন্য রূপ তাহাতেই রাজি হ'ল।

দেখতে দেখতে রূপ এক গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বসন্ত ধনুক-হাতে পাহারা দিতে লাগল।

এমন সময়ে শুনতে পেলে এক হংস হংসীতে কথা হচ্ছে।

হংস বল্‌ছে "আমার আদর আজ তোমার চেয়ে বেশি।"

হংসী বল্‌ছে, "কখন না; আমার আদর চিরকালই বেশি!"

"কিসে?"

"তোমার আদর কিসে?"

হংস বল্লে, "তবে শোন কেউ যদি আজ আমাকে কেটে খেতে পারে, তো সে রাজা হবে!"

হংসী বল্লে, "আমাকেও যদি কেও এখন রেঁধে খায় তাহ'লে সে মন্ত্রী হয়!"

হংস হো-হো করে হেসে উঠে বল্লে "মন্ত্রী হয়। আর আমার যে একেবারে রাজা! কে বড়?"

হংসী সেই হাসিতে চটে উঠে বল্লে "মন্ত্রী না থাকলে রাজা থাকে কোথায়? মন্ত্রীর জোরেই তো রাজা!"

হংস কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে বসন্তর তীর এসে তার বুকে বিধল, চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তেই আর একটা তীর এসে হংসীর বুকে লাগল; তারা গাছের উপর থেকে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

বসন্ত তখন শুকনো পাতা কুড়িয়ে, আগুন জ্বেলে হাঁস দুটোকে পোড়াতে আরম্ভ করলে। রান্না শেষ হয়েছে, এমন সময়ে রূপ জেগে উঠে বল্লে "ভাই বসন্ত, এবার তুমি ঘুমোও, আমি পাহারা দি।"

বসন্ত বল্লে, "দাদা, দুটো হাঁস পেয়েছি, এস দুজনে ভাগ করে খাই, পুড়িয়ে ঠিক করে রেখেছি!"

হাঁসদের সেই কথা আর দাদাকে বল্লে না।

রূপ বল্লে "ভাই, তুমি ঐ বড়টা নাও।"

বসন্ত জানত, সেই বড়টা খেলে সে নিজেই রাজা হবে। তা কি হয় দাদাকে রাজা করা চাই! আমি তার পায়ের তলায় মন্ত্রী হয়ে বসবো। এই ভেবে দাদাকে বল্লে, "দাদা তুমি বড়, তুমি বড়টা খাবে, আমি ছোট আমি ছোটটা খাবো!"

তখন রাজহাঁসটি খেলেন দাদা, আর ছোট ভাই বসন্ত খেলেন পাতিহাঁসটি।

তার পর, রূপ জেগে পাহারা দিতে লাগলেন। আর বসন্ত ঘুমালেন।

ভোর না হতেই দুই ভায়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। খানিক দূর গেছেন, এমন সময়ে বসন্তচেঁচিয়ে উঠে বল্লেন, "দাদা! দাদা! ঐ যাঃ চাবুক গাছটা গাছতলায় ফেলে এসেছি। না নিয়ে এলে তো চল্‌বে না!"

রূপ বল্লেন "ঘোড়া ফেরাও, চল, চাবুক নিয়ে আসি।"

বসন্ত বল্লেন "তুমি আর দাদা, কষ্ট করে যাবে কেন? আস্তে আস্তে এগোও, আমি চাবুক গাছটা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তোমায় ঠিক ধরে নেবো।"

রূপ উত্তর মুখে ধীরে ধীরে যেতে লাগলেন, আর বসন্ত দক্ষিণ দিকে বাতাসের মত উড়ে চলে গেলেন। সেই দুজনে ছাড়া-ছাড়ি হ'ল।

(৪)

রূপ একলা পড়ে, কত কথা ভাবতে ভাবতে চলেছেন, ত চলেইছেন। যেতে যেতে যেতে যেতে এক জায়গায় হঠাৎ এসে দেখেন, বন আর নাই সামনে এক পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড সিংহদ্বার সাত মহল রাজবাড়ী। কত লোকলস্কর সৈন্যসামন্ত তার আর সংখ্যা নাই। তারা সব দল বেঁধে আজ বেরিয়েছে। থেকে থেকে বল্‌চে 'জয় মহারাজের জয়।'

রূপ তাদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য রাসটা একটু টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একটা কোণের দিকে সরে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ এসে তাঁকে বল্লেন, "মহারাজ!"

রূপ বল্লেন "কে তুমি?"

"আজ্ঞে, আমি মন্ত্রী।"

"মহারাজ, কাকে বলছ?"

"আজ্ঞে, মহারাজকেই মহারাজ বলছি।"

কথা শেষ হ'তে না হতেই এক জন এসে রূপের মাথার উপর রাজছত্র ধরে দাঁড়ালোরূপ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। মন্ত্রী তাই দেখে বল্লেন, "মহারাজ! এ দেশের এই নিয়ম যে, রাজা যে দিন মরেন, ঠিক তার পর দিনই যে অতিথি এই রাজ্যে আসেন, তিনিই রাজা হন কাল রাত্রে মহারাজ স্বর্গে গেছেন, আজ সকালে আপনি এসে উপস্থিত, আপনিই এখন এদেশের রাজা।"

বাজনা বাদ্যি করে, শাঁখ বাজিয়ে, হুলু দিয়ে মন্ত্রী মহাশয় ও প্রজারা মিলে রূপকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল। রাজসিংহাসনে বসালে। রূপ সেইখানে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। কি জানি-কেন তাঁর প্রাণের ভাই বসন্তর কথা আর মনেই রইল না।

(৫)

এদিকে বসন্ত চাবুকগাছটি কুড়িয়ে আনতে গিয়ে দেখেন, গাছতলায় চাবুকটিকে জড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড অজগর ঘুমিয়ে আছে। যেমন চাবুকগাছটি তুলে নিতে যাবেন, অমনি সাপটা জেগে উঠে ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে সেই নিশ্বাস গায়ে লাগতে না লাগতেই বসন্ত অচেতন হয়ে ঢুলে পড়লেন।

বসন্ত অজ্ঞান হয়ে সেইখানেই পড়ে রইলেন। তাঁর ঘোড়াটা তাই দেখে সেখান থেকে নড়ল না, প্রভুর মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাপটা ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে বনের মধ্যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'ল।

সাতদিন, সাত রাত্রি বসন্ত সেই রকম অচেতন হয়ে মড়ার মত পড়ে রইলেন, সে সাত দিন সে বনের মধ্য দিয়ে কেউ গেল না, কেউ তাঁকে দেখলে না, কেবল তাঁর ঘোড়াটা তাঁর আশে পাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগলো।

সাতদিন পরে এক বেদে আর বেদেনী সাপের বিষ খুঁজতে সেই বনের মধ্যে যাচ্ছে; যেতে যেতে বসন্তকে দেখতে পেলে।

বেদেনী বল্লে "দেখ, দেখ, কেমন একটি রাজপুত্রের মত ছেলে গাছতলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।"

বেদে বল্লে "তাই তো! বোধ হয় বেঁচে নেই, শরীর যে একেবারে নীল! দেখি দেখি কি হয়েছে!"

তারপর বসন্তর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নেড়ে চেড়ে দেখে বল্লে "এ যে সর্পাঘাত।"

বেদেনী তাই শুনে আঁচলে চোখ মুছে বল্লে, "আহা এমন চাঁদপানা ছেলেকেও সাপে কামড়ায় গা! সাপের শরীরে কি একটু দয়া মায়া নেই!"

বেদে মন্ত্র পড়তে লাগলো, মন্ত্রের চোটে বনের যত সাপ সুড় সুড় করে সেই গাছতলায় এসে হাজির হ'ল! বেদে দেখলে তাদের মধ্যে কোন সাপই রাজপুত্রকে কামড়ায় নি। সে আবার মন্ত্র পড়তে লাগলো; কিন্তু কিছুতেই সে অজাগর আর আসে না। তখন ঝুলির ভিতর থেকে চারটে কড়ি বার করে তাইতে মন্ত্র পড়ে বেদে চার দিকে ছেড়ে দিলে, চারটে কড়ি চারদিকে বোঁবোঁ শব্দে ছুটলো! খানিকক্ষণ পরে একে একে তিনটে কড়ি ফিরে এলো, কিন্তু একটা আর ফেরেনা। বেদে বিড় বিড় করে মন্ত্র পরে সেই কড়িটাকে ডাকতেলাগল, তখন দেখা গেল, সেই কড়িটা একটা সাপের মাথায় বসে, সওয়ার যেমন ঘোড়া চালায়, তেমনি করে একটা প্রকাণ্ড সাপকে বেদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। বেদে বুঝলে, এইবার সেই সাপ পাওয়া গেছে।

বেদে সাপকে জিজ্ঞাসা করলে—"রাজপুত্রের এমন অবস্থা কেন করেছ?"

সাপ বল্লে "উনি যে আমার একজোড়া হাঁস মেরেছেন।"

বেদে বল্লে, "এক জোড়া হাঁস গেছে, বনের মধ্যে হাজার হাজার হাঁস আছে এর জন্য এত। শীঘ্র শীঘ্র রাজপুত্রের দেহ থেকে বিষ তুলে নাও, নইলে ঝেঁটিয়ে তোমার গায়ের বিষ ঝেড়ে দেবো। আমি যেমন তেমন বেদে নই!"

সাপ ভয়ে ভয়ে সুড় সুড় করে এসে রাজপুত্রের মুখ একবার শুঁকলে, তাইতেই রাজকুমার ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বেদে তখন নিশ্চিন্ত হল। বেদেনীর মুখে হাসি ধরে না। সাপটা মনের ক্ষোভে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে বনের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে পড়ল।

(৬)

বসন্ত জেগে 'দাদা—দাদা' বলে চীৎকার করে উঠলেন। সাপের বিষে সাত দিন, সাত রাত্রি যে ঘুমিয়ে ছিলেন, তা জান্তেও পারেন নি। বেদের মুখে শুনে তখন বুঝতে পারলেন। দাদাকে দেখতে না পেয়ে তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

চোখের জল হাতে মুছে বসন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে

বললেন ; ঘোড়াটা আহ্লাদে একবার চিহিঁহিঁ করে ডেকে উঠলো, তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট। তারপর এক নিঃশ্বাসে যে রাজ্যে রূপ রাজা হয়েছেন, সেই রাজ্যের সিংহদ্বারের সাম্‌নে এসে একেবারে খাড়া হলো। তখন নিষুত রাত, সিংহদ্বার বন্ধ। ক্ষিধে তেষ্টায় বসন্তর প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে, তিনি দরজার উপর ঘন ঘন ঘা দিতে লাগলেন, "ওগো কে আছ দরজা খোলো, আশ্রয় দাও প্রাণ বাঁচাও।"

তখন সিংহদ্বারের পিছন থেকে এক প্রহরী চীৎকার করে বল্লে, "রাত্রে দরজা খোলবার হুকুম নেই এরাজ্যে বাঘ বেরিয়েছে আজ রাতের মত বইরে থাক কাল সকালে এসো।"

বসন্ত তাই শুনে এক গাছে উঠ্‌লেন। ডালের সঙ্গে নিজেকে আচ্ছা করে বেঁধে শুয়ে রইলেন। কিছু পরেই একেবারে অকাতরে ঘুম। ঘোড়াটা গাছের তলায় চরতে লাগলো! খানিক পরে এক ভায়নক গর্জ্জন! সেই গর্জ্জনে বসন্তর ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি উঠে দেখেন এক প্রকাণ্ড বাঘ! ঘোড়াটার উপর লাফিয়ে পড়ে আর কি! তিনি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে খাপের থেকে তলোয়ার খুলে বাঘটাকে এক কোপে টুটুকরা করে ফেল্লেন। তারপর আবার এসে গাছতলায় ঘুমুতে লাগলেন।

এখন, রাজা ঢাঁড়া দিয়েছিলেন, এই বাঘটাকে যে মারতে পারবে তাকেই তিনি মন্ত্রী করবেন, আর তার সঙ্গে সেই দেশের যিনি রাজা ছিলেন তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। বসন্ত সে কথা জান্‌তেন না তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগলেন।

ভোর বেলা কোটাল বেরিয়ে দেখে বাঘটা দুটুকরো হয়ে পড়ে আছে, আর এক রাজপুত্র গাছতলায় আরামে ঘুমুচ্ছেন। সে ভাবলে এ ত বেশ হয়েছে! এক কাজ করি! দিইওর বুকে ছুরি বসিয়ে। এই বলে বসন্তকে ছুরি মেরে তাড়াতাড়ি এক ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলে। তার পরে করলে কি, তারই খানিক রক্ত নিয়ে গাময় মাখ্‌লে। মেখে, বাঘের মাথাটা হাতে করে একে বারে রাজার কাছে এসে হাজির হল। বল্লে, মহারাজ! বাঘ মেরেছি, বকশিষ দিন।"

রাজা খুসী হয়ে বল্লেন, "বেশ! বেশ! আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী ; রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।"

কোটাল ফাঁকি দিয়ে রাজমন্ত্রী হল, রাজকন্যাকে বিয়ে করলে। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

(ক্রমশ)

দূরবীণের সাক্ষী।

(ফরাসী হইতে)

ফ্রান্স দেশে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এক ছিল রাজা। তাঁকে লোকে বল্‌ত চতুর্দ্দশ লুই, কারণ তাঁর আগে আর তেরোটি রাজার ঐ একই লুই নাম ছিল। যেমন বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের রাজার নাম, সপ্তম এডোয়ার্ড। এ কথা তোমরা সকলেই জান, কিন্তু ফ্রান্সের বিষয় বোধ হয়, বিশেষ কিছু জান না। এখন আর ফ্রান্সে রাজা নাই। এখন "সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান।" যিনি নামে সর্ব্বপ্রধান, তিনিও কাজে সকলের মত না নিয়ে এক পাও নড়তে পারেন না। একে বলে, "প্রজাতন্ত্র শাসন।" কিন্তু যখন ফ্রান্সে রাজতন্ত্র শাসন ছিল, এক রাজার হুকুম সকলকে মেনে চল্‌তে হ'ত, সে কালের একটি গল্প তোমাদের বল্‌ছি, শোন।

আমাদের যেমন গঙ্গা, ফ্রান্সে তেমনি "সেইন" নদী বিখ্যাত। এই নদীর ধারে চতুর্দ্দশ লুইর একটি প্রাসাদ ছিল, সেখানে তিনি মধ্যে মধ্যে লোকজন সঙ্গে গিয়ে দিন কতক বাস করতেন। এই প্রাসাদের একটি বিশেষ ছাদ তাঁর বড় প্রিয় ছিল, সেখানে ত্রয়োদশ লুইর একটি দূরবীণ রাখা ছিল, তাই দিয়ে চার দিক্‌ দেখ্‌তে তিনি বড় ভাল বাস্‌তেন। এক দিন লুই রাজা, নদীর একটি সুদূর বাঁকের দিকে দূরবীণটি ঘুরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তোমরা অবশ্য জান, যে দূরবীণের ভিতর দিয়ে খুব দূরের জিনিষও স্পষ্ট দেখা যায়। রাজা দেখ্‌লেন, যে সেখানে তিনটি

ছেলে স্নান করছে। তাদের মধ্যে একটির বয়স কম, বছর ১৪।১৫ হবে, তা'কে যেন, আর দু'টি বড় ছেলে সাঁতার খেলাচ্ছে মনে হ'ল। বোধ হয়, তার উপর কোন রকম জোর জুলুম চল্‌ছিল, কারণ সে শীঘ্রই তা'দের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে কাপড় পরবে বলে পাড়ে উঠ্‌লো। তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তাকে আবার ডাকৃতে লাগ্‌ল, কিন্তু বেশ বোঝা গেল, যে সে তাদের কাছে সাঁতার শিখ্‌তে নারাজ। তখন সেই দু'টি বড় ছেলে ছোটটির উপর গিয়ে পড়ে, মারধোর ক'রে তা'কে জোর করে নদীতে ফিরিয়ে এনে স্বহস্তে ডুবিয়ে মারলে। সব হয়ে গেলে তারা ভয়ে ভয়ে নদীর দুই ধারে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, পাছে ঘটনাটি কারো নজরে প'ড়ে থাকে। কিন্তু কাউকে না দেখ্‌তে পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত মনে কাপড় প'রে নদীর ধার দিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চল্‌লো। রাজা তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চ'ড়ে, সঙ্গে পাঁচ ছয় জন সঙ্গীন ধারী নিয়ে সেই পথে গেলেন, এবং শীঘ্রই তাদের নিকট-বর্ত্তী হ'য়ে বল্লেন "মশায়, আপনারা তিন জনে এক সঙ্গে বেরিয়েছিলেন লোকে দেখেছে; আপনাদের সঙ্গীটির কি হ'ল ?" এ প্রশ্নটি তিনি এমন স্থিরভাবে করলেন, যে তারা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল; কিন্তু পরক্ষণেই উত্তর করলে যে তাদের সঙ্গীটির নদীর জলে সাঁতার কাটবার ইচ্ছে ছিল, তাই তা'কে সেখানে রেখে এসেছে, সে এখনো জলে ঝাপাইঝুড়ি খেল্‌ছে, ঐ যেখানে নদীর ধারে বন ঘুরে গিয়েছে, ঘাসের উপর তার পরণের কাপড় দেখা যাচ্ছে। এই উত্তর শুনে রাজা ছেলে দু'টির হাত বাঁধ্‌তে বল্লেন। সঙ্গীনধারীগণ তাদের দুজনকে এক সঙ্গে বেঁধে রাজবাড়ীতে নিয়ে এসে আলাদা আলাদা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে। মহারাজার রাগের অবধি ছিল না। তিনি প্রধান বিচার পতিকে ডাকিয়ে স্বচক্ষে যেমন যেমন ঘটনা দেখেছিলেন, সব খুলে বল্লেন এবং তৎক্ষণাৎ ন্যায় দণ্ডবিধানের হুকুম দিলেন। বিচারপতি কিছু বেশী সূক্ষ্মদর্শী, তিনি রাজাকে অনুনয় বিনয় ক'রে ভেবে দেখ্‌তে বল্লেন, যে এত দূর থেকে দূরবীণের মধ্যে দিয়ে সম্ভবতঃ আসল ঘটনা অন্য রকম দেখিয়েছে; হয়ত ছেলে দু'টি সঙ্গীকে জলের নীচে চেপে না রেখে জলের উপর ভাসিয়ে রেখেছিল মাত্র।

রাজা বল্লেন, "না না মশায়, তা'নয়, তাকে ওরা জোর ক'রে নদীতে ধ'রে এনেছিল, তা'কে ডুবিয়ে মারবার সময় উভয় পক্ষেরই চেষ্টা আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি।"

সূক্ষ্মবুদ্ধি বিচারপতি আবার আপত্তি তুলে বল্লেন "কিন্তু মহারাজ আমাদের ফৌজদারী আইন অনুসারে দুইটি সাক্ষী আবশ্যক, আপনি যতই প্রবলপ্রতাপ হউন না কেন, একটি লোকের সাক্ষ্যের বেশি ত দিতে পারবেন না।"

রাজা বিনীতভাবে উত্তর করলেন, "মহাশয়, আমি আপনাকে অনুমতি করছি, আপনার রায়ে এই কথা বল্‌বেন যে ফ্রান্সের রাজা এবং নাভারের রাজা * এক বাক্যে এই ঘটনা সম্বন্ধে আপনার কাছে সাক্ষী দিয়েছেন। কিন্তু এই যুক্তিতেও বিচারপতি আশ্বস্ত হ'লেন না দেখে রাজা অধৈর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "আমার পূর্ব্ব পুরুষ নবম লুই অনেক সময় নিজে বিচারাসনে বসতেন; আমি আজ তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে এখানে ন্যায় বিচার করব।"

তৎক্ষণাৎ মহারাজার হুকুমে দরবার গৃহ সজ্জিত হ'ল। সহরের কুড়ি জন প্রধান ব্যক্তিকে রাজবাড়ীতে ডেকে পাঠানো হ'ল, এবং রাজসভার সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষ তাঁদের সঙ্গে কাষ্ঠাসনে বস্‌লেন। মহারাজ তাঁর চিহ্নাদি ধারণ ক'রে সিংহাসনে উঠ্‌লেন; হত্যাকারী দু'জনকে উপস্থিত করা হ'ল। তা'দের উল্টাপাল্টা কথায় এবং থতমতভাবে কারোই বুঝ্‌তে বাকি রইল না, যে তারা বাস্তবিকই অপরাধী। সেই হতভাগ্য বালকটি তাদের সৎ ভাই ছিল ও সম্প্রতি তার মায়ের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল। হিংসা ও লোভের বশীভূত হ'য়ে এই পশুগণ তা'কে মেরেছিল। রাজা এই দণ্ড দিলেন, যে ঠিক যেখানে তারা ছোট ভাইটিতে ডুবিয়ে দিয়েছে, সেই খানেই তাদের দুজনকে এক সঙ্গে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হবে।

---

* "নাভার" রাজ্য পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ছিল, পরে ফরাসী রাজ্যের অন্তর্গত হ'লেও ফ্রান্সের রাজা দুই নামই ধারণ করতেন।

যখন রাজা সিংহাসন থেকে নামলেন, ছেলেরা তাঁর পায়ে প'ড়ে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে। রাজা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, যে ধর্ম্মবুদ্ধি তাদের দোষ স্বীকারে প্রবৃত্ত করিয়েছে, কিন্তু তাঁর রায় বজায় রইল। যে সূর্য্যদেব তাদের দুষ্কর্ম্মের সাক্ষী ছিলেন, সেই সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই তাদের শাস্তি ভোগ করতে হল। পর দিন তিন ক্রোশ তফাতে নদী তীরের গাছতলায় তিন জনেরই মৃতদেহ একত্রে পাওয়া গেল। রাজা তাদের স্বতন্ত্র গোর দেবার হুকুম দিলেন। ছোট ছেলেটির মৃত দেহ রাজ পল্লীতে আনা হ'ল, এবং মহারাজার ইচ্ছানুসারে সঙ্গীনধারীগণ তার নির্দ্দোষ জীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাবিহিত সম্পন্ন করলে।

এই গল্পটির লেখিকা মাডাম ডি ম্যাণ্টন্ চতুর্দ্দশ লুইর রাজসভার একটি প্রধান অলঙ্কার ছিলেন। তিনি কোন বন্ধুর চিঠিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন, সুতরাং এটা তাঁর স্বচক্ষে দেখা সত্য ঘটনা বলেই মনে হয়। দুষ্কর্ম্মের ফল যদি এরকম হাতে হাতে ফলত এবং রাজারা যদি নিজেই বিচারের ভার গ্রহণ করতে পারতেন, তাহলে প্রজার অনেক দুঃখ সহজে মোচন হত। কিন্তু বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বরের পক্ষে সকল সময় এই দুরূহ কাজ নিজে করা সম্ভব নয়, কাজেই পরের উপর ভার দিতে হয়। আদালতে সাধারণতঃ যে সব সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তার বদলে এই রকম দুরবীণের খাঁটি সাক্ষ্য পেলে অনেক উদ্বিগ্ন বিচারপতি যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সুন্দরবন।

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী গঙ্গানদীর অগণ্য শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিভক্ত বিস্তীর্ণ অরণ্যময় ভূমিখণ্ড সমূহের সমষ্টিকে সুন্দর বন বলে। সুন্দর বন চব্বিশ-পরগণা হইতে বাখরগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জোয়ারের সময়ে, সমুদ্রের লোনা জলে বন প্লাবিত হয়, তখন বোধ হয়, সুন্দরবন অতি নিম্নভূমি ; আবার ভাঁটার সময়ে দেখিলে বোধ হইবে, যে সুন্দর বন অতি উচ্চভূমি। এখানে বৎসরে প্রায় ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, এবং ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে। মাটী অতিশয় লোণা ও এঁটেল। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অনেকস্থলে উচ্চ বালুর ঢিপি এবং বন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বা নালার তীরে অসংখ্য মৃত্তিকার ঢিপি আছে। লবণের ব্যবসা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক লোক বন মধ্যে ঢিপি বাঙ্গিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। বালীর ঢিপিগুলি বায়ু কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে।

সুন্দর বন নানা বৃক্ষ ও আগাছায় পরিপূর্ণ। বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরীই শ্রেষ্ঠ ; গরাণ ও গেঁউয়া গাছও প্রচুর আছে। পশুরী, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষেরও অভাব নাই। কিন্তু ইহাদের কোন গাছই শাল বা সেগুণের সমকক্ষ নয়। সুন্দরীই এই বনের শ্রেষ্ঠ গাছ, এই জন্য ইহার নাম সুন্দরবন।

সুন্দর বনে মিঠা মাটীর কোন গাছ জন্মে না। কোন কোন ঢিপির উপর তেঁতুল ও তুলসী গাছ দৃষ্ট হয়। অনুমান হয়, যে লবণ প্রস্তুতকারীগণ ইহাদের প্রবর্ত্তক। ঢিপি ব্যতীত সর্ব্বত্রই লোণা মাটী। ভেরী বাঙ্গিয়া লোণা জল বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলে, দুই বা তিন বৎসরের পরেই, সুন্দরবনে ধান্য উৎপন্ন করা যায়। সুন্দরবনের মাটী অতিশয় উর্ব্বরা, তথায় বহু বৎসর বিনা সারে উত্তম শস্য জন্মিতে পারে। এইরূপে এক্ষণে অনেক লাট (ভূমিখণ্ড) আবাদ ও প্রজার বাসভূমি হইয়াছে।

সুন্দরবন অতি ভয়াবহ স্থান। ম্যালেরিয়া এদেশের কর্ত্তা, ব্যাঘ্র ইহার সহচর। কর্ত্তাকে আমরা কখনও দেখি নাই সত্য ; কিন্তু ইনি বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র বিরাজিত। বাঙ্গালীর এমন ভীষণ শত্রু আর নাই। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, যে এই অদৃশ্য শত্রু মশক বাহনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। এই জন্যই বোধ হয় সুন্দরবনে মশকের এত উপদ্রব! অনেক লাটদার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন তেজস্বী লাটদার অসীম দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা সহকারে বনজঙ্গল কাটিয়া মশকদিগকে তাড়াইতে

সক্ষম হইয়াছেন। এক্ষণে এই সকল লাট শস্যশালী ও মনুষ্যের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সুন্দরবনের খাল মৎস্যে পরিপূর্ণ। প্রায় সকল প্রজারই গরু আছে। চারি বা পাঁচ বৎসরের মধ্যে পুষ্করিণীর জল মিষ্টতা লাভ করে; তখন প্রজার কোন অভাব থাকে না।

সুন্দরবনের অন্যতর কর্ত্তা ব্যাঘ্রের চরিত্র অতিশয় কৌতুকাবহ। তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা পাঠক দিগকে উপহার দিতেছি।

পশুর মধ্যে ব্যাঘ্রের ন্যায় চতুর জন্তু বিরল। ইহার চতুরতার নিকট অনেক সময়ে মনুষ্যকেও হার মানিতে হয়। ব্যাঘ্র অতিশয় বলবান, তথাপি শিকার দেখিলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লম্ফ মারে না। তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা বলপ্রকাশ করিলে শিকার হস্তচ্যুত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ব্যাঘ্র শিকার ধরিতে সর্ব্বদা চোরের নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। ধীরতা ও চতুরতায় বাঘিনী বাঘ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং বাঘিনীর শিকার কখনও ব্যর্থ হয় না।

সুন্দরবনে অসংখ্য হরিণের বাস। হরিণের মাংস ব্যাঘ্রের প্রধান খাদ্য। হরিণ অত্যন্ত নিরীহ ও ভয়াতুর জন্তু; এমন কি, কুকুরেও ইহাদিগকে বধ করে। ব্যাঘ্র হরিণ শিকারের নিমিত্ত ঝোপের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, হরিণ চরিতে আসিলেই এক লম্ফে একটাকে ধরিয়া ফেলে। হরিণ অত্যন্ত নিরীহ হইলেও বড় সতর্ক। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে ইহারা এমন বেগে ধাবিত হয়, যে ব্যাঘ্রও ইহাদিগকে দৌড়িয়া ধরিতে পারে না। হরিণগণ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে ও চক্র করিয়া শয়ন করে চক্রের অভ্যন্তরে শাবকগণ রক্ষিত হয়। শয়নকালে সকল হরিণেরই মুখ বহির্ভাগে অবস্থান করে। এমন সতর্ক হইলেও বিপদের সময়ে ইহাদের হিতাহিত কোন জ্ঞান থাকে না; সুতরাং অচিরাৎ ইহারা শত্রুকবলে পতিত হয়।

মহিষ ব্যাঘ্রের অন্য প্রিয় খাদ্য। কিন্তু হরিণ শিকারের ন্যায় মহিষ শিকার সহজ নহে। মহিষগণ দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। ব্যাঘ্র কাহাকেও আক্রমণ করিলে, দলস্থ সমস্ত মহিষ সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে, ব্যাঘ্র তখন পলায়নপর হয়। দলভ্রষ্ট মহিষ দেখিলেই ব্যাঘ্রবীর নিঃশব্দে ইহার ঘাড়ে পড়িয়া ইহাকে বধ করে।

গৃহপালিত গরুকে বাঘ গ্রাহ্যই করে না। বাঘ পাল হইতেও গরু লইয়া প্রস্থান করে। গরুর দ্রুত ধাবন ক্ষমতা কিম্বা দলবদ্ধভাবে ব্যাঘ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইবার সাহস নাই।

অন্য কোন আহার না পাইলে বাঘ বিল খালে নামিয়া মাছ ধরিয়া খায়। ইহাদের মাছ ধরিবার প্রণালী চমৎকার। জলে নামিয়া বাঘ এমন ভীষণবেগে জল আলোড়ন করে, যে মৎস্যগণ প্রাণভয়ে পাড়ে লাফাইয়া পড়ে। তখন বাঘ তাহাদিগকে ধরিয়া উদরসাৎ করে। বাঘ অল্পজলের মৎস্য জলের মধ্যেই থাবা দিয়া চাপিয়া ধরিতে পারে।

সাধারণতঃ বাঘ মনুষ্যকে ভয় করে এবং মানুষ দেখিলেই পলায়ন করে। কিন্তু অসতর্ক মানুষ পাইলে ছাড়ে না। গত বৎসর একটা বাঘ ফ্রেজারগঞ্জ লাট হইতে আট জন মানুষ মারে। তাহাদের মধ্যে একজন ঝোপের আড়ালে শুইয়াছিল ও অন্যান্য অনেক লোক জঙ্গল কাটিতে ছিল। ইত্যবসরে লুক্কায়িত বাঘ নিদ্রিত মানুষটীকে লইয়া প্রস্থান করে। আর এক দিন এক প্রজা ঘন জঙ্গলের পাশে এক নালার ধারে দাঁড়াইয়া বড়শি দিয়া মাছ ধরিতে ছিল। একটা বাঘ জঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া ছিল, অসাবধানতা বশতঃ ঐ ব্যক্তি ইহাকে দেখিতে পায় নাই। পরে জানা গেল, যে বাঘ শিকারের লোভ ও ভয়ের সমস্যায় অনেকক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে বিচরণ করিয়া অনেক গাছগাছড়া পদ-দলিত করিয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ প্রজা দাঁড়াইয়া বড়শি ফেলিতেছিল। পরে সেই ব্যক্তি যেমন বসিয়া বড়শি ফেলিতেছিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে বাঘ নিঃশব্দে আসিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করে। আর এক দিবস এক প্রজা জাল দ্বারা খালে মাছ ধরিতে ছিল। এমন সময়ে, সে অপর পারে ঝোপের মধ্যে এক বৃহৎ বাঘ দেখিতে পায়। সে যেমন ভয়ে চীৎকার করিয়া দৌড়িল, অমনি বাঘ এক লম্ফে খাল পার হইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। যাহার প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে, তাহার দুর্ব্বলতা বুঝিলে বাঘ অগৌণে তাহাকে আক্রমণ করিবে। বাঘ দেখিবামাত্র সে ব্যক্তি উহার অপেক্ষাও

বলবান, এইরূপ নির্ভয়ে দন্ত প্রকাশ না করিলে তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। তবে ইহা সত্য, যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পাইলে তাহাকে শাসন করা দুঃসাধ্য।

আমি শুনিয়াছি, ফ্রেজার গঞ্জে একবার একটা বাঘ একজন মানুষ ধরে। তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এক সাহসী ব্যক্তি এক গরান কাঠের লগুড় হস্তে বাঘের সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মস্তকে আঘাত করে। বাঘ তখন প্রমাদ গণিয়া শিকার ছাড়িয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি ফ্রেজারগঞ্জের অনতিদূরে নামখানা নামক আবাদে একটা বাঘিনী সাত কি আট জন মানুষ মারিয়াছে। এক দিন প্রাতে উক্ত স্থানে পাঁচ ছয় জন মজুর জঙ্গল কাটিতে ছিল। এমন সময়ে একটা বাঘিনী আসিয়া একজন মজুরকে ধরাশায়ী করে। বাঘ দেখিয়া তাহার সঙ্গীরা পলাইল। কিন্তু তাহাদিগের একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তি সঙ্গীদিগের অনুকরণ না করিয়া অসীম সাহসের সহিত কুড়ুলী হস্তে বাঘিনীর দিকে ছুটিল। বাঘিনী কুঠারধারী ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিকার ছাড়িয়া পলাইল।

অসীম বলবান ভীমকায় হস্তী বাঘের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিলে দেখিলে ক্ষুদ্র জন্তুর ন্যায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। বাঘের গন্ধ পাইলেই হস্তীর হিতাহিত জ্ঞান বিলোপ হয়। মৃত বাঘের কোন ক্ষমতা নাই, যাহার ইচ্ছা সে ইহাকে পদ দলিত করিতে পারে, এইরূপ দেখিতে দেখিতে হাতী বাঘ শিকারে যাইতে শিক্ষা করে; তৎপরে শিকারীর সহিত বাঘ শিকার করিতে সদর্পে বনে প্রবেশ করে।

ব্যাঘ্রের তর্জ্জন গর্জ্জন বিক্রম বল যতই থাকুক না কেন শিকার ধরিতে ইহার প্রধান সহায় চতুরতা। এই চতুরতা দ্বারাই বাঘ সমস্ত জন্তুর উপর অক্লেশে আধিপত্য করে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর নিম্নে যথাক্রমে দেওয়া গেল।

১। মেঘনাদ।

২। গরু মেরে জুতা দান।
যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।
নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, T. W. Ahmed Esqr. শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীশিতাংশুকুমার রায়, শ্রীপ্রেমনীহার রায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, শ্রীমতী কমলকুমারী মিত্র, শ্রীঅনিলকুমার দাস গুপ্ত, শ্রীসমছুল আরকিন খান, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহিমাদ্রিকুমার শর্ম্মা, শ্রীসুহৃদচন্দ্র রায়, কুমারী স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, শ্রীমন্মথমঙ্গল সরকার, শ্রীশৈলেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীরনেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী সুপ্রভা সুন্দরী দেবী, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীসুশীলকুমার দাস শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল, শ্রীপ্রমোদলাল ধর শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমাধবচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় শ্রীঅবলাকান্ত সেন, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসুধীরকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মন., শ্রীমতী প্রেমনলিনী ঘোষ, শ্রীতিনকড়ি মিত্র, শ্রীমতী রানীমায়া দেবী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমোহাম্মদ ইয়াসিন, শ্রীবিমলাংশুভূষণ মিত্র, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত গুপ্ত, শ্রীসন্দর্শন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতী বিনয়বালা বসু, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলোকরঞ্জন সেন।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটা ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,—

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ, শ্রীঅমলেন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীচারুচন্দ্র বসু, শ্রীকমলাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, শ্রীমতী অমিয়বালা সিকদার, শ্রীআবদুল বাকির খাঁ, শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীপ্রয়াগচন্দ্র বসু, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু. শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী।

নূতন ধাঁধা।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত প্রেরিত,

১। সূচ সম মাথা মম করাত সম ধার
কেশ হীন মাথা কিন্তু উদরে জটা তার
মুনি নই ঋষি নই শরীরে মাখী ছাই
বুঝহ পাঠকগণ সংকেতে জানাই।

২। তিন বর্ণে নাম মম ঝুলি বৃক্ষশিরে
মস্তক কাটিলে কিন্তু ভাসী নদী নীরে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ডাক্তার জর্জ্জ থিব

ART PRESS

মুকুল
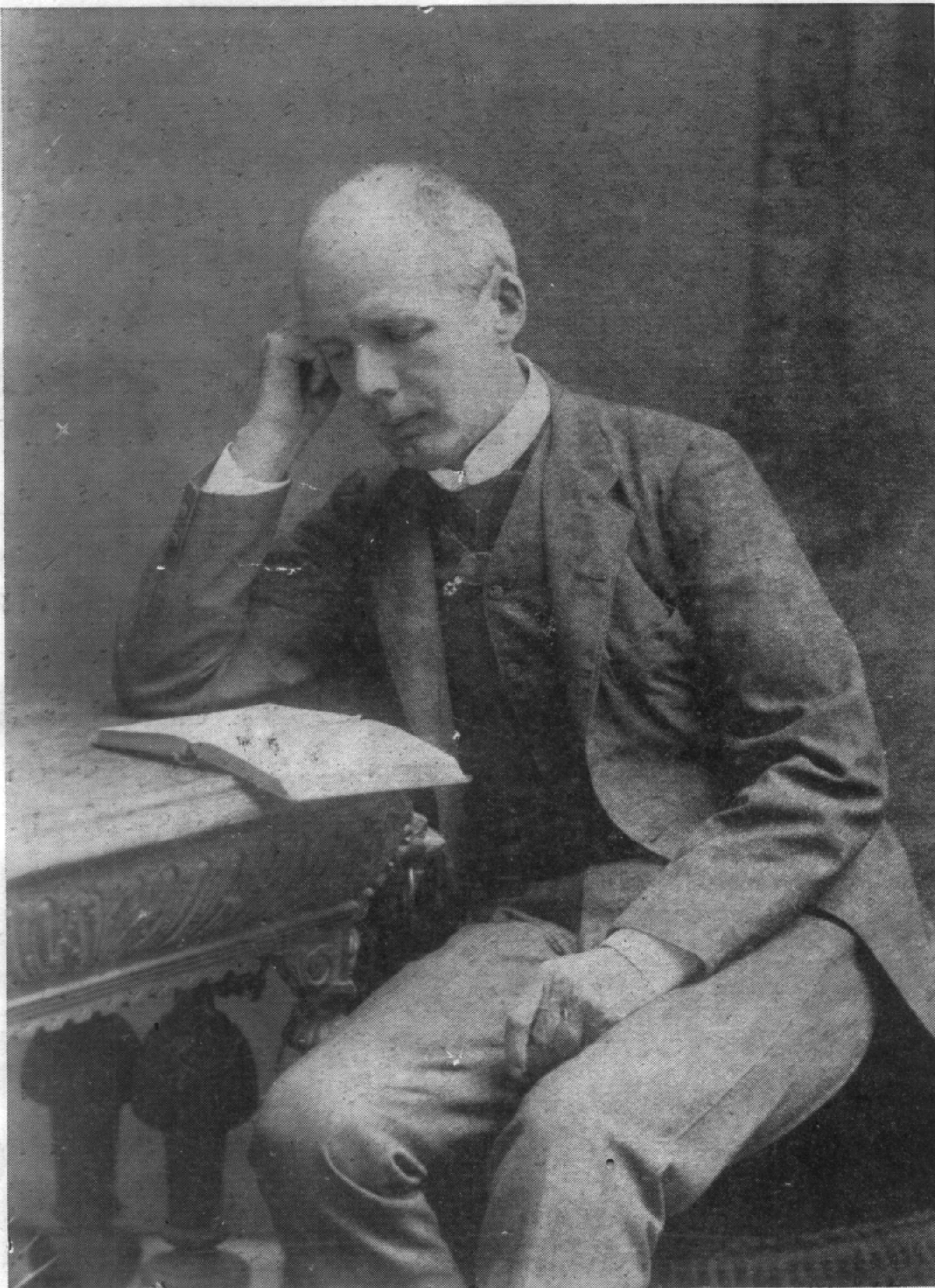
১৫শ ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩১৬। | ৭ম সংখ্যা।

ডাক্তার জর্জ্জ থিব।

কলিকাতার গোলদীঘির পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড গৃহ দৃষ্টিগোচর হয়, উহার নাম "সিনেট হাউস্"। ঐ স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মিলিত হইয়া বঙ্গদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বাঙ্গালীর গৌরবস্থল স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সি, এস্, আই মহোদয় উহার ভাইস্চ্যান্সেলার আর সুবিদ্বান্ ডাঃ জর্জ্জ থিব, সি, আই, ই, উহার রেজিষ্ট্রার। আজ আমরা তোমাদিগকে ডাঃ থিবর জীবনের দুই চারিটি কথা বলিয়া দেখাইব—যদি পৃথিবীতে বড় হইতে চাও, উন্নতি করিতে চাও, তবে চুপ্ করিয়া থাকিলে চলিবে না। খুব খাটিতে হইবে। এ জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, সকলকেই বড় পরিশ্রম করিয়া উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতে হইয়াছে।

জর্ম্মণীর দক্ষিণভাগে হিডেলবার্গ নামক একটি ক্ষুদ্র নগর আছে। এই নগর অতি পুরাতন কাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই হিডেলবার্গ নগরে ডাঃ জর্জ্জ থিবর জন্ম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে জর্জের পিতামহ হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা-কৌশল এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। জর্জের পিতাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপরে ইহার অসংখ্য পুস্তক-রাশির ভার অর্পিত ছিল।

জর্জ বাল্যকালে স্বনগরেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, এবং সতের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতৃ-পিতামহের চরিত্রের প্রভাব এবং বিদ্যার খ্যাতি তাঁহাকে উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া জর্জ শব্দবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। এখানে সম্মুখে জ্ঞানের উন্মুক্ত ভাণ্ডার দেখিয়া জর্জ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য প্রবল উৎসাহ হইল। স্বনগরেই কিছুদিন সংস্কৃত এবং আরবী পড়িয়া উহাই ভাল করিয়া শিখিতে জর্ম্মণীর রাজধানী বার্লিনের জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। জর্ম্মনীদেশে সংস্কৃতভাষার বড় আদর। সংস্কৃতভাষা জর্ম্মণ্ পণ্ডিতগণ কত আদর, যত্ন ও ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন তোমরা শুনিলে বিস্মিত হইবে। বার্লিনে আসিয়া জর্জ্জ আরব ভাষা পরিত্যাগ

করিয়া প্রথিতযশা পণ্ডিত ওয়েবার মহোদয়ের নিকট কেবল সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জর্জ থিব পি এইচ্, ডি (Doctor of Philosophy) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডে বসিয়া এক মহামনা জর্ম্মণ্ পণ্ডিত সংস্কৃতের আলোচনা করিতেছিলেন এবং ইংলণ্ডবাসিগণকে কি অমূল্য রত্নরাজি সংস্কৃত কাব্য, নাটক, পুরাণ, দর্শনে লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। ইনি ইংলণ্ড-প্রবাসী জর্ম্মণ্-পণ্ডিত অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার। ইনি সংস্কৃত ভাষায় এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন যে এদেশে ইঁহাকে লোকে 'ভট্ট' বা ভট্টাচার্য্য বলিত। ইনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভারতের নিকট কি শিখিবার আছে তাহা ইংরাজজাতিকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার ভারত এবং ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।

জর্জ থিব বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পাইয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার শায়নের টীকা সমন্বিত 'ঋগ্‌বেদ সংহিতা' প্রকাশ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই গ্রন্থ ম্যাক্‌স্‌মূলারের জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহাকে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, বহু অর্থব্যয় করিয়া, জীবনপাত করিয়া এই মহাগ্রন্থ সংকলন করিতে হইয়াছিল। ডাঃ জর্জ থিব ইঁহারই প্রণয়নে অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলারের সহকারীরূপে কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। কিন্তু অল্পদিন কার্য্য করিবার পরই জর্জকে স্বদেশে ফিরিতে হইল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী এবং জর্ম্মণ্‌গণ মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। জর্ম্মণী রাজ্যের নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই বিপদ্‌কালে স্বদেশ রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য। জর্জ দেশে ফিরিয়া সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন এবং এক বৎসরকাল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাপন করিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেলে পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় অক্‌স্‌ফোর্ডে অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলারের কার্য্যে ফিরিয়া গেলেন। এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করেন। বিলাতের ভারত-সচিব তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা শ্রবণ করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কাশীর বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ডাঃ জর্জ থিবর সংস্কৃত পড়া সার্থক হইল। তিনি কাশীতে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে নানারূপ চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন এইরূপে কার্য্য করিয়া ডাঃ থিব স্কুলসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টার নিযুক্ত হইলেন। এক বৎসর পরে পুনরায় কাশীতে আসিয়া একেবারে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এখানে অনেকদিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিবার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এলাহাবাদ "মূর সেণ্ট্রাল কলেজের" প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করিলেন। এই পদ হইতেই তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অবসর লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ডাঃ থিব প্রথমে এক বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করেন। তৎপর বৎসর, (১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ জর্জ থিবর বয়স এক্ষণে ৬১ বৎসর হইয়াছে। এখনও তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি অসাধারণ। এখনও তাঁহার প্রতি কার্য্যেই বালকের ন্যায় স্ফূর্ত্তি এবং কর্ম্মক্ষমতা দেখা যায়। বিদ্যোৎসাহী সরলস্বভাব ডাঃ থিব এদেশের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। ইঁহাদেরই মত সহৃদয় বিদেশীর চেষ্টায়, যত্নে এবং আগ্রহে ভারতের উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থসকল বহুল পরিমাণে অনুবাদিত এবং প্রচারিত হইয়াছে।

ডাঃ থিব প্রথমতঃ ভারতীয় দর্শন, গণিত এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার গ্রন্থসকল অধ্যয়নে, সংকলনে এবং প্রচারকল্পে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বহু পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথি ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া থিব মহোদয় "সুল্‌ভ সূত্র" সংগ্রহ করিয়াছেন। কত প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুজাতি জ্যামিতির অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন ইহা পাঠ করিলে বুঝা যাইতে পারে। বিক্রমাদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ

নবরত্নসভার অলঙ্কারস্বরূপ বরাহমিহিরাচার্য্যের "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" জ্যোতির্ব্বিদ্যার এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। উহার লোপ হইয়া যাইতেছিল। থিব মহোদয় কাশীর স্বনামধন্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া ঐ পুস্তকের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তসূত্রের টীকা, রামানুজভাষ্য প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া জগদ্বাসীর সমক্ষে হিন্দুজাতির গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমাদের জন্য যাঁহারা আজীবন এত করিয়া খাটিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের লুপ্তরত্ন উদ্ধার সঙ্কল্পে যাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, যাঁহাদের উৎসাহ, চেষ্টা এবং কার্য্যের ফলে ভারতবর্ষের নাম বিদেশীর নিকট কথঞ্চিৎ গৌরবান্বিত হইয়াছে, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ডাঃ জর্জ থিব তাঁহাদের মধ্যে একজন। ভারতবাসী এই সকল অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষ-দিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক।

আত্মবলি।

শুদ্ধ দেবালয় রুদ্ধ দ্বার
পূজায় মগন পুরোহিত;
সহসা করুণ আর্ত্ত নিনাদে
শিহরি' উঠিল চারিভিত।
কাতর আহ্বানে টলিল চিত্ত
দ্বার খুলি' দীনে লইল টানি,'
করুণ আদরে কঠোর পাপীর
কাড়িয়া লইল হৃদয় খানি।
জিজ্ঞাসেন দ্বিজ, "কি চাও বৎস,
কে তুমি, কেন এ মলিন বেশ?"
কহিল অতিথি, "আশ্রয় মাগি,
নহে ত আমার জীবন শেষ;
হত্যা অপরাধে বন্দী এ পাপী
বধ-ভূমি হ'তে পলায়িত,
সন্ধানে মোর রাজার আজ্ঞায়
ফিরিছে ভীষণ রক্ষী শত।"
শুনিয়া মৌনী পূজক বিপ্র
রুদ্ধ করি দিলা মন্দির দ্বার,
বলিলা "বন্ধু, পর এই সাজ,
কর এ আসন অধিকার।"
বন্দী তুলি' নিল ব্রাহ্মণ বেশ
বন্দীর বেশ দ্বিজবর,
বাহিরে ধ্বনিল শতেক কণ্ঠে
"পলায়িত দোষী, মুক্ত কর।"
বাহিরিল ধীর গম্ভীর পদে
নূতন বন্দী মন্দির হ'তে,
কহিল, "আসিয়াছি গো আমি
যাইব এবার তোদের সাথে।"
উল্লাসে রক্ষী বাঁধিল দৃঢ়
লইয়া চলিল বধ্যস্থানে,
দেব আয়তনে দুইটি নয়ন
চাহিয়া রহিল তাহারি পানে।
"নরঘাতকের হইল দণ্ড"
উঠিল চৌদিকে গভীর রোল,
একটি পরাণ উঠিল কাঁপিয়া
শিহরিল শুনি গণ্ডগোল,
বিস্মিত জন হেরিল প্রভাতে
অভিনব বলি দেবীর স্থানে,
মরম দগ্ধ নবীন সেবক
পূজিয়াছে মায়ে জীবন দানে।

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী।

পৌরাণিক কাহিনী।

রামায়ণ।

(কৌশল্যা)

আমাদের গঙ্গা ও হিমালয় যেমন ভারতের বক্ষ হইতে বাহির হইয়া ইহাকে চিরসিক্ত, ধনধান্যে পূর্ণ, সুন্দর এবং

গম্ভীর ও মহান্ করিয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতও সেইরূপ আমাদের জাতীয় চরিত্রের গভীর স্থান হইতে উৎসের মত বাহির হইয়া আমাদের জাতিকে অপূর্ব্ব আনন্দ ও ভাবে চিরদিন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মাতৃভূমির উপর দিয়া কত বিপ্লব, কত উত্থান পতন, কত পরাজয়, কত লজ্জার কালিমাময় স্রোত বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা মাতার দুগ্ধধারার মত শুভ্র ও পবিত্র এই রামায়ণ ও মহাভারতকে মলিন করিতে পারে নাই। জননীর দুগ্ধপান করিয়া যেমন শিশুর শরীর সুস্থতা, সবলতা ও পুষ্টিলাভ করে, সেইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের ভাবে বংশপরম্পরায় বৰ্দ্ধিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে। ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে, প্রতিদিন সমান শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে এই দুইগ্রন্থ গঠিত হইতেছে; দরিদ্রের গৃহ হইতে রাজার অট্টালিকা পর্য্যন্ত সকল স্থানে উহাদের সমান আদর। মানুষ সাধনাগুণে কতদূর উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে, রামায়ণের কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। গৃহ যে ধর্ম্মসাধনের পবিত্র ক্ষেত্র, গৃহধর্ম্ম পালন যে সমুদয় জীবনব্যাপী কঠিন তপস্যা, রামায়ণ সেই শিক্ষা দিয়াছেন। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পতিপত্নীতে, প্রভুভৃত্যে, রাজায় প্রজায় যে মধুর সম্বন্ধ, তাহা ধর্ম্মের বন্ধনে যুক্ত হইলে কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, ধর্ম্মের প্রভাবে পুত্র কতদূর পিতার আজ্ঞাকারী হইতে পারে, ভাই ভাইএর জন্য কতদূর ত্যাগ করিতে পারে, অনেক তপস্যায় প্রাপ্ত একমাত্র পুত্রকে মাতা কিরূপে সত্যপালন করিতে বনে পাঠাইতে পারেন, পতির নির্দ্দয় আচরণ দেখিয়াও পত্নী তাঁহার উপর কতদূর বিশ্বাস রাখিতে পারেন, ভৃত্য প্রভুর জন্য কি করিতে পারে, প্রজা সন্তুষ্ট হইবে বলিয়া রাজা কতদূর আপনার সুখত্যাগ করিতে পারেন, রামায়ণে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। ত্যাগ ইহার মূলমন্ত্র। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছিলেন "ত্যাগেনৈ-কেনামৃতত্বমানশুঃ। একমাত্র ত্যাগ দ্বারা তাঁহারা অমৃতত্ব পাইয়াছিলেন।" ত্যাগকে যে আপনার জীবনের অলঙ্কার করিয়াছে, তাহার জীবন স্বার্থত্যাগ দ্বারা কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করে, রামায়ণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যে যে আয়োজন লইয়া মানবজীবনের সুখ, উচ্চধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইয়া, তাহা ত্যাগ করিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে সে চক্ষে কি অমৃত লোক দেখা যায়, রামায়ণে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

রামায়ণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল শোকের কথায় পূর্ণ। কৈকেয়ীর মোহে পড়িয়া মহারাজ দশরথ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, শোক ও অনুতাপে প্রাণ দিয়া কেবল তাঁহাকেই যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল, এমন নহে, তাঁহার পুত্রদিগকে ও পুত্রবধূকেও সারাজীবন ধরিয়া সে ব্রত পালন করিতে হইল। তুষানল যেমন বাহিরে দেখা যায় না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা পুড়িতে থাকে, সেইরূপ দশরথের পাপের জন্য রাম সীতা ভরত ও লক্ষ্মণকে চিরদিন নীরবে অনবরত দুঃখে পুড়িতে হইয়াছে এবং পুড়িতে পুড়িতে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত তাঁহাদের চরিত্রের প্রচ্ছন্ন আভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ধর্ম্মপালন করিবার জন্য রাজা কিরূপ অনায়াসে দণ্ড মুকুট ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দরিদ্র বেশ ধরিতে পারেন, রাজভবনের ভোগের সঙ্গে সংযম বাঁধিয়া রাজা কিরূপে ঋষির জীবন যাপন করিতে পারেন এই মহাগ্রন্থে তাহা দেখা যায়।

রামায়ণের যে চরিত্র সর্ব্বপ্রথমে আমাদের চিত্ত মুগ্ধ করে, তাহা দেবী কৌশল্যার। এমন ধর্ম্মপ্রাণা মহৎ-হৃদয়া নারীর আদর্শ জগতে অতি অল্পই দেখা যায়। আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতার উচ্চ চরিত্র তাঁহাতে মিলিত হইয়াছিল। ইনি কোশল-রাজকন্যা এবং ভারতবিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলে উৎপন্ন অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলের মহিষীর গৌরবময় পদ পাইয়া এবং রাজগৃহের অজস্রধন ও বিভবের মধ্যে থাকিয়া তিনি এই উচ্চ চরিত্র লাভ করেন নাই। সংসারের সুখে হতাশ হইয়া পার্থিব সম্পদে বিমুখ হইয়া তিনি এই পরম ধন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দেবী কৌশল্যার জীবনে সুখ ছিল না, কারণ তিনি দশরথের প্রিয় ছিলেন না। দশরথ তাঁহার

কনিষ্ঠা পত্নী কৈকেয়ীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং বিচার না করিয়া তাঁহার সকল কথামতই চলিতেন। এই কারণে প্রধানা মহিষী হইয়াও কৌশল্যা স্বামীর অনাদর ও কৈকেয়ীর প্রভুত্বের মধ্যে অতিশয় অসুখে বাস করিতেন। পীড়িত শিশু যেমন মাতার ক্রোড় ত্যাগ করিতে চাহে না, সংসারের সুখে হতাশ হইয়া দেবী কৌশল্যার ব্যথিত হৃদয় তেমনই দেবতার চরণের আশ্রয় কখনও ত্যাগ করিতে চাহিত না। দুঃখ সুখ সকল অবস্থাতেই তিনি সেই পরম আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং তথায় অন্তরের সকল বেদনা জানাইয়া তিনি সকল সান্ত্বনা ও বল লাভ করিতেন। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন এই সংবাদে যে দিন অযোধ্যা নগরী আনন্দে অধীর হইয়াছিল, সে দিন রামজননী রাজ্ঞী কৌশল্যা কি করিলেন? যিনি চিরদিন অনাদর উপেক্ষা ও লাঞ্ছনায় দিন কাটাইয়াছেন, তিনি এই সৌভাগ্য-সংবাদে উল্লাসে মত্ত হইয়া নগরীর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন না, অথবা রত্ন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শত সহচরী সঙ্গে কৈকেয়ীর মন্দিরে গিয়া সগর্ব্বে জানাইলেন না যে, রাজা তোমার ভরতকে রাজ্য না দিয়া দেখ, আমার রামকেই রাজা করিতেছেন। চিরতপস্বিনী মহিষী তাঁহার জীবনের এই প্রথম সুখের দিনে যে আচরণ করিলেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তিনি ভক্তি ও সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং সংযত দেহ মনের অধিক নিষ্ঠার সহিত দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন; দুঃখী ও অনাথদের কথা আজ তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইল, তিনি তাঁহার ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া মুক্তহস্তে তাহাদের অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা চন্দ্রকিরণের মত ধবল অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়া কৌশল্যার ভবনে দুঃখীর আগমন কোলাহল শুনিয়া মনে মনে ভাবিল "রামমাতা কৌশল্যা ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও আজ কি কারণে দুঃখীদের ধন বিতরণ করিতেছেন?"

পূর্ব্ব রাত্রিতে সংযমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে কৌশল্যা যখন পুত্রের হিতার্থে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মাতৃ-চরণে প্রণাম করিলেন. কৌশল্যা তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "বৎস, তুমি ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ুঃ কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ তোমায় যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন।" তখন রাম মাতাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা অপেক্ষা কঠিন তাঁহার বনগমন সংবাদ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া মহারাণী কৌশল্যা বনে কুঠারছিন্ন শালতরুর ন্যায় অথবা স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। একত্র হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। যুগপৎ হর্ষশোকের আবেগ সংবরণ করা এমনই কঠিন। এই কঠিন আঘাত যে শক্তিতে মহারাণী কৌশল্যা অপরাজিত হৃদয়ে বহন করিলেন তাহা দেবতায় প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আত্মসংযমের দুর্লভ শক্তি; সেই শক্তি দীর্ঘজীবনের তপস্যায় পাইয়া-ছিলেন বলিয়া দেবী কৌশল্যা আমাদের হৃদয়ের অখণ্ড পূজা লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছেন।

বহু তর্ক ও অনুনয় করিয়া যখন পুত্রকে তাহার সত্য-পালন ব্রত হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন দেবী কৌশল্যা শোকের আবেগ চির-অভ্যস্ত সংযমবলে হৃদয়ে রোধ করিয়া এই নূতন ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য যেরূপ প্রস্তুত হইলেন তাহা দেবতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসশালিনী ক্ষত্রিয়মহিষী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি কহিলেন "রাম, তুমি বনগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছ, তোমাকে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্য নহে। তুমি এক্ষণে একাগ্রমনে যাও, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমসুখে নিদ্রা যাইব। এখন প্রস্থান কর, নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়হারী সান্ত্বনা বাক্যে আমায় আনন্দিত করিও।" এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরে কহিলেন "বৎস, তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও। তুমি প্রীতিসহকারে যে ধর্ম্ম প্রতিপালনে

প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। পিতৃ-সেবা মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও।" এই বলিয়া তিনি রামের মস্তকে আশীর্ব্বাদবস্তু প্রদান, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ লেপন ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শুভ বিশল্যকরণী তাঁহার হস্তে বাঁধিয়া দিলেন।

এই মহাপ্রাণা নারী তাঁহার উচ্চ চরিত্রবলে সকলের ভক্তি ও সম্ভ্রম কতদূর আকর্ষণ করিতেন, তাহা মহারাজ দশরথের এই কয়টি কথায় সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। রামকে বনে পাঠাইতে হইবে শুনিয়া মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন "কৌশল্যা দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, ভার্য্যার ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় এবং মাতার ন্যায় আমার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি প্রিয়ভাষিণী ও আমার প্রিয় পুত্রের মাতা; তিনি সর্ব্বাংশে আমার সম্মানের যোগ্যা হইলেও আমি তোমার জন্য তাঁহার সমাদর করি নাই।" দশরথের মুখের এই কয়টি কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কৌশল্যা তাঁহার অনাদৃতা হইয়াও দশরথের হৃদয়ের কতখানি সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইঁহার মত উচ্চচরিত রামায়ণেও অতি বিরল।

ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ।

মুকুলের পাঠক পাঠিকারা কি কেহ কখনও ব্রহ্মদেশে গিয়াছ? ব্রহ্মদেশের বিবরণ অবশ্যই পড়িয়াছ, আর যাহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ ব্রহ্মদেশে দুই চারি মাস বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে সেখানকার গল্পও বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। অনেকে হয় ত ব্রহ্মদেশবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা বইএ পড়িয়াছ। নানাদেশের বিবরণ, দেশবাসীদের আচার ব্যবহার পড়িতে আমার খুব ভাল লাগে। সকলের চেয়ে বেশী ভাল লাগে পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে, যাহারা বাস করে তাহাদের কথা পড়িতে। আমার একজন আত্মীয় ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব সীমার পার্ব্বত্য প্রদেশে (শানরাজ্য-সমূহে) একাধিক বার গিয়াছেন। তাঁহার মুখে সেখানকার গল্প শুনিয়াছি। তাহারই কিছু আজ তোমাদিগকে উপহার দিতেছি।

কোনও কোনও ভূগোলে শানদেশের নামমাত্র উল্লেখ আছে। আবার অনেক বহিতে বা তাহাও নাই। অনেকেই বোধ হয় সে দেশে কেমন করিয়া যাইতে হয় তাহা ত জানই না, সম্ভবতঃ সে দেশটা যে কোথায় তাহাও জান না। তোমরা যদি রেঙ্গুন হইতে মেলট্রেণে চড়িয়া মান্দালয় যাও তাহা তাহা হইলে পর দিবস প্রাতে দেখিতে পাইবে, রাস্তার পূর্ব্বদিকে, প্রায় রাস্তার সমান্তরাল ভাবে, দূরে এক পর্ব্বতশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। ঐ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া শানরাজ্য-সমূহের সীমায় পহুঁছিতে হয়। এই রাজ্যগুলি বহু বিস্তৃত। ইহাদের পশ্চিম সীমা ব্রহ্মদেশ, উত্তরসীমা চীন এবং পূর্ব্ব সীমা চীন ও শ্যামরাজ্য। মোটামুটি শানরাজ্য-সমূহ দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত। "উত্তর শানরাজ্য সমষ্টি" (Northern Shan States) ও "দক্ষিণ শানরাজ্য-সমষ্টি" (Southern Shan States) এই বিভাগ দুইটি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্যে ভাগ করা। এই সব রাজারা প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করেন, সামান্য সামান্য অপরাধের বিচার করেন, আবার তাহাদের উপর সময় সময় অত্যাচারও কম করেন না। খুন ইত্যাদির বিচার গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীরা করিয়া থাকেন। উত্তর শান-রাজ্যগুলিতে যাইবার এখন রেল হইয়াছে, দক্ষিণ রাজ্য-সমূহের জন্যও শীঘ্রই রেল হইবে। তখন যাতায়াতের কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে। আমি যে সময়কার কথা বলিতে যাইতেছি তখন শানরাজ্যে যাইবার রেল ছিল না। বর্ম্মা ষ্টেট্ রেলওয়ের কোনও কোনও ষ্টেশন হইতে পায় হাঁটিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে হইত। জিনিষ পত্র কতক রাস্তা গরুর গাড়ীতে, বাকী রাস্তা ভারবাহী খচ্চর বা বলদের পিঠে করিয়া লইয়া যাইতে হইত। এখনও রেলপথ হইতে দূরে যাইতে হইলে ঐ ব্যবস্থা। দক্ষিণ শান ষ্টেটের পথে থাজি রেল ষ্টেশন হইতে টাউঞ্জি পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীর রাস্তা ও টাউঞ্জি হইতে কেংটুং পর্য্যন্ত গরু ঘোড়ার জন্য বেশ প্রশস্ত রাস্তা রহিয়াছে। থাজি হইতে টাউঞ্জি ১০৫ মাইল আর টাউঞ্জি হইতে কেংটুং প্রায় ২৮০ মাইল।

সাধারণতঃ লোকেরা ২৫।৩০ দিনে কেংটুং যায়। রাস্তায় ১০।১৫ মাইল অন্তর সরকারী বিশ্রাম ঘর আছে, সেখানে রাত্রি বাস করিতে হয়। বড় রাস্তা ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলে সে দেশের গ্রাম্য রাস্তাই সম্বল। দুর্গম রাস্তা! এক একবার পাহাড় চড়িতে হয় আবার পরক্ষণেই যতটা চড়িয়াছিলে প্রায় ততটা নামিতে হয়, আবার চড়িতে হয়। তার উপর ঘোর জঙ্গল, অনেক যায়গায়ই রাস্তা এমন অল্প পরিসর যে,দুই পাশের জঙ্গল না কাটাইলে আর ঘোড়া গরুর যাইবার উপায় নাই। সব সময় রাত্রিবাসের জন্য সুবিধামত গ্রামও মিলে না, অনেক যায়গায় হয় ত লোকের বসতিই নাই। ৩০।৪০ মাইলপথ চলিলে তবে লোকালয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সব রাস্তাই ভয়বিপদ্‌সঙ্কুল। গভর্ণমেণ্টের শাসনগুণে ডাকাতের ভয় আর নাই, কিন্তু বাঘ ভালুকের প্রতাপ এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। সমস্ত দিনই পথ চলিতে হয়, কেননা পার্ব্বত্য পথে ১০।১৫ মাইল চলিতেই প্রায় সমস্ত দিন লাগে। রাত্রে তাঁবুতে শুইতে হয়। বন্যজন্তুর ভয়ে রাত্রে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতেও মাঝে মাঝে তাহাদের হাত এড়ান যায় না। সমস্ত দিন পথ চলিয়া, ভার বহিয়া, লোকজন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, রাত্রে আবার কে পাহারা দিবে? তাহাতে আবার ভোরে ৩৷০টা ৪টায় পথ চলিতে হইবে।

শানরাজ্য-সমূহে নানা জাতি লোকের বাস। সমভূমিতে সাধারণতঃ খাস শানেরা বাস করে। পাহাড় পর্ব্বতে খে, মুসো, লিস, ক, কুই প্রভৃতি অনেক জাতির বাস। তাহাদের এক এক জাতির ভাষা ভিন্ন, আচার ব্যবহার ভিন্ন, এমন কি কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত ভিন্ন। ঘর বাড়ী কিন্তু প্রায় সকলেরই এক রকম। মাটীতে খোঁটা পুতিয়া ৪।৫ ফুট উঁচু মাচা তৈয়ার করে, এটা তাহাদের ঘরের মেজে। ইহার উপর বাঁশ খড়ের ঘর। ১৫।২০ কখনও বা ৩০।৪০।৫০ ফুট লম্বা ঘরও হয়। তাহারই মধ্যে তাহাদের রান্না, তাহারই মধ্যে রাত্রে সকলে ঘুমায়। মাচার নীচে গরু, শূকর মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু থাকে। ঘরটির একটি মাত্র দরজা, জানালা নাই। শীতের দিনে প্রায় সমস্ত রাত্রই ঘরের ভিতর কিছু আগুন জ্বালাইয়া রাখে। তাহাতে ঘরের ভিতরটা বেশ গরম থাকে। নতুবা শানষ্টেটের শীতে পাহাড়ের উপর তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। তাহাদের ত আর আমাদের মত লেপ কম্বল নাই, যে গায় দিবে। একখানি করিয়া মোটা সূতার চাদর মাত্র তাহাদের সম্বল। নিজেদের আবশ্যকীয় কাপড় চোপড় সমস্তই তাহারা ঘরে নিজেরা বুনিয়া লয়। তুলাও তাহাদের নিজেদের পরিশ্রমের ফল। সে কাপড় আমি দেখিয়াছি। তাহার রং খুব পাকা আর খুব মজবুত। বলিতে গেলে সে দেশের পাহাড়ী লোকেরা লবণ ও সামান্য এক আধখানা বাসন পত্র ছাড়া কোনও জিনিষই কিনে না।

স্ত্রী পুরুষ জমিতে এক সঙ্গে কাজ করে। পাহাড়ের গায় জঙ্গল কাটিয়া জমি তৈয়ার করে। তাহাদের জমি তৈয়ার করিবার প্রণালী বড় মজার! পুরুষেরা জঙ্গল কাটিয়া, শুকাইয়া তাহা আগুনে পোড়াইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া ছাই কয়লা পরিষ্কার করিবে, তাহার পর স্ত্রীলোকেরা খুন্তি দিয়া খুঁড়িয়া ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া ৩।৪টি করিয়া ধান তাহাতে ফেলিয়া দিবে; ঐ সঙ্গে কুমড়া, সিম আর কচুও লাগাইবে। দুই চারিটা করিয়া লঙ্কার বীচিও ঐ সঙ্গে দিবে। অনেক যায়গায় ঐ জমিতেই পরে তুলার চাষও করিয়া থাকে। এই তো তাহাদের চাষ হইল। ক্ষেতের মাঝখানে মাচার উপর ছোট একটি ঘর করিয়া রাত্রে পুরুষেরা তাহাতে বসিয়া শস্য পাহারা দেয়। নহিলে বন্য হরিণ ও শূকরে সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যেখানে বাঘের ভয় আছে সেখানে মাচাটা বেশ উঁচু করিয়া তৈয়ার করে। এই রকম এক একটা জমিতে তিন বারের বেশী বোনে না।

শানরাজ্য-সমূহে সকলেই অস্ত্রধারী। হাতিয়ার ছাড়া তাহারা পথ চলে না। হাতিয়ারের মধ্যে ২।২৷৷০ হাত লম্বা তলোয়ার আর সেকালের পলিতাওয়ালা বন্দুক। ইহারই সাহায্যে তাহারা এমন শিকার করে যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে কার্ত্তুসদার বন্দুক লইয়াও সে রকম পারিবে কি না সন্দেহ। শানেরা—(শান বলিতে শুধু খাস শান নয়, ঐ রাজ্যসমূহের অধিবাসীমাত্রই ধরিতেছি,

খুব কর্ম্মঠ ও মজবুত। নিম্নব্রহ্মের অধিবাসীর ন্যায় আরাম-প্রিয় নয়। আমরা বাঙ্গালীরাই কি আরামপ্রিয় কম? পার্ব্বত্য জাতিরা, বিশেষতঃ ক, কুই, মুসো প্রভৃতি জাতির লোকেরা শিকার করিতে বড় ভালবাসে। হরিণ, বাঘ, শূকর, বন্যগরু (যাহাকে গবয় বলে) প্রভৃতি শিকার করে। তবে ভালুকের কাছে সহজে ঘেঁসিতে চায় না। আর সে দেশে ভালুকে কামড়াইয়াছে, এমন লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। হাতী মারা আইন বিরুদ্ধ।

সে দেশে জাতিবিচার নাই। 'এর হাতে ও খায় না' বা 'ওর হাতে এ খায় না' শুনিলে তাহারা একটু আশ্চর্য্য হয়। সাধারণতঃ দুটি ভাত, একটু নুন ও শুক্‌না লঙ্কার গুঁড়া তাহাদের আহার। মাছ মাংস সবই তাহারা খায়। পচা ও শুক্‌না মাছ তাহাদের বিশেষ প্রিয়। বাঘের শিকার, ৪।৫ দিনের পচা, তাহাও খাইতে ছাড়ে না। পার্ব্বত্য জাতিরা প্রায় সব জন্তুই খায়। বাঘ ভালুক কোনটাই তাহাদের বাদ যায় না। শুনিয়াছি কুইরা কুকুরও খায়। আমাদের দেশের কুকীরাও কুকুর খায়। খাস শানেরাও কোনও কোনও যায়গায় বাঘ খায়। আমার আত্মীয়টি একবার শুনিতে পাইলেন যে কাছে, ১০।১২ মাইল দূরে, একটা গ্রামে প্রকাণ্ড একটা বাঘ মারিয়াছে। খুব ভোরে উঠিয়া তাঁহার সঙ্গের দোভাষীকে চামড়াটার জন্য পাঠাইলেন। দোভাষী সেই গ্রামের সর্দ্দারও টুকরা টুকরা চামড়া লইয়া ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহারা বাঘটাকে কাটিয়া গ্রাম শুদ্ধ লোকে ভাগ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, চামড়ার টুকরাগুলি চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়াছে। আগে যদি জানিতে পারিত যে, চামড়াটা দাম দিয়া কেহ কিনিবে তাহা হইলে চামড়াটা আর টুকরা টুকরা করিত না। ঐ বাঘটাকে একটি ১২ বছরের ছেলে মারিয়াছিল। বেলা ৩।৩টা ৪টার সময়, গ্রামে যখন বড়রা কেহই ছিল না, ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছিল, তখন বাঘ আসিয়া একটা ঘরের মাচার নীচে শূকর ধরিয়াছিল। সেই ঘরে ঐ ছেলেটি ছিল, আর ছিল তাহার বাবার গুলিভরা বন্দুকটি। সে ত আর আমাদের বাঙ্গালীর ছেলে নয় যে, চেঁচাইয়া দেশের লোক জড় করিতে যাইবে। আস্তে আস্তে বাবার বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া এক গুলিতেই চিরকালের জন্য বাঘের খাওয়ার সাধ মিটাইয়া দিল।

সে দেশে যেমন নানা জাতির নানা ভাষা তেমনি তাহাদের ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন। খাস শানেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদের পুরোহিত আছে। বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে বর্ম্মাবাসীরা "ফুঙ্গি" বলে, আর শানেরা "চংমুন" বলে। প্রত্যেক গ্রামের পাশেই একটি করিয়া পুরোহিতদের থাকিবার ঘর আছে, তাহাকে শানেরা বলে "চং"। ঐখানে তাহাদের একটি করিয়া অতিথিশালাও থাকে, আর ঐ খানেই শান-ছেলেরা লেখাপড়া শিখে। ফুঙ্গিরা চিরকুমার। তাহারা বেশী বাক্যালাপ করে না, জীবহিংসাও করে না। দিনের বেলা শুধু খায়, রাত্রে অনেকেই কিছু খায় না, একটু চা পান করে মাত্র। ফুঙ্গিরা আগে টাকা পয়সা স্পর্শ করিত না, এখন শুনিয়াছি টাকা পয়সা দিলে নেয়, তবে নিজের হাতে ধরে না। তাহাদের ছাত্রদের হাত দিয়ে নেয়। প্রাতঃকালে শান-মেয়েরা যাহার ঘরে যাহা রান্না হইয়াছে তাহার কিছু কিছু লইয়া গিয়া ফুঙ্গিকে দিয়া আসিবে। তাহাই ফুঙ্গিরা খায়। তাহাদের ছাত্রেরা ত খায়ই, আর অতিথি অভ্যাগত কেহ থাকিলে তাহারাও খায়। পার্ব্বত্য জাতিরা সকলেই জড় ও প্রেতোপাসক। গাছ পালা, পাথর ইত্যাদির সম্মুখে পূজা দেয়। কোনও কোনও স্থানে দুই এক ঘর খৃষ্টানও দেখা যায়। কোনও কোনও যায়গায় মিসনারিরা স্কুল খুলিয়াছেন। সমস্ত গ্রামের মধ্যে ঐ ফুঙ্গির আশ্রমটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঝরঝরে। অন্যত্র নাকে কাপড় না দিয়া যাওয়া দুষ্কর। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরমা রায়।

দুই রাজপুত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এদিকে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত ত কেটে গেল। ভোর বেলা এক ধোপা গাধার পিঠে কাপড় নিয়ে নদীর ধারে যাচ্ছে। পথের পাশে ঝোপ। ঝোপের সাম্‌নে আস্‌তেই ধোপাটা শুন্‌তে পেলে কে যেন কাতরাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখে একটি ছেলে, দেখ্‌তে যেন রাজপুত্র। রক্তারক্তি হয়ে পড়ে আছে! তার আর কাপড় কাচ্‌তে যাওয়া হ'ল না। গাধার পিঠে বসন্তকে চড়িয়ে সে বাড়ী ফিরে গেল।

তার পর, বন থেকে বিশল্যকরণী খুঁজে আন্‌লে। তারই রস কাটার মুখে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাটাগুলো জোড়া লেগে গেলো রাজপুত্র বেঁচে উঠ্‌লেন!

(৭)

বসন্ত ধোপার ঘরে রইলেন। ধোপানীর ছেলেপুলে ছিল না। সে আপনার পেটের ছেলের মত যত্নে তাঁকে নিজের ঘরে রেখে দিলে।

একদিন হ'ল কি, বসন্ত পথে বেরিয়েছেন মন্ত্রীও রাজা দেখ্‌তে বেরিয়েছেন। হঠাৎ তু'জনে দেখা! বসন্তকে দেখ্‌বামাত্রই মন্ত্রী চিন্তে পার্‌লেন। সর্ব্বনাশ! লোকটা এখনো বেঁচে! কোন্ দিন ত সব ফাঁস হয়ে যাবে! রাজা শুন্‌লে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, আমার গর্দ্দান্ নেবে! এখন কি করি? এই সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মন্ত্রী বাড়ী ফিরে গেল।

সেই সময় এক সদাগর সেই দেশে সওদা করতে এসেছিল। হঠাৎ তার নৌকা চড়ায় আট্‌কে গেল; নড়ে না চড়ে না। এক দৈবজ্ঞ গুণে বল্লে, "মানুষের রক্ত চাই। নইলে নৌকা চল্‌বে না।" সদাগর মন্ত্রীর কাছে কেঁদে এসে পড়্‌লো। বল্লে "মন্ত্রীমশায়! রক্ষা করুন, নইলে ধনে প্রাণে মারা যাই।"

মন্ত্রী ভাব্‌লে, এই ঠিক্ হয়েছে! তখনই হুকুম গেল। মন্ত্রীর লোক এসে বসন্তকে বেঁধে নিয়ে একেবারে মহাজনের নৌকায় হাজির কর্‌লে। ধোপানী পড়ে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো!

বসন্ত মহাজনের কাছে গিয়ে বল্লেন, "ওগো! তোমরা আমাকে প্রাণে মেরো না। রক্ত পেলেই যদি নৌকা চলে; আমি রক্ত দিচ্ছি!" এই বলে খাপ্ থেকে তরোয়াল খুলে বুকের খানিকটা ফ্যাঁস্ করে চিরে ফেল্লেন। যেমন ফোঁটা তুই রক্ত পড়া, অমনি হুস্ করে নৌকাটা ভেসে উঠ্‌লো!

নৌকা চল্লো। সদাগর দেখ্‌লে এমন একটা লোক নৌকায় থাকা ভালো, আবার যদি কখনও আট্‌কায় তা হ'লে আর মুস্কিলে পড়্‌তে হবে না। সে বসন্তকে ছেড়ে দিতে চাইলে না। বসন্ত ভাব্‌লেন এদেশে থাক্‌লে তাঁরও মহাবিপদ্। মন্ত্রী কোন না কোনো ছলে তাঁর প্রাণবধ করবে। মহাজনের সঙ্গে যাওয়াই ভালো। এই ভেবে তিনি আর নৌকা থেকে নাব্‌লেন না। সদাগরের সঙ্গে চল্লেন।

কিছুদিন পরে বসন্তকে নিয়ে নৌকা আর এক রাজার দেশে এসে ভিড়্‌লো।

(৮)

সেই দেশে, মহাজন ব্যবসা করতে সহরে যেতো বসন্ত নৌকায় থাকতেন। যেখানে নৌকা ভিড়েছিল ঠিক্ তারই সাম্‌নে রাজবাড়ী।

যেদিন প্রথম নৌকা এল, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা রাজকন্যা সখীদের নিয়ে রাজবাড়ীর ছাতে উঠে বেড়াচ্ছেন। বসন্ত নৌকার ছাতে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন। এ কোথা থেকে বাঁশীর শব্দ আসে? রাজকুমারী চেয়ে দেখেন, বসন্ত! দেখ্‌তে যেন কার্ত্তিকটির মত! নৌকার ছাতে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন।

বসন্ত বাঁশী রোজই বাজান। রাজকন্যা রোজই ছাতের উপর দাঁড়িয়ে শোনেন। রাজকুমারী সখীদের ডেকে বল্‌লেন, "একবার খবর নিয়ে এস ত, বাঁশী বাজায় ও কে?"

সখীরা বল্লে, "কেউ না; বুঝি নৌকার মাল্লা হবে।"

রাজকন্যা বল্লেন, "না; জেনে এস গে কোন্ দেশ থেকে এসেছে, কে এসেছে।"

এক জন সখী খবর নিয়ে এল। বল্লে, "রাজার ছেলে, সৎমা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

শুনে রাজকন্যার কোমল প্রাণে ব্যথা লাগ্‌লো। বল্লেন, "আমি ঐ রাজপুত্রের গলায় মালা দেব।"

(৯)

তু'জনে মালা বদল করে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর বসন্ত বল্লেন,—"আমি তবে চল্লুম।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখে একটি ছেলে, দেখ্‌তে যেন রাজপুত্র। রক্তারক্তি হয়ে পড়ে আছে! তার আর কাপড় কাচ্‌তে যাওয়া হ'ল না। গাধার পিঠে বসন্তকে চড়িয়ে সে বাড়ী ফিরে গেল।

তার পর, বন থেকে বিশল্যকরণী খুঁজে আন্‌লে। তারই রস কাটার মুখে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাটাগুলো জোড়া লেগে গেলো রাজপুত্র বেঁচে উঠ্‌লেন!

(৭)

বসন্ত ধোপার ঘরে রইলেন। ধোপানীর ছেলেপুলে ছিল না। সে আপনার পেটের ছেলের মত যত্নে তাঁকে নিজের ঘরে রেখে দিলে।

একদিন হ'ল কি, বসন্ত পথে বেরিয়েছেন মন্ত্রীও রাজ্য দেখ্‌তে বেরিয়েছেন। হঠাৎ হু'জনে দেখা! বসন্তকে দেখ্‌বামাত্রই মন্ত্রী চিন্তে পার্‌লেন। সর্ব্বনাশ! লোকটা এখনো বেঁচে! কোন্ দিন ত সব ফাঁস হয়ে যাবে! রাজা শুন্‌লে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, আমার গর্দ্দান্ নেবে! এখন কি করি? এই সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মন্ত্রী বাড়ী ফিরে গেল।

সেই সময় এক সদাগর সেই দেশে সওদা করতে এসেছিল। হঠাৎ তার নৌকা চড়ায় আট্‌কে গেল; নড়ে না চড়ে না। এক দৈবজ্ঞ গুণে বল্লে, "মানুষের রক্ত চাই। নইলে নৌকা চল্‌বে না।" সদাগর মন্ত্রীর কাছে কেঁদে এসে পড়্‌লো। বল্লে "মন্ত্রীমশায়! রক্ষা করুন, নইলে ধনে প্রাণে মারা যাই।"

মন্ত্রী ভাব্‌লে, এই ঠিক্ হয়েছে! তখনই হুকুম গেল। মন্ত্রীর লোক এসে বসন্তকে বেঁধে নিয়ে একেবারে মহাজনের নৌকায় হাজির কর্‌লে। ধোপানী পড়ে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো!

বসন্ত মহাজনের কাছে গিয়ে বল্লেন, "ওগো! তোমরা আমাকে প্রাণে মেরো না। রক্ত পেলেই যদি নৌকা চলে; আমি রক্ত দিচ্ছি!" এই বলে খাপ্ থেকে তরোয়াল খুলে বুকের খানিকটা ফ্যাঁস্ করে চিরে ফেল্লেন। যেমন ফোঁটা দুই রক্ত পড়া, অমনি হুস্ করে নৌকাটা ভেসে উঠ্‌লো!

নৌকা চল্লো। সদাগর দেখ্‌লে এমন একটা লোক নৌকায় থাকা ভালো, আবার যদি কখনও আট্‌কায় তা হ'লে আর মুস্কিলে পড়্‌তে হবে না। সে বসন্তকে ছেড়ে দিতে চাইলে না। বসন্ত ভাব্‌লেন এদেশে থাক্‌লে তাঁরও মহাবিপদ্। মন্ত্রী কোন না কোনো ছলে তাঁর প্রাণবধ কর্‌বে। মহাজনের সঙ্গে যাওয়াই ভালো। এই ভেবে তিনি আর নৌকা থেকে নাব্‌লেন না। সদাগরের সঙ্গে চল্লেন।

কিছুদিন পরে বসন্তকে নিয়ে নৌকা আর এক রাজার দেশে এসে ভিড়্‌লো।

(৮)

সেই দেশে, মহাজন ব্যবসা করতে সহরে যেতো বসন্ত নৌকায় থাক্‌তেন। যেখানে নৌকা ভিড়েছিল ঠিক্ তারই সাম্‌নে রাজবাড়ী।

যেদিন প্রথম নৌকা এল, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা রাজকন্যা সখীদের নিয়ে রাজবাড়ীর ছাতে উঠে বেড়াচ্ছেন। বসন্ত নৌকার ছাতে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন। এ কোথা থেকে বাঁশীর শব্দ আসে? রাজকুমারী চেয়ে দেখেন, বসন্ত! দেখ্‌তে যেন কার্ত্তিকটির মত! নৌকার ছাতে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন।

বসন্ত বাঁশী রোজই বাজান। রাজকন্যা রোজই ছাতের উপর দাঁড়িয়ে শোনেন। রাজকুমারী সখীদের ডেকে বল্লেন, "একবার খবর নিয়ে এস ত, বাঁশী বাজায় ও কে?"

সখীরা বল্লে, "কেউ না; বুঝি নৌকার মাল্লা হবে।"

রাজকন্যা বল্লেন, "না; জেনে এস গে কোন্ দেশ থেকে এসেছে, কে এসেছে।"

এক জন সখী খবর নিয়ে এল। বল্লে, "রাজার ছেলে, সৎমা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

শুনে রাজকন্যার কোমল প্রাণে ব্যথা লাগ্‌লো। বল্লেন, "আমি ঐ রাজপুত্রের গলায় মালা দেব।"

(৯)

দু'জনে মালা বদল করে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর বসন্ত বল্লেন,—"আমি তবে চল্লুম।"

রাজকন্যা বল্লেন,—"সে কি কথা! কোথায় যাবে?"

বসন্ত বল্লেন,—"আমি আমার দাদাকে সন্ধান কর্‌তে যাব।"

রাজকন্যা বল্লেন, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

দু'জনে নৌকা সাজিয়ে যাত্রা করে বেরলেন। ধনরত্ন মণিমাণিকে নৌকা ভরে উঠ্‌লো।

মাঝি মনে মনে ভাব্‌লে রাজপুত্রটাকে মেরে ফেলি; তা হ'লে এই ধনরত্ন ত সব আমারই হবে!

একদিন নীশুথ রাত্রি। রাজপুত্র ঘুমুচ্ছেন, রাজকন্যাও ঘুমে অচেতন। কারো সাড়াশব্দ নাই। মাঝি আর মাল্লা দু'জনে মিলে রাজপুত্রকে ঝপ্‌ করে জলের মধ্যে ফেলে দিলে। রাজকন্যা কপাল চাপ্‌ড়ে হায় হায় করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

নৌকা চল্‌তে চল্‌তে রূপ রাজার দেশের ঘাটে এসে লাগ্‌লো। রাজার কাণে গেল, কোন্ দেশ থেকে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে এসেছ, ঘাট আলো করে রয়েছে।

শুনে রাজা লক্ষ সোণার মোহর দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে এলেন। রূপ দেখে ত মোহিত! বল্লেন, "এই কন্যাকে আমি আমার রাণী কর্‌বো।"

রাজকন্যা সে কথা শুনে বল্লেন, "মহারাজ! তিন মাস আমাকে সময় দিন, আমার একটা ব্রত আছে সেইটে শেষ না হ'লে আমি বিয়ে করতে পার্‌বো না।"

রাজা বল্লেন, "আচ্ছা, তিন মাস সময় দিলুম।"

রাজকুমারী বল্লেন "আর একটা কথা আছে। এই তিন মাস আমি যা কর্‌তে চাইবো তাতে যেন কেউ না বাধা দেয়।"

রাজা বল্লেন, "আচ্ছা।"

(১০)

এদিকে বসন্ত ভাস্‌তে ভাস্‌তে কূলে এসে উঠ্‌লো। সেইখানে জনকতক চাষা মাটিতে লাঙ্গল দিচ্ছিল। তারা বসন্তকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল।

বসন্ত চাষাদের ঘরে চাষার মত হয়ে রইলেন। তাদের সঙ্গে রোজ সকালে ক্ষেতে কাজ কর্‌তে যেতেন, সন্ধ্যাবেলা কুঁড়েতে ফিরে আস্‌তেন। রাজকুমারের ননীর হাত শক্ত লাঙ্গলে ব্যাথা পেতে লাগ্‌লো, সোণার অঙ্গ ধূলোয় কাদায় ভরে উঠ্‌লো। চাঁদবরণ রোদের তাপে কালি হয়ে গেল! রাজকুমার কাজ করতেন, আর ভাব্‌তেন, এতও অদৃষ্টে ছিল! আরো কপালে কি আছে কে জানে!

এক দিন চাষারা বসন্তকে বল্লে, "দেখ, আমাদের ক্ষেতে অনেক শস্য হয়েছে। যাও, আজ হাটে বিকিয়ে এস।"

বসন্ত মনে মনে ভাব্‌লেন, চট্‌ করে যেখানে সেখানে বেরোনো হচ্ছে না আগে খবরটা নেওয়া ভালো এটা কোন্ রাজার দেশ। বসন্ত যখন শুন্‌লেন যে, সেটা রূপ-রাজারই দেশ, তখন তিনি মনে ভাব্‌লেন, সেই কোটালটা যদি টের পায় আমি এ দেশে আছি, তা হ'লে ত আমাকে একেবারে দু'টুক্‌রো করে ফেল্‌বে।

তিনি চাষাদের ডেকে বল্লেন,—"দেখ, এই দেশের মধ্যেই আমার এক শত্রু আছে, সে আমাকে দু দু'বার প্রাণে মার্‌বার চেষ্টা করেছিল। আবার যদি আমাকে ধরে, তা হ'লে আর রক্ষা রাখ্‌বে না। তবে এক কাজ কর। আমাকে মেয়ে সাজিয়ে দাও, তা হ'লে আমাকে আর কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না।"

চাষারা তাই কর্‌লে। রাজকুমারকে মেয়ের বেশে সাজিয়ে এক চাষার বুড়ী মাকে সঙ্গে দিয়ে শস্য বেচ্‌তে পাঠালে।

(১১)

এদিকে রাজকুমারী দেশে বিদেশে ঢ্যাঁড়া দিয়েছিলেন, "যদি কেউ নৌকা থেকে জলে পড়ে গিয়ে থাকো ত রূপ রাজার সভায় এসে তার গল্প বল অনেক টাকা বক্‌সিস্‌ পাবে।" বসন্ত শস্য বেচ্‌তে যেতে যেতে পথে এই ঢ্যাঁড়া শুন্‌তে পেলেন। তিনি ভাব্‌লেন এ কি ব্যাপার! আমিই ত নৌকা থেকে পড়েছি আমারই সন্ধান হচ্ছে না কি! তিনি যে বুড়ীর সঙ্গে যাচ্ছিলেন তাকে বল্লেন, "তুমি আমার নাম করে বলো যে, আমি রাজসভায় গিয়ে গল্প বোল্‌বো।" যারা ঢ্যাঁড়া দিচ্ছিল বুড়ী তাদের ডেকে, বল্লে, "ওগো! তোমরা আমার এই মেয়েকে নিয়ে যাও, এ তোমাদের গল্প বল্‌বে।"

বসন্ত মেয়ের বেশে রাজসভায় এসে উপস্থিত হ'লেন। দেখ্‌লেন সেখানে কেবল একলা রাজকুমারী বসে আছেন। দেখে তাঁর খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু নিজেকে তখন প্রকাশ কর্‌লেন না। পাছে মুখ দেখে চিন্তে পারেন তাই ঘোমটাটা একটু বেশি করে টেনে দিলেন।

রাজকুমারী বল্লেন, "তোমার গল্প বল।"

বসন্ত তখন গল্প আরম্ভ কর্‌লেন, "দুই রাজপুত্র ছিল। তাদের এক সৎমা ছিল—"। এমনি করে নিজেদের কাহিনী গোড়া থেকে আরম্ভ কর্‌লেন। বল্‌তে বল্‌তে যেখানটায় বনের মধ্যে দু'ভায়ের ছাড়াছাড়ি, সেইখানটা এসে থাম্‌লেন। বল্লেন, "আজ বেলা হয়েছে; আজ আর নয়, কাল এসে বোল্‌বো।"

রাজকুমারী বক্‌সিস্ দিয়ে বসন্তকে বিদায় কর্‌লেন। গল্পটা তাঁর বড়ই ভালো লাগ্‌ছিল। শেষটা শোন্‌বার জন্য তাঁর ভারী ইচ্ছা হ'ল। তাই তিনি বল্লেন, "কাল একটু সকাল সকাল এসো; শেষটা শুন্‌তে হবে।"

বসন্ত সে দিনের মত বিদায় হ'লেন।

তার পর দিন আবার এসে গল্প আরম্ভ কর্‌লেন। বল্‌তে লাগ্‌লেন, রাজকুমারীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে নৌকা সাজিয়ে দু'জনে ত যাত্রা করে বেরলেন। যেখানটাতে মাল্লারা রাজপুত্রকে জ'ল ফেলে দিলে গল্পটা যখন সেই জায়গায় এল তখন রাজকুমারী আর থাক্‌তে পার্‌লেন না কেঁদে উঠ্‌লেন। দাসীরা সকলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "কি হ'ল? কি হ'ল?" রাজকুমারী আঁচলে চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লেন।

বসন্ত চুপ করে রইলেন। আর কিছু বল্‌ছেন না দেখে রাজকুমারী বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। বল্লেন, "বল, বল রাজপুত্রের কি হ'ল? কোথায় তিনি গেলেন?"

বসন্ত বল্লেন, "আর জানি না।"

রাজকুমারী তাই শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে পড়্‌লেন।

বসন্ত তখন কর্‌লেন কি, ঘোমটা খুলে রাজকন্যার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন! তাঁকে দেখেই রাজকন্যা আনন্দে মূর্চ্ছা গেলেন। চারিদিকে 'কি হ'ল! কি হল!' শব্দ উঠ্‌লো। রাজার কাণে সে শব্দ গেল। তিনি ছুটে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে মন্ত্রী এলেন, কোটাল এলেন, রাজবৈদ্য এলেন, সভাসদ্ অমাত্য সবাই এলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সভাঘর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। বসন্ত [illegible] আবার ঘোমটা টেনে এক কোণে জড়সড় হয়ে বস্‌লেন।

রাজকুমারীর জ্ঞান হ'লে রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি হয়েছে?"

রাজকুমারী জোড়হাত করে বল্লেন, "মহারাজ! মাপ করুন। আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছি। আমার বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামীকে পেয়েছি।"

রাজা বল্লেন, "কি রকম?"

রাজকুমারী বসন্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে [illegible], "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

রাজার কথায় বসন্ত আবার গল্প বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। রূপ শুনে অবাক্ হ'তে লাগ্‌লেন। এ যে তাঁদেরই কথা! প্রাণের ভাই বসন্তকে তিনি এত দিন ভুলে ছিলেন, আজ হঠাৎ গল্প শুনে তাঁকে মনে পড়্‌লো। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন। তাঁর দু'চোখ ভরে জল এল।

বসন্ত গল্প বল্‌তে বল্‌তে বনের মধ্যে দু'ভায়ের যেখানে ছাড়াছাড়ি সেইখানটা বল্লেন। শুনে রাজা চোখের জল আর রাখ্‌তে পার্‌লেন না।

তার পর, সেই বাঘ মারার কথা! বসন্ত একটু জিরিয়ে নিয়ে সেই বাঘ মারার কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। একটু বলেই রাজার সাম্‌নে ছুটে এসে ঘোমটা খুলে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "দাদা! আমিই বাঘ মেরেছিলুম!"

হঠাৎ বসন্তকে দেখে রাজা চম্‌কে উঠ্‌লেন। সভার লোকেরাও চম্‌কে উঠ্‌ল। সেই কোটাল যে মন্ত্রী হয়েছিল, সে বিপদ্ দেখে পালাবার মত্‌লবে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। রাজা তাই দেখে সিপাইকে ডেকে বল্লেন, "মন্ত্রীকে বাঁধ!"

তার পর রূপ, বসন্তকে নিজের পাশে সিংহাসনে বসিয়ে বল্লেন, "আজ আমার প্রাণের ভাই হারানো ধন বসন্তকে পেয়েছি। আজ সবাই ঘরে ঘরে পথে পথে

বাতি জালাও! রাজ্য জুড়ে বাজনা বাজাও!—আনন্দ-গান কর!”

তার পর জল্লাদকে ডেকে বলেন, “জল্লাদ! এই মিথ্যাবাদী কোটালের গর্দ্দান্ নাও।”

বসন্ত তাই শুনে বল্লেন, “দাদা! হতভাগাকে ক্ষমা কর!”

রাজা বল্লেন, “আচ্ছা, তবে ওর নির্ব্বাসন!”

(১২)

বসন্ত মন্ত্রী হ'লেন। যে ধোপা তাঁকে বাঁচিয়েছিল, যে চাষারা তাঁকে নিজেদের ঘরে রেখেছিল, তাদের কথা ভুল্লেন না; তাদের ডাকিয়ে অনেক টাকাকড়ি ধন দৌলত, বাড়ীঘর, দাসদাসী দিলেন।

বসন্ত মন্ত্রীগিরি কর্‌তে লাগ্‌লেন। রাজ্যশুদ্ধ লোকের মুখে তাঁর সুখ্যাতি ধরে না। দুই ভায়ের খুব সুখে দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

কিছুদিন যায়। বসন্ত বল্লেন, “দাদা! অনেক দিন বাপের খোঁজ পাই নি একবার ছুটি দাও বাপকে দেখে আসি—হাজার হোক্ বাপ ত বটেন।”

রূপ রাজী হ'লেন।

বসন্ত স্ত্রীকে নিয়ে বাপের রাজ্যে যাত্রা কর্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসামন্ত, লোকলস্কর, হাতীঘোড়া, পাল্কীতাঞ্জাম চল্‌লো।

মহারাজ তখন বুড়ো হয়ে পড়েছেন; চোখে দেখ্‌তে পান্ না কাণে শুন্‌তে পান্ না উঠে বস্‌বার শক্তি নেই। বিছানায় পড়ে পড়ে কেবল 'হায় রূপ! হায় বসন্ত! এই কর্‌ছেন আর থেকে থেকে বুক চাপ্‌ড়াচ্ছেন। এমন সময় খবর এল বসন্ত বাপের সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌ছেন! সেই কথায় রাজার চোখে যেন দৃষ্টি এল, কাণে শুন্‌তে পেলেন, গায়ে জোর পেয়ে উঠে বস্‌লেন। বসন্ত কাছে আস্‌তে তাঁকে আদর করে বুকে নিলেন।

তাই দেখে রাণীর সর্ব্বাঙ্গ হিংসায় জ্বল্‌তে লাগ্‌লো। মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—“আবার আপদ্ এসে জুট্‌লো!”

মহারাজ যেন বসন্তকে দেখ্‌বার জন্যই প্রাণটা ধরে রেখেছিলেন। বসন্তের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল!

রাজ্যের লোকেরা বসন্তকেই রাজা কর্‌লে। তাঁর স্ত্রীকেই রাণী বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। ছোট রাণীর নামও কেউ করে না। হিংসায় ছোটরাণীর বুক ফেটে যেতে লাগ্‌লো!

ছোট রাণী তখন এক দিন বসন্তকে ডেকে বল্লেন, “বাবা বসন্ত! রূপকে অনেক দিন দেখি নি, তাকে বড় দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়েছে তার রাজ্যে আমাকে একবার পাঠিয়ে দাও।”

বসন্ত তাই কর্‌লেন।

এদিকে ছোট রাণী রূপের কাছে এসে কেঁদে বল্লেন, “বাবা! সর্ব্বনাশ হয়েছে! মহারাজ নেই! পাপিষ্ঠ বসন্ত রাজ্যের লোভে তাঁকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছে! তুমি রাজা; তোমার কাছে আমি বিচার চাই।”

রাণী এমন করে সাজিয়ে বল্লেন যে,রূপ মনে কর্‌লেন, সত্যি হবে বা! রাগে তাঁর শরীর জ্বলে উঠ্‌লো। তিনি তখনই সৈন্যদের সাজ্‌তে হুকুম দিলেন।

বসন্ত খবর পেলেন, দাদা রূপ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আস্‌ছেন। ব্যাপার কি, তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। চিঠি লিখে খবর আন্‌তে পাঠালেন। সে চিঠি রূপের হাতে পৌঁছলো। রূপ যেমন শুন্‌লেন, সেটা বসন্তের চিঠি, অমনি রেগে উঠ্‌লেন। চিঠি খানা পড়্‌লেন না। কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন। দূত এই খবর বসন্তকে এসে বল্‌লে। বসন্তও তখন সৈন্যদের সাজ্‌তে হুকুম দিলেন।

নদীর এপারে বসন্তের সৈন্য, ওপারে রূপের সৈন্য। তাদের ঢাকের বাদ্যতে আর কাণ পাতা যায় না!

যুদ্ধ বাধে বাধে, এমন সময় বসন্ত দূতের মুখে খবর পাঠালেন “দাদা, যুদ্ধে বাঁচি কি মরি, ঠিক্ নেই, একবার শেষ দেখা দেখ্‌তে চাই তোমার পায়ের ধুলো নেবো!”

ছোট রাণী এই কথা শুনে বল্‌লেন, “খবরদার! এমন কাজ কোরো না, বসন্তকে বিশ্বাস নেই!”

দূত ফিরে এসে বসন্তকে বল্‌লে, “দেখা হ'বে না।”

বসন্ত আবার খবর পাঠালেন, দূত সেবারও ফিরে এল। বার বার তিন বারের বেলায় রূপের মন একটু নরম হয়ে এল। ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

বসন্ত সেই দিন সন্ধ্যাবেলা একটি ছোট নৌকা নিয়ে একলা বেরলেন সঙ্গে কেউ রইলো না, হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নিলেন না।

রূপের তাঁবুতে এসে দাদার পায়ের তলায় পড়ে বল্লেন, —"দাদা! আমার অপরাধ?"

রূপ বল্লে, "অপরাধ! বুড়ো বাপকে তুমি রাজ্যের লোভে মেরে ফেলেছ! তোমার মুখ দেখ্‌তে নেই যে!"

তখন বসন্ত সমস্ত বিবরণ তাঁকে খুলে বল্লেন।

শুনে রাজা তাঁর সৎমাকে তখনি কাট্‌তে যান আর কি!

বসন্ত বল্লেন, "কর কি দাদা! কর কি! হাজার হোক্ মা ডেকেছি তাঁকে ক্ষমা কর!"

তখন সব মিট্‌মাট্ হয়ে গেল।

রূপ নিজের রাজ্যে রাজত্ব কর্‌তে লাগ্‌লেন। বসন্ত বস্‌লেন বাপের সিংহাসনে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

দাদা মহাশয়।

শৈশবের সকল স্মৃতির মধ্যে দাদা মহাশয়ের সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কবে যে দাদা মহাশয়কে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহা মনে হয় না। তাঁহাকে বাদ দিয়া আমার বাল্যজীবন কল্পনাই করিতে পারি না। স্মৃতি যতদূর যায়, সেখানেই দেখি, দাদা মহাশয় রহিয়াছেন। শীতের দিনে সন্ধ্যাকালে দাদা মহাশয়ের কোলের মধ্যে তাঁহার বালাপোষ মুড়ি দিয়া বসিয়া গল্প শুনিতাম। গ্রীষ্মকালে বিকালে তাঁহার সঙ্গে ফুলগাছে জল দিতাম। দাদা মহাশয়ের ফুলবাগানের সখ্ ছিল। তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে সুন্দর একখানি ফুলের বাগান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন বিকালে নিজ হাতে বাগানে কাজ করিতেন।

আমার জ্ঞান হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে দাদা মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজগ্রামে বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, বয়স ষাট পঁয়ষট্টি বৎসরের কম হইবে না। তাঁহার মাথায় কেবল পশ্চাতের দিকে কয়েক গাছি ভিন্ন একটিও চুল ছিল না। আমরা তাহা লইয়া কত ঠাট্টা করিতাম। এমন সুন্দর গম্ভীর বার্দ্ধক্যের ছবি আমি আর দেখি নাই। সুপ্রশস্ত ললাট, সুঠাম গঠন; অতিবৃদ্ধ হইলেও তাঁহার দেহ কোনও দিন বক্র হয় নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহাকে শ্রমশীল জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। আজীবন বৃহৎ পরিবারের ভার তাঁহার স্কন্ধে ছিল। আপন পরিবার ছাড়া কত আত্মীয় স্বজনকে যে তিনি প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

দাদা মহাশয় তহশীলদারী কাজ করিতেন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বোধ হয় তহশীলদারী কাজ কাহাকে বলে, বুঝিবে না। তহশীলদারেরা জমিদারদের কর্ম্মচারী, তাঁহাদের কাজ প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করা। বেতন অতি সামান্যই; পাঁচ টাকা হইতে আট দশ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু বেতন ভিন্ন প্রজাদের নিকট হইতে যত টাকা আদায় হয়, প্রতি টাকায় দুই পয়সা বা চারি পয়সা, করিয়া কমিশন পাইয়া থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হয়। তা ছাড়া জমিদারীর মধ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। প্রজারা ভয়ে হউক, ভক্তিতে হউক, অনেক জিনিস তাঁহাদিগকে উপহার স্বরূপ দিয়া যায়। সেকালে তহশীলদারী বড় চাকরী ছিল। লোকে তহশীলদারী করিয়া দোল দুর্গোৎসব করিত। কত লোক তহশীলদারী চাকুরীতে বড় লোক হইয়া গিয়াছে। আজকালকার ডেপুটী মুন্সেফ প্রভৃতিরাও তেমন পারে না।

দাদা মহাশয় অনেক জমিদারের অধীনে তহশীলদারী কাজ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা ওয়াট্‌সন কোম্পানি নামক নীলকরদের অধীনেই তাঁহার কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন হইয়াছিল। তিনি 'ওয়াষ্টিন' কোম্পানির কথাই অনেক সময় বলিতেন। সর্ব্বত্রই তিনি অতি সুদক্ষ ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যেখানে কোনও কঠিন কাজ পড়িত সেখানেই তাঁহাকে পাঠান হইত। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের ইতিহাস সন্ধ্যাকালে তাঁহার কোলে বসিয়া শুনিতে আমার যে কি ভাল লাগিত, তাহা বলিতে পারি না। তার পরে কত ইতিহাস, কত কাব্যগ্রন্থ পড়িয়াছি, কিন্তু দাদা মহাশয়ের সেই গল্প কি মিষ্টই লাগিত! এখন আমার মনে হয়, আমার জীবনগঠনে দাদা মহাশয় ও তাঁহার গল্প যতটুকু সহায়তা করিয়াছে, আর কিছুই তত নয়।

সন্ধ্যাকালে বাগানের কাজ সারিয়া হাত পা ধুইয়া তিনি তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার সম্মুখে একটি গুড়্‌গুড়ি লইয়া বসিতেন; সেকালের বৃদ্ধদের মত তিনি তামাক খাইতে খুব ভাল বাসিতেন; দাদা মহাশয়ের এইটি আমাদের ভাল লাগিত না; কারণ আমরা একটু বড় হইলে তামাক সাজা কাজটি আমাদের উপরেই পড়িত। তামাকে হাত দিতে আমার বড়ই বিরক্ত লাগিত, কারণ হাত অপরিষ্কার হইয়া যাইত। যথাসাধ্য তামাক সাজা কাজটি এড়াইতে চেষ্টা করিতাম। এখন মনে হয়, দাদা মহাশয় যদি আবার ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে খুব করিয়া তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিয়া তখনকার সেই অপরাধ ক্ষালন করি। যাহা হউক, সন্ধ্যাকালে দাদা মহাশয় হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিতেন, আস্তে আস্তে পাড়ার লোকেরা দুই একজন করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিতেন; তখন গল্প সেই আরম্ভ হইত। আমি আহার নিদ্রা ভুলিয়া হাঁ করিয়া গল্প শুনিতাম; কত রাত্রি হইয়া যাইত, তবু আমার ঘুম আসিত না; হাজার ডাকিলেও খাইতে যাইতাম না। সাধারণতঃ দাদা মহাশয়ের সঙ্গেই আমি খাইতে বসিতাম। তাহাতে আর একটি লাভ ছিল। দাদা মহাশয় তাঁহার পাত হইতে ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী আমার পাতে তুলিয়া দিতেন। তবে খাবার লোভে যে জাগিয়া থাকিতাম, তাহা নহে; খাবার চেয়ে তাঁহার গল্প বেশী মিষ্ট ছিল। এক একটি গল্প কত বার শুনিয়াছিলাম, তবু তাহা নিত্য নূতন লাগিত। কবে কোথায় ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন, কোথায় কি করিয়া বিদ্রোহী প্রজাদের শাসন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কত গল্পই যে ছিল। তখন আমার নিকট তিনি এক আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। এখনও আমার সেই ধারণা যায় নাই। এখন মনে হয়, যদি তিনি অন্য রকম অবস্থার মধ্যে পড়িতেন, তাহা হইলে বিখ্যাত লোক হইতে পারিতেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারিতেন, তাহাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

দাদা মহাশয়কে যে কি ভাল লাগিত, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার কাছে 'দাদা মহাশয়' কথাটিই কত মিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাই আজ দাদা মহাশয়ের কথা লিখিতে বসিয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে কথা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। হয় ত তোমাদের মধ্যে, কেহ কেহ আমার মনের কথা অনুভব করিতে পারিবে। আমার কাছে দাদা মহাশয়কে যেমন ভাল লাগে, আপনার লাগে, আর কাহাকেও এমন লাগে না; মা বাবাকেও না। দাদা মহাশয় অনেক সময় একটি কথা বলিতেন। একদিন তিনি আমাদেরই কোনও একটী ভাই ভগিনীকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন। গ্রামের একটি বৃদ্ধা মুসলমান স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া তাহা দেখিয়া বলল, "ট্যাকা চেয়ে ট্যাকার সুদ মিষ্টি!" অর্থাৎ যেমন দেখা যায়, লোকে টাকার চেয়ে টাকার সুদ বেশী ভালবাসে, তেমনি ছেলেমেয়ের চেয়ে তাহাদের সন্তানেরা বেশী প্রিয় মনে হয়। আমার কাছে এখন মনে হইতেছে, মা বাপের চেয়ে তাঁহাদের পিতামাতাই বুঝি বেশী প্রিয়। শৈশবে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে ভবিষ্যতের কত চিত্র কল্পনা করিতাম; পাঠদশায় তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার উৎসাহ আমাকে বল দিত, যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহাকে সুখী করিব, এই এক বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা করিতে পারি নাই, বরং তাহার বিপরীতই হইয়াছিল।

আজ কতদিন হইল, দাদা মহাশয় এ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তবু আমার যেন মনে হয়, তিনি তেমনি করিয়া আমার শুভাশুভ চিন্তা করিতেছেন। তিনি যে এ জগতে নাই, তাহা সময় সময় ভুলিয়া যাই। আমার

মনে হয়, বাড়ী গেলে তাঁহার সেই পরিচিত স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমি যখন বিদেশ হইতে বাড়ী যাইতাম, তিনি আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। অনেক রাত্রিতে পৌঁছিবার কথা থাকিলেও তিনি ততক্ষণ আমার জন্য বসিয়া থাকিতেন। দূর হইতে পায়ের শব্দ শুনিয়া আমাকে ডাকিতেন। আমাকে দেখিয়া কত খুসী হইতেন। আমার মনে হয়, এখনও বুঝি বাড়ী গিয়া তাঁহাকে তেমনি পাইব। জীবনের সকল সৌভাগ্যের মধ্যে এমন দাদা মহাশয় পাইয়াছিলাম, ইহা একটি প্রধান সৌভাগ্য মনে করি। তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাহা বোধ হয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তখন কত দোষ ক্রটি করিয়াছি; এখন ইচ্ছা যায়, একবার যদি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম, যাহাদের দাদা মহাশয় আছেন, তাহাদিগকে বলিতে পারি, যে, তোমরা বড় সৌভাগ্যবান্, কখনও দাদা মহাশয়ের মনে ব্যথা দিও না।

অশ্রুকুম্ভ।

যমুনার ধারে প্রতি সন্ধ্যা বেলা
আসে এক ছোট মেয়ে,
নদী বেয়ে যায় যতেক তরণী
তারি' পানে থাকে চেয়ে।
সারা সন্ধ্যা বসি আপনার মনে
কি জানি কি গান গায়,
ধীরে ধীরে উড়ে তার কেশরাশি
সাঁঝের মৃদুল বায়।
অগণিত যবে উঠে তারারাশি
আঁধার সুনীলাকাশে—
ফিরে আসে তরু কুটীরে তাহার
দুঃখিনী জননী পাশে।
ভিখারিণী মাতা, ভিক্ষা করে আনে
তাই দু' জনায় খায়;
তরু বিনা আর ছিল নাক' কেহ
দুঃখিনীর এ ধরায়।

২

এক দিন একি নাহি আসে তরু
আঁধারে ঢাকিল ধরা,
আকুলা জননী গেলা নদীধারে
হইয়া পাগল পারা।
"কোথা তরু কোথা?" ডাকিলা জননী
কেহ নাহি দেয় সাড়া!
চারি ধার খুঁজি' নাহি পেয়ে তারে
হইলা চেতনা হারা।
এইরূপে ক্রমে কত দিন গেল
নাহি এল তরু ফিরে,
অভাগিনী মাতা কতই কাঁদিলা
ভাসিয়া নয়ননীরে।
বুঝিল সকলে তরু বেঁচে নাই
ডুবিয়াছে বুঝি জলে,
সান্ত্বনা দিবারে মাতায় তাহার
নাহি পারে কোন ছলে।

৩

নয়নের জল দুঃখিনীর হায়
আঁখি হ'তে সদা ঝরে,
আহার বিশ্রাম ছাড়িল তাহায়,
আহা! বুঝি চিরতরে।
এক দিন মাতা স্বপনের প্রায়
হেরিলা তরুরে তার,
ব্যথিত আনন উজ্জলতা মাখা
নহে যেন এ ধরার।
হস্তেতে তাহার একটি কলসী
বুঝি বা কতই ভারী!
হেলে পড়ে যেতে কলসী লইয়ে
ব্যথা পায় ভারে তারি'।
স্বপন কি সত্য বুঝিতে না পারি
আনন্দ বিহ্বলা মাতা
ধেয়ে গেল সেথা তরুর নিকটে
কহিলা আদরে কথা,

"আয় বাছা মোর, কোথা গিয়েছিলি,
ভুলিয়া দুঃখিনী মায়
বিষাদের ছায়া পড়েছে আননে
দেখে বুক ফেটে যায়।
হাতে কেন মাগো ধরেছ কলসী
ফেলে দে উহারে দূরে,
চল্ মা আমার ভুলিব বেদনা
চল্ মাগো চল্ ঘরে।
কত দিন হায় দেখি নাই ওরে
সুধামাখা চাঁদমুখ,
আয় কোলে আয় ভুলি সব শোক
ভুলিব সকল দুঃখ।
অভিমান ভরে গিয়েছিলি কিরে
রাগ ক'রে মোর' পরে
ভুলেও কখন ক্রোধভরে মাগো
না কহিব কিছু তোরে।"
সু-ধীরে তখন কিছু প'রে গিয়ে
বলিল বালিকা তরু,
"গিয়াছি মা যেথা রোগ শোক ব্যথা
নাহিক সেথায় কারু।
কিন্তু মাগো এই কলসীটি বড়
দিতেছে যাতনা মোরে,
অশ্রুপূর্ণ ইহা যত কাঁদ তুমি
তত জল এতে পড়ে।
তাই বলি আর কেঁদোনা জননি,
কাঁদিলে পাইব ব্যথা।
পারি নাক' আর করিবারে দেরী
যেতে হ'বে ত্বরা সেথা।"
সেই হ'তে মাতা ভুলে গেল শোক
ঝরে না নয়নে জল,
তরু বেঁচে আছে, ভাবিত অন্তরে
ধরি' হৃদয়েতে বল।

ধাঁধার উত্তর।

গতমাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল।

১। কেতকী ফুল।

২। আমড়া।

নিম্ন লিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, শ্রীমতী রেণুকা মজুমদার, শ্রীজিতেন্দ্র-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্ন লিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীসুধেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশেখ গোলাম নবি, শ্রীবিজয় প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে, শ্রীবসুভূতি রক্ষিত, শ্রীমতী পরিমলবালা দেবী, শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা।

১। মহিস সতর টাকা, চারি আনা পাঁটা,
একটী টাকায় পাবে কপোত সাতটা,
ষাট টাকা নিয়ে যাও করিয়া যতন,
সংখ্যায় পুরায়ে ষাট আন জন্তুগণ।

২। এই রচনাটির মধ্যে মধ্যে '——' এইরূপ চিহ্ন আছে। পাঠক পাঠিকাগণকে ঐ ঐ স্থানে একটা করিয়া কথা বসাইতে হইবে। প্রথম স্থানে যে কথাটী বসাইবে, দ্বিতীয় স্থানে ঐ কথাটারই অক্ষরগুলিকে উল্টাইয়া বসাইতে হইবে। যেমন, যদি প্রথম স্থানে বসাও "টাকা" তবে দ্বিতীয় স্থানে বসাইবে "কাটা"।

আমরা নারায়নগঞ্জ যাইতেছিলাম, '—' বাবু ও আমি '—' পার হইব এমন সময় '—' প্রবল ঝড় আরম্ভ হওয়ায় খেয়া নৌকায় উঠিতে আমার '—' হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে '—' একটী '—' নিয়া যাইতেছে দেখিলাম। আমরা কমলাঘাট কার্ত্তিক বারুনীতে গেলাম। '—' প্রসন্ন তাহার '—' জন্য ১ খানা নামাবলী, '—' মোহন ১ খানা ' ', প্রবোধচন্দ্র কাগজের তৈয়ারী ' ' ফুল, '—' ও '—' পাখী এবং '—' মাছ কিনিল। '—' বাবু '—' সেনের ১ শিশি তৈল ২টা '—' এবং বেনে দোকান হইতে কতকগুলি শুষ্ক '—' লইলেন। আমি একখানি মুকুল লইয়া রায় বাহাদুরের বাড়ীর '—' মাতা ঠাকুরাণীকে দিলাম। তাঁহার আনন্দের '—' রহিল না।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে লেফটেনাণ্ট স্যাকলটন ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়।

মুকুল
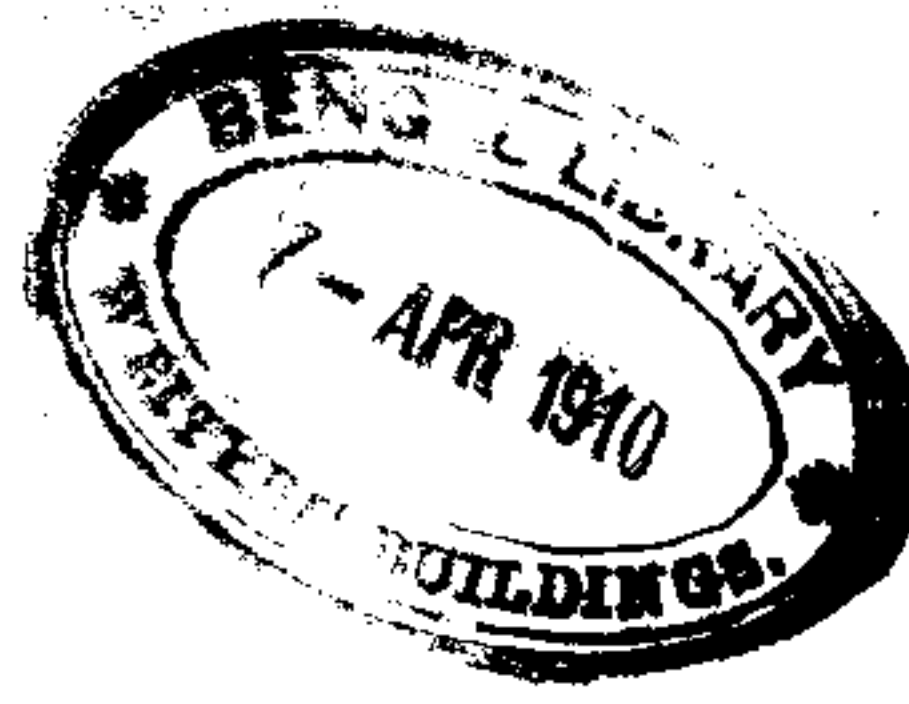
১৫শ ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। | ৮ম সংখ্যা।

পৌরাণিক কাহিনী।

(রামায়ণ)

দশরথ।

মহারাজ দশরথ তাঁহার পিতা অজের একমাত্র পুত্র। বিদর্ভ রাজকুমারী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় দেশ বিদেশ হইতে অনেক রাজা, রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয় কুমার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইন্দুমতী তাঁহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া যুবা অজকেই মাল্য দিয়াছিলেন। দশরথ যখন শিশু, মহারাজ অজ একদিন ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার রাজউদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ বীণা হস্তে আকাশ পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, তাঁহার বীণার অগ্রভাগে এক গাছি পারিজাত মালা ছিল। হঠাৎ সেই মালা বীণাচ্যুত হইয়া ইন্দুমতীর গাত্রে পড়িয়া গেল। ইন্দুমতী সেই মালা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। অজের কাতর বিলাপে সকলে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীর মূর্চ্ছা দূর করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা পতি ও শিশু পুত্রকে শোকে ভাসাইয়া তিনি অকালে পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার পর মহারাজ অজের জীবনের সুখ ও শান্তি জন্মের মত বিনষ্ট হইল; তাহার পর তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় অসহ্য শোকের অগ্নিতে অনবরত জ্বলিত, সংসারের অন্য কোন সুখ তাঁহার দগ্ধ হৃদয় জুড়াইতে পারে নাই; প্রজাদের সুখী করা ও মাতৃহীন শিশু পুত্রটিকে মাতার অধিক যত্নে পালন করা ইহাই তাঁহার শোকভগ্ন জীবনের শেষ কার্য্য হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর দশরথ যখন অযোধ্যার রাজা হইলেন, তখন তিনি তরুণ বয়স্ক। যে যে গুণ থাকিলে প্রজাদের অনুরাগ আকর্ষণ করা যায়, তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি প্রজাদের সন্তানের ন্যায় পালন করিয়া তাহাদের এমন প্রিয় হইয়াছিলেন, যে তাহারা তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় জ্ঞান করিত। তিনি সত্যবাক্, ধর্ম্মাত্মা এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও আকাশের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এমন মধুর ও কমনীয় ছিল, যে এ পৃথিবীতে কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না, তিনিও কাহারও শত্রু ছিলেন না। তিনি মৃগয়া করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং এমন পরাক্রম শালী বীর ছিলেন, যে অসুর দমন করিতে দেবরাজ

ইন্দ্র তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং এই মধুর স্বভাব বীর্য্যবান্ তরুণ রাজা কেবল যে ভারতের রাজন্য সমাজে প্রিয় ছিলেন, এমন নহে, দেবরাজের সভায়ও তাঁহার সমান প্রতিপত্তি ছিল, সেখানেও তিনি সাদর নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইতেন।

একাধারে এত উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হইয়াও এক দোষের জন্য দশরথের জীবন পরিণামে এমন শোচনীয় দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা স্মরণ করিতে হৃদয়ে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। যাহা লইয়া জীবনে সুখী হওয়া যায় ও অপরকে সুখী করা যায়, তাঁহার চরিত্র ও ভাগ্যে সে সকলের কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু যে আত্মসংযম উৎকৃষ্ট চরিত্রের ভিত্তি, যাহা মানব জীবনের প্রধান গৌরব, তাহা দশরথের ছিল না। তিনি বাল্যে মাতৃহারা হইয়া ভগ্নহৃদয় পিতার অজস্র স্নেহ ও অতুল বিভবে পালিত হইয়াছিলেন, এইজন্য কখনও আপনার কোন বাসনা সংযত বা ইচ্ছা রোধ করিতে শিখেন নাই। চাহিবামাত্র বা অভাব বোধের পূর্ব্বেই তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। যখন যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন, মনের ভালবাসা তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তিনি সেই পথেই ধাবিত হইতেন; বিচার শক্তি বা অপরের সুখ দুঃখের চিন্তা তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখিত না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চরিত্রে যে বল জন্মে, তাহা তাঁহার ছিল না, কারণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি কখনও চলিতে চেষ্টা করেন নাই, সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি চিরদিন দুর্ব্বল ছিল, এই দুর্ব্বল চিত্ততাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল।

মহারাজ দশরথের বহু মহিষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও সন্তান ছিল না। পুত্র লাভের আশায় অনেক ব্রত, পূজা ও দান করিয়া অবশেষে পুত্রেষ্টিযজ্ঞের পর বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার চারি পুত্র জন্মিল। ইহার পর তাঁহার মনের আর কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ ছিল না। অনেক আরাধনার পর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনের সকল আসক্তি তাহাদের মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; বাস্তবিক পিতাতে এমন আত্মহারা গভীর বাৎসল্য আর দেখা যায় না। পত্নীদিগের মধ্যে কৈকেয়ী যেমন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, পুত্রগণের মধ্যে রামও তাঁহার সেইরূপ, কি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন। রামকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিতে তিনি অন্তরে ব্যথা পাইতেন। দশরথের চরিত্রে পক্ষপাতিতা বড় প্রবল দেখা যায়, যাহাকে যখন ভাল বাসিতেন, তখন সম্পূর্ণরূপে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িতেন; তাঁহার সকল ভালবাসা তখন অপর স্নেহভাজনদের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কেবল সেই বিশেষ ব্যক্তির উপরে প্রবল বন্যার মত গিয়া পড়িত। কৈকেয়ী ও রামচন্দ্রের প্রতি দশরথের স্নেহের এইরূপ পক্ষপাত ছিল। তাঁহার স্নেহের দুর্ভাগ্য, যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পত্নীই তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পুত্রের অমানুষ শত্রুতা করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইলেন।

রামের অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিয়া দশরথ হৃষ্ট মনে কৈকেয়ীকে এই আনন্দ সংবাদ দিতে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তখন তাঁহার শয়নগৃহে ছিলেন না, তাঁহার পিত্রালয়ের দাসী মন্থরার কুমন্ত্রণায় ক্রোধাগারে ছিলেন; তাহার পরামর্শে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, অভিমান করিয়া রাজার উপর স্নেহের দাবীতে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইবেন এবং ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসন দিবেন।

রাজা ক্রোধাগারে গিয়া দেখিলেন, কৈকেয়ী আলুলায়িত কেশে ভূমিতে পড়িয়া আছেন। দশরথ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কহিলেন, "আমি ও আমার যাহা কিছু সমুদায়ই তোমার, তুমি যাহা চাহ বল, আমি এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" "সূর্য্যচক্র যতদূর পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হয়, পৃথিবীতে ততদূর পর্য্যন্ত আমার অধিকার।" "আমি রাম অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কাহাকেও অধিক ভালবাসিনা. আমার জীবনের

অবলম্বন সেই, রামের শপথ, তুমি যাহা চাহিবে দিব।” রাজা কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করিবার জন্য এইরূপ নানা সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, তখন কৈকেয়ী তাঁহার নিকট দুই বর চাহিলেন, প্রথম রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে নির্ব্বাসন, দ্বিতীয় ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেক।

এই দুই ভয়ঙ্কর কথার অর্থ বুঝিতে দশরথের কত ক্ষণ লাগিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কৈকেয়ীর মুখের বর প্রার্থনা শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ চেতনাহীনের ন্যায় হইলেন, তাহার পর বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যখন তাঁহার চেতনা জন্মিল, তখন মৃগ যেমন ব্যাঘ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তিনি কৈকেয়ীর দিকে সেইরূপ চাহিয়া রহিলেন। প্রিয়তমা রাজ্ঞীর মুখের যে সৌন্দর্য্য ও ভাবের জ্যোতিঃ তাঁহার দৃষ্টি ও চিত্ত এতদিন মুগ্ধ রাখিয়াছিল, তাহা আলেয়ার আলোকের মত নিমেষে অন্তর্হিত হইল। আজ তাঁহার নিকট কৈকেয়ীর যে মূর্ত্তি দেখা দিল, তাহা শ্মশানচারিণী ভৈরবী অপেক্ষাও ভয়ানক। এই বিষম দৃশ্য দেখিয়া দশরথ ভয়ে স্তম্ভিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। “নৃশংসে, রাম মাতার মত সর্ব্বদা তোমার সেবা করেন ও তোমাকে ভালবাসেন, তবে তাঁহার এই অনিষ্ট তুমি কেন ইচ্ছা করিতেছ? আমি না জানিয়া আত্মবিনাশের জন্য তীক্ষ্ণ বিষা বিষধরীর ন্যায় তোমাকে গৃহে আনিয়াছিলাম। আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা অধিক কি, রাজশ্রী বিদায় দিতে পারি, কিন্তু রাম ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারিব না।” “সূর্য্য ভিন্ন জগৎ থাকিতে পারে, জল বিহনে শস্য বাঁচিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে জীবন থাকিবে না।” সমগ্র হৃদয় মন মথিত করিয়া দশরথের মুখ দিয়া এই সকল করুণ বিলাপ উত্থিত হইতে লাগিল। জগতে আর কেহ বুঝি সন্তানের জন্য এমন আর্ত্ত বিলাপ করে নাই। আমার নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রের আমা হইতে এমন দণ্ড হইল, শত বার দশরথের মনে এই কথা উদিত হইতে লাগিল। রামের অভিষেক উপলক্ষে কত রাজা, রাজপুত্র, বীরগণ, বিদ্বৎজন, ঋষিকুল, সম্ভ্রান্ত পৌরজন ও জানপদবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া উপনীত হইয়াছেন, সর্ব্বজনপ্রিয় রাজকুমারের অভিষেকের আনন্দে অযোধ্যা অধীর হইয়াছেন, কল্য প্রভাতে অভিষেক উপলক্ষে যে মহতী সভা হইবে, দশরথ তথায় কোন্ মুখে উপস্থিত হইবেন? কোশলরাজের ভুবনব্যাপী সম্ভ্রম কাল সকলের সম্মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। সর্ব্বগুণে গুণবান নির্দ্দোষ প্রাণপ্রিয় পুত্র অপরাধীর ন্যায় দণ্ড ভোগ করিতে গহন বনে প্রবেশ করিবেন। যাহাকে চিরদিন পূর্ণ বিশ্বাসে অন্তরের সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, তাহা হইতে এই অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল! দশরথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তপ্তশেল বিদ্ধের ন্যায় আকুল হইয়া তিনি যাতনায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। রামের বিহনে কৌশল্যার বিলাপ পাঠ করিলে প্রাণ ব্যথিত ও অধীর হয়, কিন্তু দশরথের যাতনা স্মরণ করিলে চিত্ত ক্ষোভে ও দুঃখে কেবল ব্যথিত নয়, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কৈকেয়ীর প্রার্থিত বর শুনিয়া অবধি মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত দশরথের কি অসহনীয় যাতনা দিন কাটিয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। সেই কালরাত্রি তারকাখচিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। রাজা অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি আকাশে বদ্ধ করিয়া করযোড়ে কহিলেন, “হে নক্ষত্রভূষিতে রজনি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না।”

পর দিন রজনী প্রভাত হইল। কুলগুরু বশিষ্ঠ রামের অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিয়া রাজাকে সভাগৃহে আনয়ন করিতে সুমন্ত্রকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। সুমন্ত্র রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, “ভগবান বশিষ্ঠ, সুযজ্ঞ,বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ দান করুন।” তখন দশরথ কেবল কহিলেন, “সুমন্ত্র, আমি সুন্দর রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।” রাম আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দশরথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে বা কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কৈকেয়ীর

মুখে রাম যখন সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইবেন বলিয়া পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন, তখন তিনি কহিলেন, "আমি বর দিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য লও।" রাম বনে যাইবেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে কখনও নিবৃত্ত হইবেন না, ইহা জানিয়া রাজা আবার কহিলেন, "পুত্র তুমি বনে যাও, শীঘ্র ফিরিয়া আসিও, আমি তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে বলিতে পারি না, তোমার পথভয় শূন্য হউক। আমার এক অনুরোধ, তুমি আজ যাইও না, আমি ও তোমার মাতা আর এক দিন তোমার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইব ও তোমার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিব।" রাম সেই দিনই বনে যাইবেন বলিয়া বিমাতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার এই অনুরোধ রাখিতে পারেন নাই। বল্কল পরিয়া ভ্রাতা ও সীতাকে লইয়া তিনি যখন রথে আরোহণ করিয়া বনে যাত্রা করিলেন,রাজা ও মহিষী রথের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া "রথ রাখ" "রথ রাখ" বলিতে লাগিলেন। রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, "আমি এই দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না,সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়া লইয়া যাও।" রথ চলিয়া গেল। রাজা ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি বাম পার্শ্বে কৈকেয়ীকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম। তুমি অদ্য হইতে আমার স্ত্রী নও।" তাহার পর কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "দ্বারদর্শিগণ, আমাকে রামের মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাও, আমি অন্য কোথাও শান্তি পাইব না।" কৌশল্যার গৃহে গিয়া অনবরত কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রিতে দশরথের তন্দ্রা আসিল, তিনি অর্দ্ধরাত্রে জাগিয়া কৌশল্যাকে কহিলেন,"আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, রামের রথের পশ্চাতে আমার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দৃষ্টি ফিরিয়া পাই নাই, তুমি হস্ত দিয়া এক বার আমাকে স্পর্শ কর।"

ছয় দিন পরে সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুমন্ত্র মুখে নির্ব্বাসিত পুত্রের সমুদয় সংবাদ শুনিয়া দশরথ অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহার পর সুমন্ত্রকে কহিলেন, "আমায় শীঘ্র রামের নিকট লইয়া যাও, আমি রাম ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না। আমার মৃত্যু নিকটে, ইহা হইতে অধিক দুঃখ কি, যে আমি এই সময়ে রামের মুখ দেখিতে পাইলাম না।"

রাম নির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধ রাত্রিতে দশরথের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি না জানিয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই পুত্র শোক যে তাহারই মহাপ্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ে তিনি তাহা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে রুদ্ধকণ্ঠে কৌশল্যাকে কহিতে লাগিলেন, "দেবি, তখন তোমার বিবাহ হয় নাই। আমি যুবরাজ ছিলাম ; তখন একবার বর্ষাকাল উপস্থিত হইল, স্রোতের জল গৈরিক প্রভৃতি ধাতু যোগে কোথাও রক্তবর্ণ, পাণ্ডু ও গৈরিক বর্ণ হইয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে বহিতেছিল। কোথাও মেঘমালা আকাশে শোভা পাইতেছিল সেই সময়ে একদিন সায়ংকালে আমি ধনুক হস্তে সরযুর অরণ্যময় তীরে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম। প্রস্রবণ হইতে এক ঋষিকুমার কুম্ভ জলে পূর্ণ করিতে ছিলেন ; হস্তী জলক্রীড়া করিতেছে ভাবিয়া আমি সেই দিকে বাণ নিক্ষেপ করিলাম। পর মুহূর্ত্তে মনুষ্যকণ্ঠে কাতর হাহাকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে আহত ও জলে পতিত হইয়া কহিলেন, 'আমি এক জন তাপস কি কারণে আমার উপরে শস্ত্র পতিত হইল ? আমি রাত্রি কালে নির্জ্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, এ সময়ে কে আমায় শর প্রহার করিল ? আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করি, আমি মস্তকে জটাভার বহন করিতেছি, বল্কল ও চর্ম্মই আমার পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল ? আমি কাহার কি ক্ষতি করিয়াছিলাম ? প্রাণনাশ হইল বলিয়া আমি অনুতাপ করি না ; আমার মৃত্যুতে অন্ধ বৃদ্ধ পিতামাতার যে দুর্দ্দশা হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমি দুঃখিত হইতেছি। হায়! এক শরে আমরা সকলেই হত হইলাম।'

দেবি, সেই রাত্রিতে তপস্বী মুখের এ রূপ করুণ বাক্য শুনিয়া আমার হস্ত হইতে শর ও ধনুক ভুমিতে পড়িয়া গেল। আমি অত্যন্ত ভীত ও শোকে আকুল হইয়া তথায় গিয়া দেখিলাম, সরয়ূ তীরে এক অল্প বয়স্ক তাপস শর বিদ্ধ হইয়া ভূমিতে পতিত আছেন তাঁহার জটা সকল বিক্ষিপ্ত, শরীর ধূলিলিপ্ত ও রক্তাক্ত, জলপূর্ণ কলস নিকটে ভুমিতে পতিত রহিয়াছে।

তিনি আমাকে সম্মুখে দেখিয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন. 'মহারাজ, আমি বনবাসী, পিতামাতার জন্য জল লইতে সরয়ুতে আসিয়াছিলাম; তুমি কেন আমায় আঘাত করিলে? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম? তুমি এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতা মাতারও প্রাণনাশ করিলে। তাঁহারা অন্ধ ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি এই পথ দিয়া যাও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তোমার সুতীক্ষ্ম শর আমার মর্ম্মদেশে অতিশয় যাতনা দিতেছে, অতএব তুমি এখনই আমার বক্ষ হইতে শল্য তুলিয়া লও।'

দেবি, মুনিকুমার এই কথা কহিলে আমি তাঁহার বক্ষ হইতে সাবধানে শল্য তুলিয়া লইলাম, তখন তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবি, না জানিয়া এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মনে অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল। কি করিব ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে জল পূর্ণ কলস লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া তরুণ তাপসের পিতার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখিলাম, দুর্ব্বল অন্ধ তাপস দম্পতি ছিন্নপক্ষ পক্ষীযুগলের মত বসিয়া আছেন। তাঁহারা পুত্র কখন জল আনিবে সেই আশায় ছিলেন। দেবি, একেত আমি ভীত ও শোকার্ত্ত ছিলাম, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমার অধিক ভয় ও শোক হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্র ভ্রমে কহিলেন, "বৎস, তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? তুমি শীঘ্র জল আন। তুমি জলে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া আমরা কত ব্যস্ত হইতেছি। আমরা যদি তোমার কোন অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই গতিহীন দিগের গতি ও চক্ষুহীনদিগের চক্ষু। আমাদের জীবন তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।' আমি তখন কহিলাম, 'হে তপোধন, আমি আপনার পুত্র নহি, দশরথ নামক ক্ষত্রিয়; আমি না জানিয়া আপনার পুত্র বিনাশ করিয়াছি।, এই বলিয়া তাঁহাকে সমুদয় ঘটনা অবগত করাইলাম। আমি করযোড়ে মুনিকে এই কঠোর কথা শুনাইলে তিনি কহিলেন, 'তুমি যদি আসিয়া আমাকে এই সংবাদ না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সহস্র অংশে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এখন তুমি আমাদের সেই খানে লইয়া চল।' অনন্তর আমি একাকী তাঁহাদের সরয়ূ তীরে লইয়া গিয়া সেই মৃতদেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবা মাত্র তাঁহারা পুত্রের শবের উপর পতিত হইলেন; পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, 'বৎস তুমি আমায় অভিবাদন করিতেছ না কেন? কি নিমিত্তই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমিকি রাগ করিয়াআছ? আমি যদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধার্ম্মিকা মাতার দিকে দৃষ্টি কর। আমি শেষ রাত্রিতে কাহার প্রিয় কণ্ঠস্বরে শাস্ত্র আবৃত্তি শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব? সন্ধ্যাবন্দনার পর অগ্নি জ্বালিয়া কে আমায় স্নান করাইবে? আর কে কন্দমূল ও ফল আহরণ করিয়া আমাদিগকে প্রিয় অতিথির মত ভোজন করাইবে? তুমি যমালয়ে একাকী যাইও না, কল্য আমাদের উভয়ের সঙ্গে তথায় যাইও। আমি যমালয়ে গিয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, ধর্ম্মরাজ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে ভরণপোষণ করুন; তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। মুনি এইরূপ বিলাপ করিয়া আমায় অভিশাপ দিলেন, যে পুত্রশোকে যেমন আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, তোমাকেও সেইরূপ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি পত্নীর সহিত পুত্রের চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।"

বহু বৎসর হইল এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজ পুত্র শোক কি তাহা বুঝিয়া দশরথের স্মৃতিতে সেই করুণ দৃশ্য উদিত হইল,। অজ্ঞানতাবশতঃ মুনি কুমারকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া বিধাতার ন্যায় দণ্ডে তাঁহার যে পুত্রশোকে প্রাণ বিয়োগ ঘটিতেছে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৌশল্যাকে কহিলেন, "দেবি, পুত্রশোকে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর।" তাহার পর কহিলেন, "এখন রাম যদি আসিয়া আমায় একবার স্পর্শ করেন এবং যদি তিনি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তবে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের প্রতি ভাল ব্যবহার করি নাই, কিন্তু তিনি আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার পর গুরুতর দুঃখ কি, যে আমি মৃত্যু সময়ে ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইব না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে যাঁহারা রামের কুণ্ডলযুক্ত মুখ দেখিবেন, তাঁহারা দেবতা, আমি আর দেখিতে পাইলাম না।" গভীর রজনীতে এই রূপ বিলাপ করিয়া "হা পুত্র, "হা রাম" বলিতে বলিতে দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুতাপদগ্ধ পীড়িত হৃদয় রাম বনে যাইবার ষষ্ঠ রাত্রে চির শান্তি লাভ করিল।

আমেরিকার বালকবালিকাদের কথা।

আমেরিকার বালকবালিকাদের বিষয় লিখিতে হইলেই আমাকে Brooks পরিবারের কথা দিয়া আরম্ভ করিতে হয়। বিদেশে অধিক দিন থাকিলেই দেখা যায়, ভাল মন্দ সর্ব্বত্র সমান। সভ্য দেশ সকল সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলেও আমি ইহা দেখিয়াছি, আমাদের জাতীয় চরিত্রে ভাব ও আকাঙ্ক্ষার এমন সরল ও উচ্চভাব বিদ্যমান, যাহার পরিবর্ত্তে বিদেশের সভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আমারমনে কখনই উদয় হয় নাই। আমেরিকার শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার ভোগের মধ্যে ছয় মাস বাস করিয়া একদিনও মনে ইহা ইচ্ছা করি নাই, কবে আমাদের দেশে এই প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দ ও ভোগ বিলাসের দিন আসিবে। যাহা হউক, তোমাদিগকে সে সকল কথা না বলিয়া সে দেশে যাহা ভাল দেখিলাম, কেবল তাহাই বলিব। ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে যে সকল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক আমাদের দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন, তাঁহারা এদেশে অবস্থান সময়ে বন্ধুতা ও পরহিতৈষণা দেখাইয়া আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করেন, কিন্তু স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া আমাদের নামে এত কুৎসা রটনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, যে সে সকল কথা শুনিলে ধৈর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়। আমাদের দেশের এত ভুরি ভুরি নিন্দা ও কুৎসা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ-কর্ত্তৃক আমেরিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, যে তাহা শ্রবণ করিলে মনে ক্রোধ উপস্থিত হয়। এ কথা তোমরা জানিও, যে কুরীতি ও দুর্নীতি সকল দেশেই আছে, বরং যে দেশ যত সভ্যতার সোপানে উন্নত, সে দেশের নিষ্ঠুরতা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও তাহা অনেক অধিক ও হৃদয় হীন। দেশ দেশান্তে ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, যে আমাদের অনেক শিখিবার ও অনেক জানিবার আছে বটে, কিন্তু আমাদের সহস্র অভাব ও নানবিধ অজ্ঞতা সত্ত্বেও আমাদের দেশ অথবা আমাদের দেশের লোক অন্যদেশ হইতে হীনত নহেই বরং অনেক বিষয়ে অন্যদেশ হইতে উন্নত। তোমরা বিদেশের বিষয় অনেক শুনিবে, তোমরা বিদেশ হইতে অনেক রত্ন আহরণ করিয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিবে, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও, যে আমাদের নিকট আমাদের ভারতভূমি হইতে প্রিয়তর স্থান আর জগতে নাই।

যুক্ত সাম্রাজ্যের (United States of America) পশ্চিম প্রান্তে Illinois বিভাগের Urbana বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক Brooks এর গৃহে এক সপ্তাহ কাল অতিথি হইয়া তাঁহাদের সৌজন্য ও যত্ন দেখিয়া

মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই পরিবারটী সে দেশের মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন। তাঁহাদের গৃহে আটটী সন্তান; এই সন্তানগুলির লালন পালন প্রণালী চমৎকার, এই বিষয়ে আমাদের শিখিবার অনেক আছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় সন্তানের বড় যত্ন করে। আমাদের দেশে সন্তানের মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে দেন, কিন্তু সে দেশে সন্তানের জন্মাবধি পিতামাতার নূতন জীবন আরম্ভ হয়। আমি বিলাসী নর নারীর কথা বলিতেছি না, কিন্তু সমাজের অস্থি মজ্জা স্বরূপ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবনের কথা বলিতেছি। আমাদের দেশে ঘরের শত কাজের মধ্যে শিশুর লালন পালন একটী কাজ, সে সকল দেশে শিশুর জন্মাবধি তাহার লালন পালন সর্ব্বাগ্রে, অন্য কর্ম্ম তাহার পরে। শিশুর কাজগুলি প্রথমে করা হইলে তবে মাতা অন্য বিষয়ে মন দেন; পিতাও অবসর সময় শিশুতে অর্পণ করেন। পিতামাতা সকল ভুলিয়া শিশুর জীবনে বাস করিতে থাকেন। যাঁহাদের অর্থ সচ্ছলতা আছে, তাঁহারা শিক্ষিতা অভিভাবিকা নিযুক্ত করেন বটে, তথাপি অবসর সময় তাঁহারা শিশুর সঙ্গে বাস করেন। সে দেশের গৃহিণীরাও আমাদের দেশের গৃহিণীদের মতন গৃহের সমুদয় কাজ স্বহস্তে করেন। তাহার উপরে নূতন কাপড় সেলাই, পুরাতন কাপড় মেরামত এবং কাপড় কাচা এই সকলই করিয়া থাকেন। মাতা এতগুলি কাজ করিয়া সন্তানকে লইয়া প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা মুক্ত বাতাসে বাস করেন, ইহাতে শিশু ও মাতা উভয়েরই স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ইহার কারণ, প্রতি পরিবারেই শিশুকাল হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস।

ছুটীর দিনে ইংলণ্ডের সহর গুলিতে বালক বালিকার জনতা দেখিলে মনে হয়, এই পিপীলিকার সারির মতন শিশু সন্তানগুলি কোথায় ছিল? ঘাটে মাঠে এত জনতা, যে চলিবার রাস্তা পাওয়া দুষ্কর। রবিবার এবং অন্যান্য ছুটীর দিনে পিতামাতা একত্র হইয়া বালকবালিকা দিগের সহিত মুক্ত বায়ু সেবনে বাহির হন। এ দৃশ্য অতি চমৎকার। সহরের প্রত্যেক মাঠ ও পার্ক শিশু সন্তান পরিবৃত পিতামাতাতে পূর্ণ; সে যে জনতা! কেহ খেলা করিতেছে, কেহ দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি করিতেছে, কেহ নানা রকমের তামাসা দেখিতেছে, কেহ রাস্তায় রাস্তায় অল্প পয়সায় ফল ও মিষ্ট দ্রব্য কিনিতেছে। কেহবা পুকুরে ছোট ছোট নৌকাতে বাইচ খেলিতেছে। বড় বড় ছেলেরা cricket খেলিতেছে। যাহারা নিতান্ত ছোট, তাহারা খন্তা লইয়া মাটী খুঁড়িয়া মাটির দুর্গ, প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। দেখিয়া মনে হয়, যেন এটা শিশুদেরই দেশ, এখানে শিশুরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। শীতের দেশ বলিয়া ও রৌদ্রের প্রখর তেজ না থাকাতে ছুটোছুটী ও চলাফেরা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার প্রভাবে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবার সন্তানদের মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ ও খেলা করিবার আবশ্যকতা বুঝিতেছেন, তাই তাঁহারা সকল খেলাতে সন্তানদের উৎসাহ দেন।

ছুটীর দিনে খেলা ধূলা ছাড়া যাদুঘর, চিত্রশালা, পশুশালা প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে দলে দলে বালক বালিকা যাইতেছে, কত রকম জাতীয় সমিতি ও কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, যেখানে গেলে জ্ঞান স্পৃহা বাড়ে অথবা স্বদেশ প্রেম উদ্রিক্ত হয়, শৈশব হইতে শিশু তাহা দেখিতে দেখিতে বড় হয়। শিশুটী যখন কেবল মাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে, তখনই দেখিলাম, সে এমন বাধ্য, যে মাতার ইঙ্গিতে চলে। আমাদের দেশ উর্ব্বরা, গাছ পালা যেমন এখানে আপনাপনি বাড়ে, গৃহ-উদ্যানে সন্তানদেরও সেই দশা. তাহারা আপনা আপনি বাড়িতেছে, কেহ বাঁচিল, কেহ মরিল, কেহ চোর হইল, কেহ দেশপূজ্য হইল, কপাল বলিয়া আমরা বসিয়া থাকি। আমাদেরও যে চেষ্টা করিবার আছে, তাহা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ভুলিয়া যাই; ভগবানের ইচ্ছা বলিয়া বসিয়া থাকি। আমরা যে ভগবানের যন্ত্র তাহা মনেই করি না। শাসন ও যত্ন কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি না। ফলে বাল্যকাল হইতে ইচ্ছামত চলিয়া বড় হইয়াও আমরা অসংযত থাকি। বাল্যকালে যে যার কাছে বাধ্যতা শিখে নাই, সে কি বড় হইলে কাহারও শাসন

মানিতে পারে? বা পাঁচ জনের সহিত একত্র কোন কাজ করিতে সক্ষম হয়? যে শৈশব হইতে নিজের ইচ্ছা সংযত করিতে শিখে নাই, সে বড় হইলে কখনও কোন নেতার অধীনে কাজ করিতে পারে না।

যে Brooks পরিবারের কথা দিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাদের তের বৎসর বয়স্ক ছেলেটি আমার ছবি তুলিবার জন্য ব্যগ্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, শুনিলাম ইহার কনিষ্ঠ এগার বৎসর বয়স্ক পুত্রটিও ছবির মাসিক পত্রিকাতে ছবি পাঠাইয়া পুরস্কার পাইয়াছে, সে খুব উৎসাহে আমাকে তাহার সকল ছবি দেখাইতেছে, যে ছবি তুলিয়া সে পুরস্কার পাইয়াছিল তাহাও দেখাইল। পিতা মাতা ইহাদের সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যান এবং পথে দর্শনীয় যত কিছু তাহার ছবি তুলিতে তাহাদের উৎসাহ দেন।

ইহাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কিছু জমি আছে, তাহার চারিদিকে ইহারা সঙ্গীদের সঙ্গে ছুটাছুটি করে, যাহাতে দৌড়াইবার সময় বিপরীতগামীদিগের সহিত ধাক্কা না খায়, সেজন্য এই অল্পবয়স্ক বালকগুলি রেলের signal এর ন্যায় চারি কোণে সুন্দর signal আপনাপনি তৈয়ার করিয়াছে। ইহাদের আঠার বৎসর বয়স্ক পুত্রটি এত অল্প বয়সেই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সেই তের বৎসর বয়স্ক পুত্রটি বাড়ীতে তার-শূন্য তড়িতের যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত। বালক বালিকাদের স্বভাবই অনুকরণ করা, তাহারা বাহিরে যাহা দেখে, একটু উৎসাহ পাইলেই তাহা বাড়ীতে করিতে চেষ্টা করে। পিতামাতার শিক্ষা কি রকম, এই ছেলেটী এখনই তাহাদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ধনাধ্যক্ষ, সে সমুদয় চাঁদা আদায় করে এবং খরচের হিসাব রাখে। এখন সে কিছুই জানে না বটে, কিন্তু রাত্রিতে পিতার নিকট শিখিয়া লইতেছে। আহারের সময় দেখিলাম, বালকবালিকাদিগকে তখন হইতেই পরিবেশন করিতে, গুরুজনদের সম্মান ও সাহায্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমাদের অবস্থিতি সময়ে অনেক লোক রাত্রিতে নিমন্ত্রিত হইত, দাসীরা সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিদায় লইত, তখন এই বালক দুইটী সকলকে জল খাবার দেওয়া প্রভৃতিতে মাতাকে সাহায্য করিত। যেমন লেখাপড়া, তেমন গৃহ কর্ম্মে সাহায্য, এবং সাধারণ দেশহিতকর কার্য্যে যোগ দেওয়া সমুদয় এক সঙ্গে বাল্যকাল হইতেই আরম্ভ হয়। ছেলেবেলা থেকে তাহারা দেশকে ভালবাসিতে ও দেশের সেবা করিতে শিক্ষা পায়। প্রথমে নিজের সহর নিজের স্কুল ও বিশ্ব বিদ্যালয়কে ভালবাসিতে ও সম্মান করিতে শিখে, পাঠাবস্থায়ই তাহাদের ঘরে ঘরে স্কুলের নিশান সজ্জিত থাকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবের উদ্রেক হয়। বড় হইলে যখন দেশকে জানিতে পারে, তখন দেশের গৌরব ও সম্মান বাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

শ্রীঅবলা বসু।

ভূতের ঔষধ।

(গাথা)

কোন্দলী বুড়ি ছিল এক গ্রামে
ভয়ে তার গ্রাম-বাসী,
পলাইল দূরে বাড়ী ঘর ছেড়ে
কেহ কাঁদি কেহ হাসি!
তনয় তাহার গৃহে আপনার
ঘোর রাতে আসে ডরে,
দিবসে কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়
গালাগালি নাহি সহে!
কোন্দলী সুতে পরিণয় দিয়ে
ঘরে আনে নব বধূ,
দু'দিন না যেতে সেও যে পলায়,
ঝগড়ার চোটে শুধু!
মহা মুস্কিলে পড়ে গেল বুড়ি
না মেলে ঝগড়া সাথী,
মনে ভাবে হায়, কাটিছে বৃথায়
দীর্ঘ দিবস-রাতি!

না দেখি উপায় শেষে প্রতিদিন
আঙ্গিনা ঝাঁট দিতে,
উঠানের মাঝে ছিল তাল গাছ
ফিরি তার চারি ভিতে
করে ঝাঁটা-পেটা রোষে বলে, "বেটা,
তুই কেন মাঝ খানে,
ওরে হতভাগা, বন-ছাড়া গাছ,
মরণ না তোরে টানে?"
না পারে পালাতে নিরীহ পাদপ
চুপ করে তাই সয়,
সদাগতি দুখে সখার বেদনা
দিশে দিশে যেন বয়!

২

তনয়ের তার কি নাম শুধালে
বুড়ী কয়, 'গদাধর'
সকলে তাহারে 'গদা' বলে ডাকে
রাগে বুড়ী গর্ গর্।
একদা নিশীথে গদা বাড়ী আসে
নাহি জাগে জন-প্রাণী,
'গদা বাবু' বলে ডাকে যেন তারে
সেই তাল গাছ খানি!
গদা চমকিত কহে, "কে কোথায়"
উত্তরে কেবা "এই
তাল গাছ 'পরে ভূত বসে আমি,
কাছে এস, ভয় নেই!"
গদার বুকের রুধির শুকায়
সাহস করিয়া তবু,
শুধাল "কি চাও" ভূত কহে ধীরে
"আমি তব প্রজা প্রভু!
বহু কাল হতে তাল গাছে এই
করিতেছি বসবাস,
এখন তোমার মায়ের আচারে
ফুরাল সে সুখ-আশ!
নিতি নিতি আর পারি না সহিতে
ঝাঁটার দারুণ বেগ,
অঙ্গে আমার কালিমা পড়েছে
গদাবাবু, এই দেখ্!"
এত বলি ভূত পৃষ্ঠ দেখায়
ঝাঁটার চিহ্ন আঁকা,
গদা ভাবে মনে 'এই তো সুযোগ!
আর কেন হেথা থাকা!'
নিমেষ ফিরিয়া ভূত কহে পুনঃ
"কি ভাবিছ মহাশয়,
তব অধিকারে করিয়া বসতি
(সদা মোর মনে লয়)
দেই নাই তোমা কর কোন দিন,
এ সকলি সেই পাপে,
তা' না হ'লে আর কে রাখে শকতি
ভূতের শরীর তাপে!"
কিছু কাল কেন নীরব রহিয়া
কহিল আবার ভূত,
"যা হবার হল, এবার পালাই,
লও মহা গুণযুত
এই পাখা খানি ওহে গদাবাবু,
শোধিব তোমার ঋণ,
শুন মন দিয়া, আমি যে এখন
নানা দেশে নানা দিন,
ধনীদের ঘাড়ে চাপিয়া হরষে
করিয়া তোমার নাম
দিব গালাগালি, ভাবিবে সকলে
তুমি ওঝা অভিরাম!
ডেকে নিবে তোমা, তুমি এ পাখায়
বাতাস করিও মোরে,
ছেড়ে যাব আমি; অর্থ তোমায়
দিবে সবে সমাদরে!
এই রূপে তব দুঃখ ঘুচিবে
দৈন্য পালাবে দূরে,

এখন তা হলে যাই গদা বাবু
কোন ধনবান-পুরে !"
নিমেষ না যেতে অদৃশ্য ভূত;
বিস্মিত গদাধর,
নেহারে পাথাটী পড়িয়া রয়েছে
সমুখে ভূমির 'পর !

৩

ধনীর ভবনে মহা উৎপাত
ভূতে পায় কত জনে,
গদার নামেতে ঘোর কোলাহল
লাফালাফি তার সনে !
চিন্তে সকলে গদা ওঝা হবে,
আগ্রহে ডাকে তারে,
ধেয়ে আসি গদা ভঙ্গি করিয়া
পাথা খানি ধীরে নাড়ে !
কত যে ভূতের অলীক মন্ত্র
উচ্চারে তার সনে,
ওঝা বটে এই ! মুগ্ধ হৃদয়ে
সকলে যে ভাবে মনে।
ভূত আপনার বাক্য পালিয়ে
ছেড়ে যায় কিছু পরে,
ওঝা গদাবাবু আশাতীত ধন
আনেন আপন ঘরে।
দিনে দিনে দিনে গদার সুযশে
মুখরিত চারি ঠাঁই,
কুটীর প্রাসাদে ক্রমে পরিণত
সুখের অন্ত নাই !
কোন্দলী বুড়ি কোন্দল করে
সেই সে আগের মত,
ধনের কৃপায় আর কারো গায়
বাজেনা বেদনা অত !
পাড়া প্রতিবাসী ধীরে ফিরে আসে
কেহ ডাকে, 'মাসী' 'খুড়ি'
ঝগড়ার তাপ আজ সহা যায়
অর্থ যে দেয় বুড়ি !

৪

এদিকে ভূতের সঙ্কট বড়
কোথাও হয় না ঠাঁই,
যেখানে যায় সে পাথার বাতাসে
খেদায় গদা সেথাই' !
না পারে রহিতে, আপনার কথা
আপনি গো অবহেলি,
শুষ্ক শরীর ঘুরিয়া ঘুরিয়া
তৃষ্ণায় মরে জ্বলি !
একদা গোপনে যুক্তি করিয়া
ঘুচাতে বিষম দায়,
গদার পাথাটী করিল হরণ
গভীর নিশীথে হায় !
তার পরে এক রাজার বধূর
আশ্রয় করি দেহ,
মহা সুখ-ভোগে রহিল পুলকে
আকুলি সে রাজ গেহ !
আহ্বান হল, ওঝা গদাধর
গদা দেয় শিরে হাত,
নাহি পায় পাথা, কে করিল চুরি,
কবে কোন্ কাল-রাত !
তবু রাজ-বাড়ী হইল যে যেতে
পাথা এক লয়ে আন্,
নতুবা তাহার রাজ-রোষানলে
হারাইতে হবে প্রাণ !
গদারে নিরখি কুপিত সে ভূত
কহে, "কেন হেথা আর,
বহু ধন তোরে দিয়েছি যে আমি
দূর হও এই বার।
পাথার বাতাসে ঘুরিতে ঘুরিতে
কঙ্কালকায় মোর,
হরেছি সে পাথা, পলারে নচেৎ
ভাঙ্গিব ঘাড় তোর !"

ভাবে গদাধর ভীষণ বিপদ
পলাইলে রাজা মারে,
রহিলে মরণ ভূতের হাতেতে
করেবা তুষ্ট কারে!
তথাপি সাহসে কহিল রাজায়
"শুন রাজা মহাশয়,
প্রলাপ বচনে বুঝিনু এ ভূত
তেমন সহজ নয়!
নির্জ্জন গৃহ মোরে এক-দেহ
বধূ আর আমি সেথা,
রহিব কেবল, যেন কোন জন
কাছে নাহি রহে কোথা!
যে থাকিবে তারে পাইবে এ ভূত
বাঁচাতে নারিব আর,
সাবধান অতি হয়ে মহারাজ
সরে যাও একবার!"
সভয়ে তফাতে সবে গেল সরি'
গদা ভূতে হেসে কয়,
"তাল গাছে সেই ঝাঁটার প্রহার
আজ কিবা মনে হয়?
যদি ভাল চাও অচিরে পলাও,
নহিলে মায়েরে ডাকি"
ভূত বলে, "ভাই, যাই, যাই, যাই,
তোমার বচন রাখি!"
পলকের মাঝে সুস্থা বধূটী,
রাজা তোষে বহুধনে
'ভূতের ঔষধ পাইনু অতুল'
গদা ভাবে মনে মনে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দক্ষিণ মেরু অভিমুখে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার ন্যানসেনের উত্তর মেরু আবিষ্কারের চেষ্টার বিবরণ আমরা মুকুলে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। যেমন উত্তর মেরু, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর প্রান্ত আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছে, সেইরূপ দক্ষিণ মেরু গমনেরও অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কাপ্তেন কুক এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক। তিনি সর্ব্ব প্রথমে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু দক্ষিণ মেরুর ১৩১৮ মাইল উত্তর হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। অবশ্য সেকালে এতদূর গমন করা অতিশয় ক্ষমতা এবং দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে আর একজন ইংরাজ নাবিক আরও একটু দক্ষিণে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ মেরুর ১১০৮ মাইল দূরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপরে আরও অনেকে পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই দক্ষিণ মেরুতে পৌছিতে সমর্থ হন নাই। ১৯০৫ সালে একজন লোক দক্ষিণ মেরুর ৫৪০ মাইল নিকটে গিয়াছিলেন, এতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞাত এই সর্ব্ব দক্ষিণ সীমা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে আর এক জন লোক ইহার দক্ষিণে আরও চারি শত মাইলের উপরে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম লেপ্টেনাণ্ট স্যাক্লটন। আয়র্লণ্ড দেশে ইঁহার জন্ম হয়। লেপ্টেনাণ্ট ম্যাক্সটনের বয়স এখন ছত্রিশ বৎসর হইয়াছে। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে লণ্ডন হইতে নিমরড নামক জাহাজে তিনি দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে যাত্রা করেন। তখন সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা দিয়া বিদায় দেন। কেপকলনি এবং নিউজিলণ্ড হইয়া ১৯০৮ সালের প্রথমে তাঁহারা কেপ রইডএ পৌছেন। ইহার দক্ষিণে জলপথে যাইবার আর পথ নাই। এখানে ষ্টীমার রাখিয়া তাঁহারা পদব্রজে দক্ষিণ মেরু যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আয়োজন করিতে অনেক সময় লাগিল; অবশেষে ১৯০৮ সালের ২৯ অক্টোবর সমুদয় বন্দোবস্ত হইলে তিনি তিন জন সঙ্গী লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বরফের উপরে চলার গাড়ী চারিখানা, ছোট ছোট চারিটী ঘোড়া এবং ৯১ দিনের উপযোগী

খাদ্য লইলেন। এই সরঞ্জাম লইয়া তাঁহারা যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহাদিগকে অনেক বিপদ ও প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সেখানে বরফ জমিয়া তত কঠিন হয় নাই, এই পথে হাঁটা অতিশয় বিপজ্জনক, এবং বেশী বেগেও যাওয়া যায় না। তাহার উপর মাঝে মাঝে বরফের মধ্যে গহ্বর আছে, তাহার মধ্যে পড়িলে আর পরিত্রাণের আশা নাই। এইরূপ পথে তাঁহারা যথাসম্ভব সাবধানে চলিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে আড্ডা করিয়া ফিরিবার সময়ের জন্য খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া গেলেন। ২৬শে নবেম্বর তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে মানুষ যতদূর আসিয়াছিল, সেই স্থান পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন। এখন তাঁহারা যেখান দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেখানে সৃষ্টির প্রথম হইতে কোনও জনমানব পদার্পণ করে নাই। যখন সঙ্গের খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া গেল, তখন তাঁহারা এক একটী করিয়া ঘোড়া মারিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একটী ঘোড়া মারিয়া তাহার কতক মাংস রাখিয়া বাকী লইয়া অগ্রসর হইলেন; বেশী দিন চালাইবার জন্য অল্প অল্প করিয়া খাইতে লাগিলেন। ৩রা ডিসেম্বর তাঁহারা চারি হাজার ফুট উচ্চ একটী পর্ব্বতের উপর উঠিলেন, এইং সেখান হইতে মেরুপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড বরফস্তূপের উপর দিয়া সোজা পথ দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহাদের সঙ্গে আর একটী মাত্র ঘোড়া অবশিষ্ট আছে। সেই ঘোড়াটী লইয়া তাঁহারা বরফের উপর দিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এখানে পদে পদে বিপদ ঘটিতে লাগিল। বরফের মধ্যে অসংখ্য গর্ত্ত ছিল। ৭ই ডিসেম্বর তাঁহাদের সঙ্গের ঘোড়াটী একটী গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল, তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল না। ঘোড়াটীর সঙ্গে একখানি গাড়ী এবং একজন লোকও যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অতিকষ্টে তাহাদিগকে রক্ষা করা গিয়াছিল। তাঁহাদের খাদ্য দ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল; কিছু দিন হইতে তাঁহারা যত দূর কম খাইয়া বাঁচা সম্ভব, তাহাই খাইতেছিলেন। অপর দিকে শীতে তাঁহাদের অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। এত উচ্চ স্থানে শীত অতিশয় বেশী; ঘুমাইবার জন্য এক প্রকার থলে প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মধ্যেও তাঁহারা হিমে অস্থির হইলেন। ৬ই ডিসেম্বর তাঁহারা ৮৮ ডিগ্রী ৮ মিনিট অংশে পৌঁছিলেন। এখানে তাঁহারা এক ভীষণ তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। দুই দিন তাঁহারা তাঁবুর বাহির হইতে পারিলেন না। ৯ই ডিসেম্বর যখন ঝড় কিছু থামিল, তখন তাঁহারা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন; আর অগ্রসর হওয়া চলিবে না; কারণ তাঁহারা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের খাদ্যও শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন তাঁহারা সেখানে তাঁবু রাখিয়া রিক্ত হস্তে যত দূর সাধ্য বেগে অগ্রসর হইলেন; পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া যেখানে পৌঁছিলেন, সেখানে সম্রাজ্ঞী আলেকজান্ড্রা প্রদত্ত ইংলণ্ডের নিশান প্রোথিত করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। এই স্থানটী দক্ষিণ মেরু হইতে ১১১ মাইল দূরে। ফিরিবার পথেও তাঁহাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। প্রায়ই যে সব আড্ডায় তাঁহারা কিছু কিছু খাদ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের সঙ্গের খাবার ফুরাইয়া যাইত। ২৬ জানুয়ারি যখন তাঁহারা আড্ডা হইতে ৩০ মাইল দূরে, তখন তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী একে বারে নিঃশেষ হইয়া গেল। তাঁহারা দেড় দিন অনবরত চলিতে লাগিলেন, এবং এই সময়ের মধ্যে একটু চা ভিন্ন আর কিছু খাইতে পান নাই। আড্ডা হইতে যখন আধ মাইল দূরে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহারা এক বারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; আর নড়িতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে এক জন একটু শক্ত ছিলেন; তিনি আড্ডায় গিয়া কিছু খাদ্য আনিলেন, সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া কিছু বল হইলে সকলে মিলিয়া আড্ডায় গেলেন। এমনি করিয়া পথে অশেষ ক্লেশের পর ১লা মার্চ্চ তাঁহারা ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহারা লণ্ডনে ফিরিয়াছেন। লণ্ডনে লোকে লেপ্টেনাণ্ট স্যাকলটনকে বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

সার টাইটস্ সল্ট।

তোমাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত এই রকম বিশ্বাস আছে যে, দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলে এবং সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, কখনও জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। কিন্তু এ ধারণাটা সকল সময়ে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কখনও কখনও দেখা যায় যে, কোনও কোনও ব্যক্তি অতি দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং অতি সামান্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াও একান্ত পরিশ্রম ও সাধুতা দ্বারা জীবনে অসাধারণ উন্নতি ও বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আজ তোমাদিগকে এই রূপ এক জন লোকের কথা বলিতেছি।

ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার নগরে একজন দরিদ্র লোকের ঘরে সার টাইটস্ সল্ট জন্ম গ্রহণ করেন। গরীব লোকের ছেলে বলিয়া সল্টের বাল্যকালে বিদ্যালয়ে গিয়া লেখা পড়া শিক্ষার সুযোগ ঘটে নাই। আমাদের দেশে ভেড়ার লোমে কম্বল প্রস্তুত হয়, তাহা তোমরা জান। কাশ্মীর ও তিব্বতের ছাগলের লোমে সূতা তৈয়ারি করে, সেই সূতাতে শাল প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে ভেড়ারই মত এক প্রকার ছোট জন্তু আছে, ইহাদের আলপাকা বলে। এই আলপাকার লোমে যে কাপড় তৈয়ারী হয়, তাহাকে আলপাকা কাপড় বলে। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত আলপাকা কাপড়ের জামা গায়ে দিয়া থাক। আলপাকা এবং আরও অনেক প্রকার পশুর লোম বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া কল কারখানার সাহায্যে ইউরোপে নানারূপ কাপড় প্রস্তুত হয়।

সল্ট যৌবন কালে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের নিমিত্ত পশম ধোয়া এবং ঝাড়ার কার্য্যে নিযুক্ত হন। এ অতি সামান্য কাজ। ইহাতে উন্নতি হইতে পারে যে, তাহা হয়ত তোমরা বুঝিতেও পার না। কিন্তু যে কাজ করা যায়, তাহাই যদি ভালরূপে করা হয়, তবে তাহা হইতেই অনেক উন্নতি হইতে পারে। সল্ট পশম ধোয়ার কাজে নিযুক্ত হইয়া এরূপ যত্নে তাহা করিতে লাগিলেন, যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই পশমের দোষ গুণ নির্ণয় করিতে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন।

তেত্রিশ বৎসর বয়সে কোনও কার্য্য উপলক্ষে সল্ট একবার লিভারপুল নগরে গমন করেন। সেখানকার একটা বন্দরে তিনি রাশীকৃত আলপাকা পশম দেখিতে পান। ঐ পশম বহুদিন গুদামে পড়িয়া থাকায়, উহা দেখিতে এরূপ বিশ্রী হইয়া গিয়াছিল যে উহার অধিকারী এ গুলিকে কার্য্যের অযোগ্য মনে করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। সল্ট ইহা হইতে কিছু পশম লইয়া আসিলেন এবং উহা ঝাড়িয়া ও আঁচড়াইয়া দেখিলেন যে উহা কাজের অযোগ্য নহে। ভালরূপে কাজে লাগাইতে পারিলে উহার দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। তিনি এই সমুদয় আলপাকা পশম অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সল্টের পিতা ও বন্ধুগণ এ বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐ পশম কিনিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। তাঁহারা এ কথাও বলিলেন, যে, এই পশম কিনিলে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু সল্ট পশম সম্বন্ধে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, যে, তিনি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের নিষেধ সত্ত্বেও পশম ক্রয় করার লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

লিভারপুল নগরে গিয়া তিনি তিন শত গাঁইট পশম নামমাত্র মূল্য দিয়া কিনিলেন। তৎপরে অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া ও নিজে অনেক পরিশ্রম করিয়া অধ্যবসায় সহকারে এই সকল পশম ঝাড়িয়া বাছিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিলেন। সল্টের এই পরিশ্রম সফল হইল। ইহা বিক্রয়ের দ্বারা তিনি বহু অর্থ লাভ করিলেন। এই উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা তিন বৎসরের মধ্যে তিনি আরও বহু শত গাঁট আলপাকা আনাইয়া একটি বৃহৎ কারখানা খুলিলেন, গ্রেট্‌ব্রিটন ও জার্ম্মানী হইতে শ্রমজীবী আসিয়া তাঁহার নিকট কার্য্য প্রার্থী হইতে লাগিল। ইরূপে শত শত লোককে কার্য্য ও অর্থের দ্বারা তিনি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

সল্টের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তিও বাড়িতে লাগিল। তিনি লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভাসদ্ হইলেন এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ব্যারোনেট পদবী প্রাপ্ত হইলেন। কত সামান্য অবস্থা হইতে সল্ট কত উন্নত অবস্থা লাভ করিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক মাত্র পরিশ্রম ও ঐকান্তিক যত্নই সল্টের এই উন্নতির হেতু।

সল্ট কেবল যে আর্থিক উন্নতি ও পার্থিব খ্যাতি লাভ করিলেন, তাহা নহে; তিনি জীবনের সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া এক জন প্রকৃত মহৎ লোক বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহার জীবনের সৎকার্য্যাবলী আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সল্ট যেমন পরিশ্রমী তেমনই মিতব্যয়ী ছিলেন। কোনও দ্রব্য বৃথা অপচয় করা, তিনি একেবারে ভালবাসিতেন না। যখন তিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হইয়া চারিদিকে মুক্ত হস্তে দান করিতেছেন, তখনও তিনি এক টুক্রা ছেঁড়া কাগজ ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে বলিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া দিতেন। অতি প্রত্যূষে বিছানা হইতে উঠিয়া তিনি কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার দেশের লোকেরা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, যে, অপর সাধারণের ঘুম না ভাঙ্গিতেই সল্ট সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া ফেলেন। এটি কিন্তু উপহাসের কথা নহে। তিনি সময় সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক ছিলেন। সমুদয় কার্য্য যথাকালে সম্পন্ন করিতেন, উচ্চতর রাজ সম্মান লাভের পরেও, তাঁহার মনে কিছুমাত্র অহঙ্কার হয় নাই। স্বাভাবিক সদাশয়তা গুণে তিনি সকলকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। পথে গমন কালে যদি তিনি কোনও পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ শ্রমজীবী অথবা সন্তান কোলে লইয়া গমনে অক্ষম স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইতেন, তবে তখনই তাহাকে তাঁহার গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিতেন। এক দিন একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট ঝাঁটা বিক্রয় করিতে গেলে, তিনি তাহার সমস্ত ঝাঁটা ক্রয় করিয়া তাহাকে সে দিনের জন্য বোঝা বহার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন।

শ্রমজীবীদিগের হিতসাধন করা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি তাঁহার চারি সহস্র শ্রমজীবীর বাসের জন্য যে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কার্য্য। এই প্রকাণ্ড ভবন যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনই স্বাস্থ্যকর। প্রায় পনের লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হয়। তিনি শ্রমজীবীদের সুখে থাকিবার জন্য কেবল বৈঠকখানা, শয়নাগার, রন্ধনশালা, ভাণ্ডার, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া যে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। তাহাদের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়, উপাসনালয় পুস্তকালয় প্রভৃতিও করিয়া দিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য সকল প্রকার উন্নতির প্রধান সহায় জানিয়া তিনি শ্রমজীবীদের নয়ন মনের তৃপ্তি সাধনার্থ ফলের বাগান, ফুলের বাগান ভ্রমণ উদ্যান করিয়া দিয়াছিলেন। বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্য দানের ব্যবস্থা করিয়া একটি আতুরাশ্রমও করিয়া দেন। বৃদ্ধ ও অসমর্থ লোকদের অন্নদানের জন্য তিনি পঁয়তাল্লিশটি দাতব্যাশ্রম খুলিয়াছিলেন। সদাশয় সল্ট সপরিবারে বৎসরে একদিন করিয়া এ দরিদ্রদিগের সঙ্গে আনন্দে জলযোগ করিতেন।

ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে যে, এমন একজন লোকহিতৈষী মহানুভবের মৃত্যুতে দরিদ্র লোকেরা অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। বড় লোকের সম্বাদ বড় লোকেরাই রাখিয়া থাকেন, দরিদ্রেরা অনেক বড় লোকের নামও জানে না। তিনিই যথার্থ বড় লোক, যাঁহাকে দরিদ্রেরা জানে ও মানে। মহাত্মা সল্ট যথার্থ বড় লোক ছিলেন, তাই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সময় বহু সহস্র দীনদুঃখী চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে মৃতদেহের অনুগমন করিয়াছিল।

মহাত্মা সল্ট কিরূপ দরিদ্র লোকের সন্তান হইয়া এবং কত সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল শ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতা, সাধুতা দ্বারা কত বড় লোক হইয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই ভাবিয়া দেখ।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল।

ব্রহ্মপুত্র-স্নান।

(৭৭পৃষ্ঠার প্রকাশিত অংশের পর)

তখনই স্নান আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির রৈ রৈ ব্যাপার পথে পথে ঘাটে ঘাটে ঠেলাঠেলির এক অপূর্ব্ব দৃশ্য জমিয়া উঠিয়াছে।

স্নানের পূর্ব্বে আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীর্থের শোভা দেখিতে লাগিলাম। সারাটী তীর্থের মধ্যে প্রেমতলায় বৈরাগী বাবাজীদের প্রেমের হাট বসিয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষের তলে প্রায় ২০০।৩০০ বাবাজী মিলিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমসংকীর্ত্তনে মত্ত। খঞ্জনীর তালে তালে তাল রাখিয়া বাবাজীদের চৈতনচুট্‌কি শুদ্ধ মাথাটী নাড়া দিতেছে, ভাবের ঘোরে কোন বাবাজী উল্লম্ফনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে।

প্রেমতলা ছাড়াইয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া মাত্রই একটী বিচিত্র সঙ্‌ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। বাবাজী পাকাচুল ও দাড়ি গোঁফের পরচুলা পরিয়া সাধুটীর মত চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ আছেন। পুণ্যলোভাতুর বহুযাত্রী ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে মাথা লুটাইতেছে, কেহ কেহ পয়সা ভেট দিয়া সাধুর কৃপা আকর্ষণে প্রয়াস পাইতেছে। পয়সাটী পড়িতে না পড়িতেই সাধুর এক চেলা কিন্তু সযত্নে তাহা ঝুলিস্থ করিতেছে।

আমাদের তীক্ষ্ণ চাহনি সাধুর পাকা চুলের মধ্য হইতে তাহার সটাক কাঁচা মাথাটী সহজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। আমরা বাবাজীর ভণ্ডামী ধরাইয়া দিবার উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে সোরগোল করিয়া উঠিলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া সশিষ্য প্রভুপাদ তখন সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে চম্পট দিলেন।

এহেন সাধুকে তাড়াইয়া ঘাটের দিকে রওনা হইতেই এ স্থানের প্রসিদ্ধ "হরিবোলার দল" আমাদের নেত্র গোচর হইল। স্নানপর্ব্ব উপলক্ষে নাঙ্গলবন্ধে গুণ্ডার ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইয়া থাকে। গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে ৬০।৭০জন যাত্রী মিলিয়া এক একটী দল সংগটন করে। ইহাদের মধ্যে পুরুষ যাত্রিগণ হাতে হাতে শিকলি বাঁধিয়া রমণী যাত্রিদিগকে ঘেরিয়া ধরে এবং ঐ অবস্থায় সকলে উচ্চকণ্ঠে "হরিবোল" বলিতে বলিতে স্নানাদি সমাধা করিয়া আইসে। এইরূপ এক একটা দলকে "হরিবোলার দল" বলে। পূর্ব্ব হইতেই নাঙ্গলবন্ধের হরিবোলার দলের প্রসিদ্ধি শুনিয়া আসিতেছিলাম, অধুনা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া উহাদের সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিলাম।

একটা হরিবোলার দলের পিছন লইয়া আমরা এবারে স্নানার্থ ঘাটে নামিলাম। ফুল বিল্বপত্র হাতে লইয়া ব্রাহ্মণের দল ঘাটের সিঁড়িতে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদিগকে দেখিবামাত্রই এক জন ছুটিয়া আসিয়া আমাদের হাতে কয়েকটা করিয়া ফুলবিল্বপত্র গুঁজিয়া দিল এবং এক নিঃশ্বাসে বলিতে লাগিল "পড়, বাপু, মন্ত্র পড়

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ, শান্তনোঃ কুলনন্দনঃ
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥"

ব্রাহ্মণের এ মন্ত্রটী পড়িবার পক্ষে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, ব্রাহ্মণটীরও সেজন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম না। কেন না, আমরাও হাঁ হুঁ করিয়াই মন্ত্রটী একরূপ শেষ করিলাম, ব্রাহ্মণবটু ও যৎকিঞ্চিৎ তাম্রমুদ্রা দক্ষিণা পাইয়া অপর যাত্রীর সন্ধানে চলিল।

এই স্থানে স্নান সারিয়া ঘাটে উঠিতে না উঠিতেই অপর এক যাত্রীর মুখে খবর পাইলাম, ব্রহ্মপুত্রে দুই ঘাটে স্নান করিলে সশরীরে স্বর্গলাভ হয়। স্বর্গ লাভের এমন সুযোগের সন্ধান পাইয়া আমরাও তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ঘাটের সন্ধানে চলিলাম এবং স্বর্গলাভের আশায় বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ঘাটে ডুবাডুবি করিতে লাগিলাম। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ দুই ঘাটে স্নান করিয়াও আমরা কিন্তু সে দিনে সশরীরে স্বর্গলাভের কোনই সম্ভাবনা দেখিলাম না, বরঞ্চ অল্পক্ষণ পরে সশরীরে ঢাকার বাসায়ই যে প্রত্যাগত হইয়াছিলাম, আজও তাহা সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

শীতের পল্লী।

প্রভাতে।

ঘন কুয়াসার রাশি আজি এ ধরাগায়।
তপন করলেখা
নাহি ত যায় দেখা,
সে কি গো শীতভয়ে ঘুমায়ে রল হায়।
কাকের কা কা ধ্বনি,
আর ত নাহি শুনি,
পাখীরা ঘুমঘোরে গাহিতে নাহি চায়।
নীহার হিমজল
বরষি অবিরল,
নীরবে তরুলতা আপন দুঃখ জানায়।
কল্‌কি হুকা হাতে,
পান্‌তা বাঁধা পাতে,
অলস শয্যা ছাড়ি কৃষক মাঠে যায়।
রাখাল শীত ভুলি,
লইয়া গরুগুলি,
শিশির মাখা পথে আপন মনে ধায়।
নিঠুর বেত ভয়ে
বৈয়ের বোঝা লয়ে,
প'ড়োরা লেপ ছেড়ে ইস্কুল পানে যায়,
আল্‌সে লোক যত
জিজ্ঞাসে "রাত কত ?"
সকাল হয়েছে শুনে আবার ঘুমায়।
ঘন কুয়াসায় ঢাকা প্রকৃতি ধরা গায়।

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল,

		টী	টাকা
১।	মহিষ	৩	৫১৲
	পাঁটা	৮	২৲
	কপোত	৪৯	৭৲
		৬০টী	৬০ টাকা

২। আমরা নারায়নগঞ্জ যাইতেছিলাম, 'দীন' বাবু ও আমি 'নদী' পার হইব হইব এমন সময় 'সহসা' প্রবল ঝড় আরম্ভ হওয়ায় খেয়া নৌকায় উঠিতে আমার 'সাহস' হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে 'রাম' একটি 'মরা' নিয়া যাইতে দেখিলাম। আমরা কমলাঘাট কার্ত্তিক বারুণীতে গেলাম। 'রাম'প্রসন্ন তাহার 'মার' জন্য ১ খানা নামাবলী 'রাস'মোহন ১খানা 'সরা' প্রবোধ কাগজের তৈয়ারী 'জবা' ফুল 'বাজ' ও 'সালিক' পাখী এবং 'খলিসা' মাছ কিনিল। নগেন বাবু নগেন সেনের ১শিশি তৈল ২টা 'তাল' এবং বেনে দোকান হইতে কতকগুলি শুষ্ক 'লতা' লইলেন। আমি একখানি মুকুল লইয়া রায় বাহাদুরের বাড়ীর 'মাসী'মাতাঠাকুরাণীকে দিলাম। তাঁহার আনন্দের 'সীমা' রহিল না।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীকরুণাচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুশীলকুমার দাস, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীগুরুকান্ত দাস, শ্রীসুধানলিনী কান্ত দে, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত গুপ্ত, শ্রীমন্মথ মথন সরকার, শ্রীসীতাংশুকুমার রায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্র প্রসাদ রায়, শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস, Members boys' own club, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ, শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী, শ্রীমতী পুটু রাণী, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীপ্রেমনীহার রায়, N. N. Dey.

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীসোমনাথ মৈত্র প্রেরিত।)

১। রাম শ্যামকে বলিল, "ওহে শ্যাম, তোমার আম হইতে যদি আমাকে দশটি আম দাও তাহা হইলে আমার আমের সংখ্যা তোমার আমের সংখ্যার দুই গুণ হইবে।" শ্যাম এই কথা শুনিয়া বলিল, "ভাই রাম, তোমার আম হইতে যদি আমাকে দশটি দাও তাহা হইলে আমার আমের সংখ্যা তোমার আমের সংখ্যার তিন গুণ হইবে।" 'মুকুলের' পাঠক পাঠিকাগণ বলিয়া দিউন ত রাম ও শ্যামের প্রত্যেকের নিকট কয়টি করিয়া আম ছিল।

(শ্রীজগদীশচন্দ্র ভৌমিক প্রেরিত।)

২। হাত নাই পা নাই গায় পড়ে খাড়ু।
মুখ আছে জিহ্বা নাই সে খায় লাড়ু॥
বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্ট সে প্রাণি হিংসা করে।
নাভি ধরে টান দিলে বিষম ডাক ছাড়ে॥

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

রমেশ চন্দ্র দত্ত

মুকুল
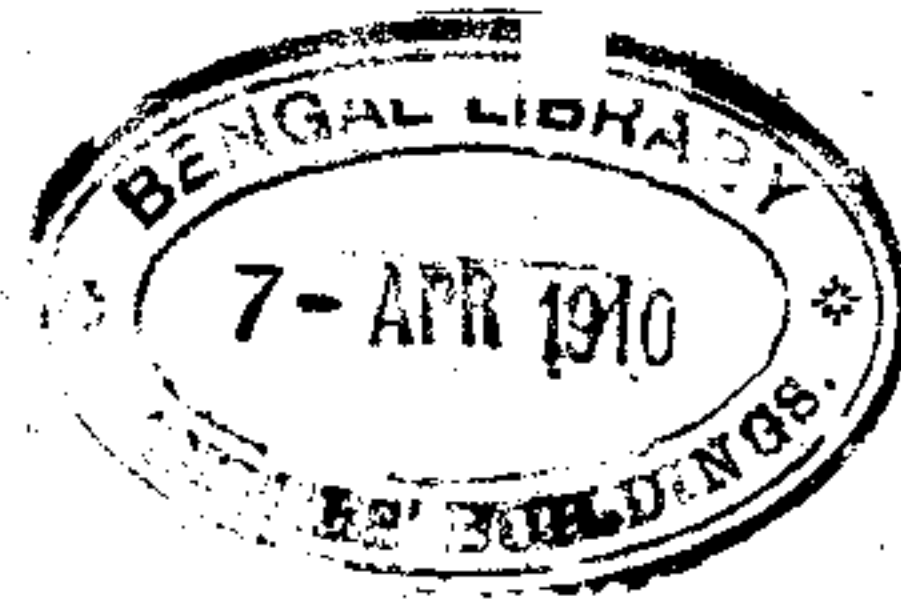
১৫শ ভাগ। } পৌষ, ১৩১৬। { ৯ম সংখ্যা।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

ইতিহাসে দেখা যায়, যে এক একটী দেশে এক এক সময়ে এক সঙ্গে অনেক বড় লোকের জন্ম হয়। নদী বা পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া থাকিলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, যে এক এক ঝাঁক মাছ এক সঙ্গে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তেমনি সকল দেশের ইতিহাসে এক এক সময় এক একটী বড় লোকের ঝাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যেন এমনি একটী বড় লোকের ঝাঁক আসিয়াছিলেন। একে একে সে ঝাঁকের অনেকেই ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। সম্প্রতি সেই দলের আর এক জন পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। গত ৩০ নবেম্বর বরোদা রাজ্যের রাজধানীতে ভারতের সেই কৃতী সন্তান প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা অবশ্য ইতি পূর্ব্বেই সে শোক সংবাদ শুনিয়াছ।

১৮৪৮ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা নগরীতে প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। আহিরী টোলার দত্ত পরিবারেরা সমৃদ্ধি এবং প্রতিভার জন্য বিখ্যাত। এই পরিবারে অনেকে আপনাদের প্রতিভা গুণে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবি কুমারী তরু দত্ত এই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই অল্পবয়সেই ইংরাজীতে তিনি এমন কতকগুলি কবিতা লিখিয়া গিয়াছিলেন, যাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ এবং স্মলকজ কোর্টের বিচারক রসময় দত্তও এই পরিবারের লোক। রমেশচন্দ্রের খুল্লতাত শশিচন্দ্র দত্ত এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি ইংরাজীতে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবাসীদিগের জন্য এই পদ সৃষ্টি করিলে যে সকল বাঙ্গালী প্রথমে ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছিলেন, ঈশানচন্দ্র দত্ত তাঁহাদের মধ্যে একজন। বাল্যকালে রমেশচন্দ্র পিতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে গিয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; তখন হইতে রমেশচন্দ্র তাঁহার খুল্লতাত শশিচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতেই রমেশচন্দ্রের পাঠে অনুরাগ ও উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের

শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ১৮৬৪ সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, তৎপরে ১৮৬৬ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভ করেন। বি, এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই রমেশচন্দ্র তাঁহার বন্ধু বিহারীলাল গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা এক জন উন্নতিশীল সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড যাইতেছেন শুনিয়া রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলালেরও ইংলণ্ড যাইতে প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবকদের মত হইবে কিনা সন্দেহ জানিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই বিলাত যাওয়া স্থির করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজের ও তাঁহার দুই বন্ধুর জন্য ষ্টীমারে একটী কুঠরী ভাড়া করিলেন। ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ্চ রমেশচন্দ্র আত্মীয় স্বজনের অগোচরে বন্ধুদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে সেটী একটী স্মরণীয় দিন। সেদিন যে তিনটী বাঙ্গালী যুবক অলক্ষিতভাবে স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া তিন বন্ধুই সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পর বৎসরের পরীক্ষায় তিনজনেই কৃতকার্য্য হইলেন। সে বৎসর তিন শতের অধিক ইংরাজ যুবক সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় এবং সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি অনেক বিখ্যাত লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ভারতহিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ বক্তা জন ব্রাইট এবং হেনরী ফসেটের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বিখ্যাত দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সের বক্তৃতাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি, সুইটজারল্যাণ্ড, এবং ইটালীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে তাঁহারা এক বিপদে পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে ফ্রান্সে এক রাষ্ট্র বিপ্লব চলিতেছিল। তাঁহারা প্যারিসে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বিদ্রোহীদলের লোক ভাবিয়া বন্দী করা হয়; কর্ত্তৃপক্ষগণ এইপ্রকার সন্দেহে অনেক লোককে তখন বিনা বিচারে গুলি করিয়া মারিতেছিলেন। সে দিনের মত তাঁহাদিগকে হাজতে রাখা হইল। পর দিন তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের প্রজা প্রমাণ করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

সার্দ্ধ দুই বৎসর বিদেশে কাটাইয়া ১৮৭১ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তখন হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করেন। ১৮৮৩ সালে তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তৎপূর্ব্বে কোনও ভারতবাসীকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয় নাই। শুনা যায়,যে তাঁহাকে এই পদ দেওয়া হইবে কি না হইবে এই কথা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। অনেকে মনে করিতেন, যে ভারতবাসীর হস্তে একটী জেলার ভার দিলে কাজ ভাল হইবে না। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম হইতে এরূপ দক্ষতার সঙ্গে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধান করিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে জেলার ভার দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। তিনিও বহু বৎসর সুচারু রূপে এই দায়িত্বভার বহন করেন। ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যে একটি অলীক অপবাদ ছিল, যে তাঁহারা শাসনকার্য্যে সুপটু নহেন, তাহা তাঁহার কার্য্যে চির দিনের মত দূর হইয়াছে। ১৮৮৩ সালে মহামতি লর্ড রিপন, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার কার্য্যের কথা ইংলণ্ডের লোকের জানা উচিত; তাহা হইলে ভারতবাসীদের শাসন বিভাগের উচ্চপদের যোগ্যতা বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিবে না।" ইহার পরে তিনি চারিটী জেলার কমিশনারের পদেও উন্নীত

হইয়াছিলেন। ভারতবাসীকে সেই সর্ব্বপ্রথম অতি উচ্চ পদে নিয়োগ। তখনও অনেকে সন্দিহান হইয়াছিলেন যে একজন বাঙ্গালীকে তিন চারি জন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপরে এই উচ্চপদ দেওয়া হইবে কিনা। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা যে বাঙ্গালী বলিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত কোনও দিন তাঁহার ন্যায্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হন নাই। গবর্ণমেণ্ট বার বার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দক্ষতার জন্য তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার রাজকার্য্যে দক্ষতার বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। রমেশচন্দ্রের মহত্ত্ব শাসনকার্য্যে দক্ষতায় আবদ্ধ নহে। রাজকার্য্যে দক্ষতা আরও অনেকে দেখাইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে আরও কত জন দেখাইবেন। রমেশচন্দ্রের মহত্ত্ব অন্যত্র।

রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষত্ব তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা। সাধারণতঃ লোকে উচ্চপদ লাভ করিয়া অহঙ্কারে বা কার্য্যবাহুল্যে তাহাতেই জড়িত হইয়া পড়েন। কিন্তু রমেশচন্দ্রের জীবনে দেখি,যে পদ গৌরব ও কার্য্যবাহুল্যের মত জ্ঞানস্পৃহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। রমেশচন্দ্র প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়,যে কর্ত্তব্য কার্য্যে কোনও দিন অবহেলা করেন নাই। কিন্তু ইহা যে তাঁহার নিকট জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল না, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। জ্ঞান চর্চ্চাকে তিনি পদৈশ্বর্য্য ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। সেই জন্য গুরুতর কার্য্যভারের মধ্যে তিনি এত অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছিলেন এবং এত পুস্তক রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। তোমরা বোধ হয় রমেশচন্দ্র দত্তের অনেক পুস্তক পড়িয়াছ। ইংরাজী এবং বাঙ্গলাতে তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমুদায় পুস্তকের অধিকাংশই ইতিহাস বিষয়ক। রমেশচন্দ্র দত্তকে আমাদের দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এক খানি সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান যুগের ইতিহাসও তিনি কেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রণীত চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসেই প্রকাশিত। রমেশচন্দ্রের জীবনসন্ধ্যা, জীবন প্রভাত, মাধবীকঙ্কণ ও বঙ্গবিজেতা বাঙ্গলাভাষায় শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তৎপরে তিনি ভারতের ইংরাজশাসন কালেরও সুবিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইংরাজ শাসনকালে ভারতের শিল্পবাণিজ্যের কি উন্নতি অবনতি হইয়াছে তিনি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য তাঁহাকে বহু পুরাতন পুস্তক, সুদীর্ঘ গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল। যখন তাঁহার প্রণীত বহু পুস্তকের কথা স্মরণ করা যায় তখন সর্ব্বাগ্রে মনে হয় তিনি গুরুতর রাজকার্য্যের মধ্যে কি করিয়া এত পড়িতে এবং লিখিতে সময় পাইয়াছিলেন। তাহার উত্তর এই যে, জ্ঞানালোচনা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। সারাদিন রাজকার্য্য করিয়া আসিয়া দীর্ঘ-রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া পাঠ করিতেন। জেলার দূরস্থ স্থান সকল পরিদর্শন করিতে যাইবার সময় সঙ্গে রাশি রাশি পুস্তক লইতেন। নৌকা বা গাড়ীতে বসিয়া সেই সকল পাঠ করিতেন। কার্য্যের মধ্যে একটু অবকাশ পাইলেই তিনি তাহা অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। সাহিত্য সেবাতেই তাঁহার মন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কম্পাশের কাঁটাটী ছাড়িয়া দিলেই তাহা যেমন উত্তর দিগাভিমুখী হয়, রমেশচন্দ্রের মন তেমনি ছাড়া পাইলেই পুস্তকের দিকে ছুটিত। তাঁহার সমুদয় অবকাশ তিনি জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। প্রায় প্রতি সাত আট বৎসর অন্তর তিনি দীর্ঘবিদায় গ্রহণ করিতেন, এবং সেই সময় সাহিত্য সেবায় যাপন করিতেন। এইরূপ এক ছুটীর সময় তিনি ঋগ্বেদের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন। এখন পর্য্যন্ত তাহাই সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের একমাত্র বঙ্গানুবাদ। সে সময়ে অনেক গোঁড়া হিন্দু তিনি শূদ্র হইয়া বেদের অনুবাদ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে অনেক গালি দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া

বহু পরিশ্রমে এই সুমহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অবাধে জ্ঞানচর্চ্চা এবং দেশের সেবা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হন, তখন তিনি উচ্চ বেতনে কমিশনারের কাজ করিতেছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি আরও সাতবৎসর কাজ করিতে পারিতেন, এবং হয়ত উচ্চতর পদেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অনায়াসে সে লোভ সম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সামান্য পেনশনে রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম সুখ ভোগ করেন নাই। সমান পরিশ্রমে তিনি নানাভাবে দেশের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৯৭ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রায় ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজপুরুষ ও জনসাধারণকে ভারতের অভাব সকলের বিষয় জানাইয়া তাহার প্রতিবিধান করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; এবং এবিষয়ে তিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ভারতের করভারপ্রপীড়িত কৃষকদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, যে উত্তরোত্তর জমির কর বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। প্রতি দশ পনর বৎসর অন্তর গবর্ণমেণ্ট এবং জমিদারেরা জমির কর বৃদ্ধি করেন; এইরূপে এক এক স্থানে জমির খাজনা এত গুরুতর হইয়াছে,যে হতভাগ্য কৃষকেরা সারা বৎসর দারুণ পরিশ্রম করিয়া সামান্য উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে মুসলমান রাজত্বকাল হইতে ইংরাজ শাসনকালে জমির কর অনেকগুণ বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর আরও অনেক ত্রুটী তিনি ইংলণ্ডের লোকের নিকটে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহার বহুপরিশ্রমের কথঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ ১৮৯৯ সালে তাঁহাকে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে বরণ করেন। ১৯০৪ সালে বরোদা রাজ্যের সুশিক্ষিত এবং সুহৃদয় অধিপতি সায়াজীরাও গাইকোয়ার স্বীয় রাজ্যের রাজস্ববিভাগের সংস্কার ও উন্নতির আশায় রমেশচন্দ্র দত্তকে রাজস্বসচিবের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, রমেশচন্দ্র এই পদ গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসরে বরোদা রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া মহারাজা এবং জনসাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতসচিব ভারতবর্ষের শাসনসংস্কার বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করেন, এবং রমেশচন্দ্র দত্তকে তাহার অন্যতম সভ্যপদ প্রদান করেন। এই কমিসনের কার্য্য অবসানান্তে মহারাজ গাইকোয়ার তাঁহাকে বরদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; সকলে আশা করিয়াছিলেন, যে এই সুশিক্ষিত স্বাধীন রাজার অধীনে তিনি আপনার হৃদয়ের চির পোষিত শাসন আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। কিন্তু ছয়মাস যাইতে না যাইতে গত ৩০শে নবেম্বর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষে শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। তিনি যে কর্ত্তব্যপরায়ণ উন্নত জীবনের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবে।

অক্ষয় ভাণ্ড।

সে অনেক দিনের কথা, পৃথিবীর তখন তোমাদিগের মত ছেলে বয়স, কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা, ফল ফুলে ভরা, নদীর কুলু কুলু তান আর পাখীর সুমধুর গানে মনোহর। আকাশ তখন অতি সুন্দর নীল ছিল, ঠিক যেন ছোট ছেলের চোখের মত, আর সেই আকাশে কচি মুখের সুধামাখা হাসির মত দিনে রাতে সূর্য্য চন্দ্রের আলো শোভা করে থাকৃত। সে সময় গ্রীস দেশের একটি কোণে একটি ছোট গ্রামে দুই বুড়োবুড়ি বাস করিত,

গ্রাম খানি বড় সুন্দর, এক সময়ে সেখানে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল, ক্রমে সেই হ্রদটিতে চড়া পড়ে জমি হয়, ক্রমে চাষ বাস হতে আরম্ভ হয়। হ্রদের উপর পলি-পড়া জমিতে অতি অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য হত, ফল ফুল শাকসবজি যথা সময়ে সবই অপর্য্যাপ্ত হ'ত। গ্রামের লোকের কোনই অভাব ছিল না, তাদের গোলাভরা ধান, ঘরে দুধাল গরু, আঙ্গুরের লতায় গুচ্ছ গুচ্ছ রসাল আঙ্গুর, কিছুরাই অভাব ছিল না শুধু অভাব ছিল তাদের মনে দয়ার। এত সুখভোগ করেও তাদের মন নরম হয়নি, দুঃখীকে তারা কখনো এক মুঠো ভিক্ষা দিত না, বরং তাদের উপর অত্যাচার করিত, কুকুর লেলিয়ে তাদের লাঞ্ছিত করিত। এই সব দুষ্ট স্বভাব গ্রামবাসীদের মধ্যে সেই বুড়োবুড়ি দুটি লোক ভাল ছিল। তারা গ্রামের একটু দূরে এক পাশে এক খানি কুঁড়ে ঘরে বাস করত তারি পাশে তাদের ছোট ক্ষেত আর ছোট বাগান, তাদের ছেলে পিলে ছিল না। বুড়ো ফিলোমেন আপনার ক্ষেতে ও বাগানে কাজ করত, বুড়ি ঘর করণা করত, গরুটিকে দেখত, ঘরের দুধে ঘি মাখন মিষ্টান্ন কত কি তৈয়ারি করত। দুজনের দিন বেশ সুখে শান্তিঃেই কাটত! বুড়োবুড়ির বড় ভালবাসা ছিল, এক জন অন্যজনকে ছেড়ে দুদণ্ডও থাকতে পারত না; ফিলোমন ক্ষেতে কাজ সেরে বাড়ী ফিরবার জন্যে যেমন ব্যস্ত হ'ত, বুড়িও তার জন্যে তেমনি রাস্তা তাকিয়ে কেবলি ঘর বার করত। কাজ কর্ম্ম সেরে সন্ধ্যার সময় কিছু খেয়ে তারা দুজনে নিজেদের উঠানটিতে বসে সুখ দুঃখের কথা কইত, তখন চারিদিক হতে ফুলের গন্ধ ভেসে আসত, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র একে একে ফুটে উঠত। একদিন সন্ধ্যার সময় তারা এমনি বসে আছে, এমন সময় শুনতে পেলে গাঁয়ের ভিতর একটা ভারী গোলযোগ চলছে, ছেলেরা চীৎকার করছে, কুকুর খেউ খেউ করছে, তারা বুঝলে কোন গরীব লোক বোধ হয় এই সন্ধ্যার সময় ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হয়ে তাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছে তাই তাদের উপর এই অত্যাচার চলছে। দুয়ার খুলে দেখলে দুটি লোক এক জন প্রৌঢ়, অন্যটি তরুণ যুবক তাদের দিকে আসছে, পরণের কাপড় মলিন ও ছিন্ন, কিন্তু দুজনেরি আকৃতি বড় সুশ্রী; প্রৌঢ় লোকটি গম্ভীর, প্রশান্ত, অমায়িক, যুবকটি যেন মূর্ত্তিমান আনন্দ, এই যে কষ্ট, গ্রামবাসীদের অত্যাচার, তাতে মুখের হাসিটি একটুও ম্লান হয়নি। তাদের দেখে ফিলোমেন আর তার স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে সাদর অভিবাদন করে তাদের কুটীরে অনুগ্রহ করে সে রাতের জন্যে অতিথি হতে অনুরোধ করলে। ভদ্রলোক দুটি খুব খুসী হয়ে তাদের আতিথ্য স্বীকার করলেন; ফিলোমেন তাঁদের কাছে বসে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন, আর তাঁর স্ত্রী অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করতে গেলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ফিলোমেনকে বল্লেন, তোমাদের দয়া ও আতিথ্য দেখে বড় আনন্দ হল, তোমাদের প্রতিবাসীরাতো তোমাদের মত নয়, তারা কুকুর লেলিয়ে, ঢিল মেরে গাল দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল, তোমরা এমন জায়গায় থাক কেন? ফিলোমেন বল্লেন, এই আমার জন্মস্থান এই খানেই আমার কাজ আমার প্রতিবাসীরা দুঃখী গরীবের উপর যে অত্যাচার করে তারি প্রতীকার করবার জন্যে ভগবান বোধ হয় এখানে আমাকে রেখেছেন, আমিও গরীব আমার সাধ্য বড় অল্প, তবুও যা পারি করি। ফিলোমেনের উত্তর শুনে তাঁরা বড় খুসী হলেন। তরুণ যুবকটি বল্লে ঠিক বলেছ আমাদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সত্যি তার কিছু প্রতীকার আবশ্যক, গাঁয়ের ছেলে গুলত আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কাদায় ভরিয়েছে, কুকুর গুলো পর্য্যন্ত আমাদের ছাড়েনি এই দেখনা একেত আমার জুতা জোরাটির অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না, তাও টুকরা টুকরা করেছে। যাই হোক আমিও তাদের ছাড়েনি আমার লাঠি দিয়ে তাদের মুখে এম্নি মার দিয়েছি, বাছারা বহুকাল ভুলবেন না, লাঠি খেয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে লেজ গুটিয়ে পালাবার তখন পথ পায়নি। যুবকটির কথা শুনে মনে হল গ্রামবাসীরা যে তার উপর অত্যাচার করেছিল তাতে তার মনে একটুও আঁচড়ও লাগেনি, তাই আমোদ স্ফূর্ত্তি কিছুরি ব্যতিক্রম হয়নি। ছেলেটির

গঠন এমন হাল্কা, আর সে এমন চঞ্চল, যে তাকে দেখে মনে হ'ল যেন সে কষ্ট করে, চেষ্টা করে আপনাকে স্থির রেখেছে, না হলে সে কখন উড়ে চলে যেত।

তার বেশও অদ্ভুত, মাথায় টুপি আর পায়ের জুতোতে দুজোড়া পাখা, লাঠিটিও দেখতে নূতন রকমের, শিশু কাঠের লাঠি, তারই গায়ে এক জোড়া সাপ জড়িয়ে আছে কিন্তু এমন সুন্দর তৈরি, যে দেখে মনে হ'তে লাগল সাপ দুটি যেন জীবন্ত, থেকে থেকে এঁকে বেঁকে নড়ে চড়ে উঠছে। প্রৌঢ় ভদ্র লোকটির মুখে এমনি গম্ভীর প্রশান্ত মহিমার ভাব, যে সহসা তাঁর চোখচোখি করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। তাঁদের সঙ্গে ফিলোমেনের অনেক কথাবার্তা হ'ল প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বল্লেন, এখন যেখানে গ্রামটি রয়েছে, বহুকাল পূর্ব্বে সেখানে একটি হ্রদ ছিল না? ফিলোমেন বল্লেন ছিল শুনেছি, যদিও আমি বুড় হয়ে গেছি, তবুও সে হ্রদ আমি দেখিনি, আমার পিতা পিতামহদের কালের আগে ছিল বোধ হয়, কেননা বড় হয়ে অবধি আমিত এই গাছ পালা, এই ধানের ক্ষেত আর এই ছোট নদীটিকে এমনি দেখছি, তাঁদের কাছেও অন্য রকম কিছু শুনিনি, আমার জীবন কাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই গ্রাম খানি যেমন আছে, তাই থাকবে। তিনি উত্তর করলেন গ্রামবাসীরা যখন দয়া দাক্ষিণ্য ভুলে গিয়েছে, মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখ বোঝে না, তখন তারা না থাকলেই ভাল, হ্রদের জলে তাদের বাড়ী ঘর সেই সঙ্গে তারাও ডুবে গেলে ভাল হয়। তাঁর মুখ ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠল, অমি সমস্ত আকাশের আলো যেন নিবে গেল, আর দূরে বজ্রের গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল। ফিলোমেন ভয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারল না, কিন্তু একটু পরে তাঁর মুখ প্রসন্ন উঠল তারও ভয় চলে গেল, তবুও সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে তাদের অতিথি একজন অসামান্য লোক, হয়ত বা কোনও ছদ্মবেশী দেবতা।

তাঁরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর বুড়ি এসে তাঁদের খাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গেল। বুড়োবুড়ি সারাদিন পরিশ্রম করে যা উপার্জ্জন করত, তাতে কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলত, কিন্তু সঞ্চয় কিছুই হ'ত না। রাতে খাবার জন্যে আধ খানা রুটি, কিছু দুধ আর গুটিকত গাছ পাকা আঙুর ছিল। অতিথিদের সম্মুখে সেই সামান্য খাবার এনে দিতে বুড়ির বড় কষ্ট হতে লাগল, আর নিজেরা যে আধ খানা রুটি খেয়ে ফেলেছিল তার জন্যে মনে মনে কত দুঃখ করতে লাগল কিন্তু তখন আরতো কোন উপায় ছিল না। সেই সামান্য আহারের আয়োজন দেখেই অতিথিরা বড় আনন্দিত হলেন, বল্লেন এযে দেখছি রীতিমত ভোজ, ক্ষুধাও খুব হয়েছে কিছু ফেলা যাবে না। তাঁদের পেয়ালায় এক বার দুধ ঢেলে দিতেই পাত্রটি খালি হয়ে গেল, তাঁরাও চুমুকে দুধ টুকু নিঃশেষ করে ফেলে আবার দুধ চাইলেন; তখন বুড়ি মহা অপ্রস্তুত, কোথায় দুধ? কিন্তু যুবকটি বল্লে ভাল করে দেখ, আরও দুধ আছে, সবটা দাওনি। বুড়ি জানে, সে পাত্র নিঃশেষ করে দিয়েছে তবু যুবকের অনুরোধে সে ঘটিটি নিয়ে তাঁদের বাটীতে দুধ ঢালতে গেল তখন যথার্থই দুধে তাদের পাত্র ভরে উঠল, দেখে বুড়ি ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেল, নিজের চোখে দেখেও তার বিশ্বাস হ'ল না সে চুপি চুপি স্বামীকে বল্লে, অদ্ভুত ব্যাপার, আমার শূন্য পাত্র কি করে আবার পূর্ণ হ'ল! এঁরা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী দেবতা, নইলে কি এমন হয়? ফিলোমেন ভাবলে বুড়ির দেখবার ভুল হয়েছে, এবারে সে নিজে দেখবে, তাহলেই সব ঠিক হবে। এবারে যখন তাঁরা আবার দুধ চাইলেন, তখন ফিলোমেন পাত্রটি ভাল করে দেখলে কিছুই নেই, কিন্তু যেমন তাঁদের অনুরোধে ঢালতে গেল, অমনি দেখল পাত্রগুলি দুধে ভরে উঠেছে। তাদের সেই পাত্রটির মধ্যে যেন অক্ষয় দুধের উৎস সৃষ্টি হল, কিছুতেই আর শেষ হয় না, যত চাও, ততই পাওয়া যায়। তাঁদের বাগানের মধু সেই অতিথির স্পর্শে স্বর্গের অমৃতের মত সুগন্ধ হ'ল, সুগন্ধে সমস্ত ঘর পূর্ণ হয়ে গেল, তাদের শরীর ও মন পবিত্র হয়ে উঠল। সেই গাছপাকা আঙ্গুরগুলি খেয়ে অতিথিরা বল্লেন, এমন সুস্বাদু আঙ্গুর তো আমরা কখনো খাইনি, কোথায় এমন সুন্দর ফল পেলে। তারা বল্লে আমাদেরই আঙ্গুরের

লতায় হয়েছে, ঐ যে জানালা দেখছ ওরি গায়ে লতিয়ে উঠেছে, আঙ্গুর গুলিত আমাদের কোন দিনই তেমন ভাল মনে হয়নি। অতিথিদের ব্যবহার দেখে তাদের মনে আর সন্দেহ রইল না যে তাঁরা ছদ্মবেশী দেবতা; তাই তারা হাত জোড় করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল, তখন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বল্লেন আমাদের নূতন আর কি পরিচয় দেব? জানই ত আমরা তোমাদের অতিথি, আর তোমাদের বন্ধু। আমার তৃষ্ণা এখনও মেটেনি, আমাকে আর একটু দুধ দাও, ফিলোমেন যখন তাঁর পেয়ালা পূর্ণ করে দিলেন তখন তিনি বল্লেন আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের এ পাত্রটি যেন তোমাদের স্নেহ ভরা মনের মত চিরদিন পূর্ণ থাকে, আর এটি যেমন তোমাদের অভাব দূর করবে তেমনি যেন দুঃখী গরীবের অভাব মোচন করে।

— খাবার পর তাঁরা বিশ্রামের ইচ্ছা জানালেন, তখন ফিলোমেন তাঁদের আপন শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন, নিজেদের ঘরটি অতিথিদের ছেড়ে দিয়ে আপনারা বাইরে মাটীতে শুয়ে রইলেন। প্রতি দিনের মত তাঁরা খুব ভোরে উঠে দেখলেন তাদের অতিথিরাও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন, আর বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন। ফিলোমেন সকালের টাট্‌কা দুধ আর একটু মিষ্টান্ন দিয়ে জলযোগ করে যাবার জন্যে তাঁদের অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁরা বল্লেন তাঁদের অনেক দূর যেতে হবে, বেলা হলে রোদে কষ্ট হবে সকাল সকাল যেতে চান, তাই আর ফিলোমেন কোনও বাধা দিলেন না। তাঁরা আবার তাদের দুজনকে তাঁদের সঙ্গে কিছু দূর যাবার জন্যে অনুরোধ করিলেন। চার জনে একত্রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, যুবকটি কত আমোদের গল্প করে তাদের হাসাতে লাগলেন, আর প্রৌঢ়টি এমন প্রশান্ত স্নেহপূর্ণ ভাবে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন, যে তাঁদের মন একেবারে গলে গেল। সমুদ্রের জলে জলবিন্দু যেমন একেবারে মিশিয়ে এক হয়ে যায়, তাদের মনে হতে লাগল যেন তাঁদের মনও তেমনি ভাবে তাঁর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তাঁদের সমস্ত মন প্রগাঢ় শান্তিতে ভরে উঠল। কিছু দূর গিয়ে ফিলোমেন বল্লে অতিথিদের যত্ন করিতে পারলে মনে কত আনন্দ হয় আমাদের প্রতিবাসীরা যদি সে কথা বুঝত, তাহলে কি তারা এমন দুর্ব্ব্যবহার করে? বুড়ি বল্লেন তারা কেমন করে এমন করে কে জানে আজ আমি গিয়ে তাদের একবার খুব বকে আসব। যুবকটি বল্লে তুমি যে আর তাদের দেখ্‌তে পাবে, সে ভরসা বড় কম। প্রৌঢ় এমনি গম্ভীর হয়ে রইলেন যে তার সেই প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে তাদের মনে হতে লাগ্‌ল, তারা যেন সীমাহীন আকাশের দিকে চেয়ে আছে. সম্ভ্রমে তারা আর কিছু বলতে পারল না। তিনি তখন বল্লেন যখন মানুষ মানুষের উপর কর্ত্তব্য ভুলে যায়, দরিদ্র ভাই মনে করে তার দুঃখ দূর না করে তখন তারা আর এ পৃথিবীতে বাস করবার যোগ্য থাকে না, তাদের ধ্বংশ হলেই তখন পৃথিবীর মঙ্গল। যুবকটি বল্লে তোমরা যে গ্রামটির কথা বলেছিলে তাতো দেখছিলে সেটী গেল কোথায়? বুড়ো বুড়ী দেখলে সূর্য্যাস্তের সময় যেখানে সেই সমৃদ্ধ গ্রামখানি ছিল, সেখানে তার চিহ্ন মাত্র নেই তার পরিবর্ত্তে সেখানে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ দেখা যাচ্ছে, সকালের বাতাসে তার উপর ছোট ছোট ঢেউ নেচে নেচে উঠছে, সূর্য্যের আলোতে তাদের মাথায় লক্ষ হীরে জ্বলছে। হ্রদটি তারা কখনো দেখেনি, তবু মনে হতে লাগল সেটি অতি পুরাণ ও পরিচিত। আর যে গ্রামখানিকে তারা প্রতি দিন দেখ্‌ত তাকে স্বপ্ন বলে ভ্রম হতে লাগল। আশ্চর্য্য হয়ে তারা জিজ্ঞাসা করলে আচ্ছা আমাদের প্রতিবাসীরা কোথা গেল? যুবকটি হেসে বল্লে তারা হ্রদের জলে মাছ হয়ে আছে, তাদের শরীরে নিশ্চয়ই মাছের রক্ত ছিল, তা না হলে তাদের ব্যবহার এমন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বল্লেন গৃহহীন আশ্রয়হীন এই দুই অথিথিকে তোমরা যে যত্ন আদর দেখিয়েছ তাতেই তোমাদের সদয় মনের পরিচয় পেয়েছি, শ্রদ্ধা করে দিয়ে ছিলে তোমাদের সেই খাবার জিনিসে তাই দেব ভোগের স্বাদ পেয়েছি তোমাদের যদি কোন প্রার্থনা থাকে.

জানাও আমি পূর্ণ করব। স্বামী স্ত্রী দুজনের দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইল তারপর একজন দুজনের হয়ে বল্লে যদি দয়া হয়ে থাকে তবে এই বর দাও, আমাদের দুজনের জীবনে কখনও যেন বিচ্ছেদ না ঘটে, আমাদের দুজনের যেন একত্রে মৃত্যু হয়, আমাদের আর কেউ নাই আমরাই উভয়ে উভয়ের সর্ব্বস্ব। তিনি বল্লেন তথাস্তু। এখন তোমরা একবার ফিরে তোমাদের বাড়ীটা দেখ। তারা ফিরে দেখে তাদের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর আর নাই, সেখানে অপূর্ব্ব সুন্দর প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকা দেখা যাচ্ছে। তখন সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আবার বল্লেন তোমরা কুটীরে থেকে যেমন পূর্ণ হৃদয়ে মুক্ত হস্তে অতিথি সৎকার করেছিলে এখানেও তাই করিও। বুড়োবুড়ি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে দেখেন সেই প্রৌঢ় কিম্বা সেই যুবক কেউ আর সেখানে নেই।

বুড়োবুড়ি সুখে তাদের সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার বাস করতে লাগলেন, যে কেউ সে পথে আসৃত তারা তাদের বড় যত্ন আদর করতেন। তাদের সেই দুধের ভাঁড়টিও অক্ষয় হয়ে রইল। যখনি প্রফুল্ল স্নেহশীল সদয় হৃদয় কোন অতিথি তা থেকে দুধ খেত, সে মনে করত, সে যেন স্বর্গের অমৃত পান করছে, কিন্তু কর্কশ ক্রুর কুটিল অন্তঃকরণের অতিথি দুধ খেতে গেলে তার মুখে তাহা অত্যন্ত অম্ল স্বাদ বোধ হ'ত। বুড়োবুড়ি আরও কত দিন বেঁচে রইলেন, যখন একেবারে থুনথুনে বুড় হয়ে গেলেন তখন একদিন সকাল বেলায় তাদের আর দেখা গেল না। তাদের সেই অট্টালিকার উঠানে একজোড়া গাছ দেখা গেল, একটি প্রকাণ্ড বট অন্যটি অশ্বত্থ বাতাসে যখন তাদের ঘন শ্যাম পাতাগুলির মধ্য হতে মর্ম্মর শব্দ উঠত, তখন মনে হত, যেন বুড়োবুড়ির নাম শোনা যাচ্ছে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শূন্যপথ ভ্রমণ।

আকাশ পথে যাতায়াতের কথা অনেক দিন হইতে শুনা যাইতেছে। জল ও স্থলে মানুষের অবাধগতি হইয়াছে। আকাশে কেবল বাকী ছিল মানুষের যেন তাহা সহিতে ছিল না। অনেক দিন হইতে মানুষ আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মানুষ আকাশে উড়িবার কত চেষ্টা করিয়াছে তাহার বিবরণ মুকুলে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আকাশ ভ্রমণের চেষ্টায় বড় কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশ্য বেলুন সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাতে মানুষ আকাশে উঠিতে পারে; কিন্তু বেলুনকে যথা ইচ্ছা চালান যায় না। তাহা বাতাসের বেগে যেদিক সেদিক উড়িয়া যায়। মানুষ শুধু আকাশে উঠিয়া ক্ষান্ত নহে; মানুষ চায় যে যেমন মাটীর উপরে ঘোড়ার গাড়ী চালাইয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া যায়, আকাশও তাহাই করে। গত দশ বৎসরে এই চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। আকাশে বেড়ান এখন আর একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। এমন কি, এখন আকাশে যুদ্ধের কথাও হইতেছে; এবং সকল পরাক্রান্ত জাতিই তাহার আয়োজন করিতেছে। সকল দেশেই যেমন যুদ্ধের জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ করা হয়; তেমনি যুদ্ধের জন্য বেলুন নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এক বার যদি আকাশ হইতে যুদ্ধের বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে মহা পরিবর্ত্তন হইবে। তখন দুর্ভেদ্য দুর্গ, অসংখ্য সৈন্য; মহা পরাক্রান্ত নৌসেনা রাখিয়াও কোনও দেশ নিরাপদ হইবে না। কারণ এক বার যদি বেলুনে উঠিয়া আকাশ হইতে দুর্গের ভিতরে কি সৈন্যদের মাঝখানে কয়েকটা বোমা ফেলিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলেই কাজ শেষ হইবে। এখনকার বোমা এমন ভয়ঙ্কর হইয়াছে, যে কয়েকটা বোমাতেই প্রকাণ্ড সৈন্য দল বিনষ্ট হইতে পারে। আকাশে যুদ্ধের এই সুবিধা দেখিয়া জর্ম্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আকাশ ভ্রমণের উপযোগী বেলুন প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। জর্ম্মনীর কাউণ্ট জেপেলিন নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বহু চিন্তা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এক প্রকার বেলুন প্রস্তুত করিয়াছেন। জর্ম্মনির সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। কাউণ্ট জেপেলিন তাঁহার বেলুনে ফ্রেডরিকসাফেন হইতে ফ্রাঙ্কফোর্ট পর্য্যন্ত ২০০ মাইল ১২ ঘণ্টায় গমন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে

রাইট ব্রাদার্স নামে এক ব্যবসায়ী দলও নানা প্রকারের বেলুন প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত ব্লেরিও নামক এক জন ফরাসী এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি যে বেলুন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছাক্রমে এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে এই বেলুনে চড়িয়া তিনি ইংলিস্ চেনেল পার হইয়া শূন্য পথে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র ডেলীমেল ঘোষণা করিয়াছিল, যে কেহ শূন্য পথে ইংলিশচেনেল পার হইতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। ব্লেরিও তাঁহার আবিষ্কৃত বেলুনে ক্যালে হইতে ডোভারে আসিয়া সেই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ল্যাথাম নামক আর এক জন লোক শূন্য পথে ইংলিসচ্যানেল পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ল্যাথামের বেলুন দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্লেরিওর বেলুনে কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। তিনি প্রত্যূষে ৪॥ টার সময় ক্যালে নগর পরিত্যাগ করিয়া শূন্য পথে ৪৫ মিনিটে ডোভারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বেলুন ঘণ্টায় ৪২॥ মাইল বেগে গিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এক খানি দ্রুতগামী ষ্টীমার যাইতেছিল; দৈববশাৎ যদি বেলুন সমুদ্রে পড়িয়া যায়, তখন তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই দ্রুতগামী ষ্টীমার তাঁহার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্লেরিওর বেলুন ষ্টীমার পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ডোভারের উপকূলে তাঁহার এক জন বন্ধু নামিবার স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা নাড়িতেছিলেন। ব্লেরিও পতাকা দেখিয়া সেই খানেই তাঁহার বেলুন থামাইলেন। ব্লেরিও শূন্য পথে ইংলিসচেনেল পার হইয়াছেন শুনিয়া ইউরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মহা সমারোহ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী পর্য্যন্ত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ব্লেরিওর বয়স এখন ৩৭ বৎসর মাত্র। বাল্য কাল হইতেই তাঁহার আকাশ ভ্রমণের বাতিক ছিল। আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি কত বার যে পড়িয়া আঘাত পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই; তবু তিনি নিরস্ত হন নাই। অবশেষে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আকাশ ভ্রমণে যে সকল প্রতিবন্ধক ও বিপদ আছে তাঁহার বেলুনেসে সমুদায়েরই প্রতিবিধান করা হইয়াছে। বৈদ্যুতিক পাখার মত তাহার পাখা আছে, সেই পাখার জোরে বেলুন চলে। পাখা মিনিটে ১২০০ বার ঘোরে; এবং তাহার জোরে এত বেগ হয়, যে বেলুন ঘণ্টায় প্রায় ৫০ মাইল বেগে চলে। তাহাকে ইচ্ছামত যেদিকে সেদিকে ঘুরাইবার বন্দোবস্ত আছে। এতদিনে বুঝি মানুষের জল স্থলের মত অবাধে শূন্যে বেড়াইবার উপায় আবিষ্কৃত হইল।

পৌরাণিক কাহিনী।

(রামায়ণ)

ভরত।

লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন, "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এমন নিষ্ঠুর কেন হইলেন?" ভরতের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়, কৈকেয়ী যাঁহার মাতা, তিনি এমন দেবদুর্লভ সাধুতা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক এমন উন্নত, এমন নির্দ্দোষ, এমন স্বার্থশূন্য চরিত্র জগতে অতি অল্প দেখা গিয়াছে। এই নিষ্কাম সন্ন্যাসী রঘুকুলের অনেক পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের কুল শোভিত করিতে যেন তথায় জন্ম লইয়াছিলেন। যাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয় রাজপুত্র নিরপরাধে হঠাৎ দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে প্রেরিত হইলেন, এই বিষম অন্যায় দেখিয়া অযোধ্যার রাজভবন ও নগরে যে ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সকলের রোষ এই নিরপরাধ রাজকুমারের উপর পতিত হইয়াছিল। কৈকেয়ী পুত্রের জন্য রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিয়া অযোধ্যায় যে বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেরই মনে এই সন্দেহ হইয়াছিল, যে দূরে মাতুলালয়ে থাকিয়া ভরত রাজ্য পাইবার লোভে মাতাকে এমন ভয়ঙ্কর কার্য্য

করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন। রাম বনে গেলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর উপর ক্রোধ করিয়া অথবা ভরত সমুদয় অনিষ্টের মূল ইহা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র ও আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকারী নহেন বলিয়া গিয়াছিলেন। রাম বনে গেলে প্রজাগণ "ঘাতকের নিকটে পশুগণের ন্যায় আমরা ভরতের নিকটে বদ্ধ হইলাম" বলিয়া কাঁদিয়াছিল। মাতা হইয়াও কৈকেয়ী আচরণ দোষে ভরতের এমন পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে সকলের সন্দেহের ভারে ভরতের জীবন বিষাদময় হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র এমনই উন্নত ও পার্থিবতার লেশমাত্রহীন, যে পদ্মের মৃণাল যেমন শুভ্র পদ্মটীকে কর্দ্দমের বহু উর্দ্ধে তুলিয়া ধরে, সেইরূপ তাহা তাঁহাকে সকল সন্দেহের মলিনতা হইতে অনেক উচ্চে রক্ষা করিয়াছিল।

প্রভাতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভরত নিদ্রা হইতে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার মাতার রাজ্যলোভ অযোধ্যায় যে বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিল, তাঁহার মনে যেন তাহারই কৃষ্ণ ছায়া পড়িয়াছিল। এমন সময়ে অযোধ্যা হইতে দূতগণ তাঁহাকে লইতে আসিল। বহু দেশ, নদ, নদী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি দেখিতে পাইলেন। অযোধ্যায় আসিলেন ভাবিয়া তাঁহার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, উহার অবস্থা দেখিয়া তাহা দূর হইল। তিনি ভীতকণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি, ইহা যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না। নগরীর সেই তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? এখানে বেদপাঠে নিযুক্ত ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর ও কার্য্যব্যস্ত নরনারীর কোলাহল নাই। যে সকল প্রমোদ উদ্যানে রমণী ও পুরুষগণ একত্রে ভ্রমণ করিত, তাহা পরিত্যক্ত দেখিতেছি। রাজপথ চন্দন মিশ্রিত জলে পবিত্র হয় নাই, রাজপথে রথ, হস্তী, অশ্ব দেখিতেছি না। দ্বার সকল অবদ্ধ, শোভাহীন রাজপুরী যেন উপহাস করিতেছে।" সত্যই অযোধ্যার শোভা অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিপণী সকল রুদ্ধ, রাজপথ দিয়া কেহ চলিতেছে না, অযোধ্যা রামকে হারাইয়া যেন পুত্রহীনা রাজমহিষী কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভরত অযোধ্যার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধীরে ধীরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

কৈকেয়ী পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, রাম বনবাস গিয়াছেন পর অযোধ্যানগরী ও কোশল রাজের প্রাসাদ তাঁহার নিকট সর্পপূর্ণ রসাতল পুরীর মত হইয়া উঠিয়াছিল; কৈকেয়ী ভরতকে পাইয়া ভাবিলেন, এই শত্রুপুরীর মধ্যে এত দিনে এক জন মিত্র পাইলাম।

ভরত মাতাকে পিতা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "সর্ব্ব জীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে ভরত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, "পিতার যে হস্ত কার্য্য করিয়া ক্লান্তি বোধ করিত না, আমি তাঁহার সে হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?"— এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর পুনরায় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার ভৃত্য, সেই রামচন্দ্রকে দেখিতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।" মাতা যখন কহিলেন, যে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন তখন ভরত বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন হরণ করিয়াছেন? তিনি কি বিনা দোষে কাহারও উপর উৎপীড়ন করিয়াছেন? বা অন্য কোন মহাপাপ করিয়াছেন? কেন তাঁহার এই নির্ব্বাসন দণ্ড হইল?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।" এই বলিয়া তিনি আনন্দিত মনে পুত্রের রাজ্য লাভের জন্য যাহা করিয়াছেন সমুদয় সবিস্তারে কহিয়া কহিলেন, "এই নগরী ও সাম্রাজ্য এখন তোমারই হইয়াছে, তুমি শোক ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও।"

এই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া ভরত ক্রোধ, লজ্জা ও দুঃখে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং মাতাকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অতিশয় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তিনি

কহিলেন, "আমি বুঝিলাম, তুমি অশ্বপতির কন্যা নহ, আমাদের কুলক্ষয় করিবার জন্য তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তোমা হইতেই মহারাজ দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজা হন, এই ব্যবহার সকল রাজকুলে বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুদের বিশেষ আদরণীয়, তুমি রাজবংশে জন্মিয়াও সে রাজধর্ম্ম জান না? তুমি আমার প্রাণান্তকর বিপদ উৎপন্ন করিয়াছ, আমি কোন মতেই তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিব না, সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিয়া আমি তাঁহার দাস করিয়া থাকিব।" এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত বন্য হস্তীর ন্যায়, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি শরীরের সকল অলঙ্কার দূরে ফেলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর বহু ক্ষণের পর চেতনা পাইয়া অমাত্যগণের মধ্যে কহিতে লাগিলেন, "আমি কখনও রাজ্য কামনা করি না এবং রাজ্য লইবার আশায় মাতাকে উত্তেজিত করি নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতি দূর দেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য্য রাম যেরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন তাহাও জানি না।" অন্য গৃহ হইতে দেবী কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠের স্বর শুনিয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, "দেখ, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন, আমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।" এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিত দেহে যথায় ভরত সেই দিকেই চলিলেন, ভরতও তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার গৃহে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস, তুমি রাজ্য চাহিয়াছিলে, এক্ষণে নিষ্কণ্টকে তাহা পাইয়াছ, তোমার মাতা অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা লইয়াছেন। বৎস রাম যেখানে তপস্যা করিতেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য যেখানে অনেক অশ্ব ও হস্তী আছে, তাহা তোমারই হইয়াছে।"

কৌশল্যার এই কঠিন তিরস্কার শুনিয়া ক্ষত স্থানে সূচি বিদ্ধ করিলে যেমন বেদনা হয়, ভরত সেইরূপ ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে পতিত হইয়া অনেক ক্ষণ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন; তাহার পর করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, "আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, আপনি অকারণে কেন আমায় তিরস্কার করিতেছেন? তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা কত গভীর, তাহা কি আপনি জানেন না? অধিক কি কহিব, রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয় এবং ভৃত্য ত্যাগে যে পাপ হয়, রামকে যে বনে পাঠাইয়াছে তাহার তাহা হউক। সেই পামর দেবগণ, পিতৃগণ এবং পিতামাতার শুশ্রূষা যেন না করে। সে আজ সাধুগণের লোক, সাধুগণের কীর্ত্তি এবং সাধুজনের কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হউক। যে পানীয় জল দূষিত করে, যে বিষ দান করে, জল থাকিতে যে তৃষ্ণার্ত্তকে জল না দেয়, তাহার যে পাপ, তাহাই তাহার হউক।" রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়া দেবী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে ভূমিতে পতিত হইলেন।

তখন পতি পুত্র শোকে কাতরা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, "বৎস তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার অন্তরে মর্ম্ম বেদনা দিতেছ, এখন আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সাধুলোক প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতকালে বশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন "রাজকুমার, আর শোক করিয়া কি হইবে। রাজা দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এখন তুমি তাহারই আয়োজন কর।" তখন ভরত বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহাকে তৈল দ্রোণী হইতে উঠাইয়া ভূমিতে স্থাপন

করিলেন। দশরথকে দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। পরে ভরত নানা রত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় পিতার শব স্থাপন করিয়া দীন মনে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ আমি প্রবাসে ছিলাম তথা হইতে আসিবার পূর্ব্বে রাম লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া আপনি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। রাম বনে গিয়াছেন আপনিও পরলোকে প্রস্থান করিলেন, এখন আর কে স্থির মনে প্রজাপালন করিব?" তাহার পর বশিষ্ঠের আদেশে অগ্নিগৃহ হইতে যে অগ্নি রাজার অগ্রে বাহির করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বিধান মতে তাহাতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ভৃত্যেরা দশরথের শব শিবিকায় আরোপণ করিয়া তাহা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও শূন্য মনে সরযূর তীরে লইয়া চলিল। যাইবার পথে বহু লোক স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। চন্দন,অগুরু,গুগ্‌গুল প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এবং সরল, পদ্মক ও দেবদারু কাষ্ঠে চিতা রচিত হইয়াছিল, ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতায় স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়া তাঁহার পরলোকের মঙ্গলের জন্য মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ গায়কেরা সাম গানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীরা বৃদ্ধগণে বেষ্টিত হইয়া যান ও শিবিকায় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ঋত্বিকগণের সহিত রাজার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চতুর্দ্দশ দিবস পরে বশিষ্ঠ দেব সভার ন্যায় সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া দূতদিগকে কহিলেন,"তোমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়,অমাত্য,সেনাপতি,ভরত, শত্রুঘ্ন, যুধাজিৎ, সুমন্ত্র প্রভৃতিকে শীঘ্র আনয়ন কর।" মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে সকলে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। ভরত সেই সভায় প্রবেশ করিয়া আসনে উপবেশন করিলে বশিষ্ঠ প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বৎস, রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ ধর্ম্ম সাধন করিয়া এই ধনধান্যপূর্ণা পৃথিবী তোমায় প্রদান করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া পিতার আদেশ মত কার্য্য করিয়াছেন, এখন তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতা তোমার যে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ কর।উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের রাজারা এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা তোমাকে উপহার দিবার জন্য অসংখ্য ধন রত্ন আনয়ন করুক।" ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে শোকে অতিশয় কাতর হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ্ বচনে কহিলেন, "তপোধন যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মশীল রামের রাজ্য আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে গ্রহণ করিবে? এই রাজ্য ও আমি উভয়ই রামের। দিলীপ ও নহুষ তুল্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তিনিই রাজ্য অধিকার করিবেন। তিনি এই রাজ্যের ও ত্রিভুবনের রাজা, আমি তাঁহারই অনুসরণ করিব। যদি তাঁহাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তবে লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তাঁহার সহিত বনবাসী হইব।" ভরত কুলগুরু বশিষ্ঠ, মাতৃগণ, অমাত্যবর্গ ও অযোধ্যার প্রজাদের লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থানে রাজ্য করিতেন। ভরত সসৈন্যে ভাগীরথীর কূলে সেই দিন বিশ্রাম করিলেন। নিষাদপতি গুহ গঙ্গাতীরে ভরতের সৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া মনে ভাবিল, ইনি নিশ্চয়ই নির্ব্বাসিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে হইবে। এই ভাবি নিষাদপতি আপনার জ্ঞাতিদিগকে ভাগীরথীর উপকূলে সশস্ত্র অবস্থান করিতে কহিয়া মাংস,মধু ও মৎস্য উপহার লইয়া ভরতের নিকটে চলিল। নিষাদপতি তাহার উপহার ভরতের নিকটে অর্পণ করিয়া কহিল,"রাজকুমার এই দেশ তোমার গৃহ বিশেষ, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাস কর, তোমার সৈন্যেরা আজি আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।" ভরত কহিলেন"গুহ,তুমি যে আমার সৈন্য অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইয়াছে। গঙ্গার এই উপকূল গহন বনে আচ্ছন্ন

দেখিতেছি, কোন্ পথে গেলে আমি ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইতে পারিব তাহা বলিয়া দাও।' গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিল "রাজকুমার, নিষাদেরা সকল স্থানই জানে, প্রস্থান কালে আমি তাহাদের লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব। জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসৎ ইচ্ছা করিয়া রামের নিকট যাইতেছ? তোমার এই বহু সংখ্যক সেনা দেখিয়া আমার সেই ভয় জন্মিতেছে।" গুহের এই কথা শুনিয়া আকাশের ন্যায়, ভরত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রামের অনিষ্ট করিতে হইবে এমন সময় যেন কখনও না আসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল তাঁহাকে আমি বন হইতে ফিরাইয়া আনিতেই চলিয়াছি তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিওনা।" নিষাদপতি ভরতের এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিল তুমি অযত্নলব্ধ রাজ্য ত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছ তুমিই ধন্য। এই পৃথিবীতে তোমার ন্যায় কাহাকেও দেখি না।" তাহার পর যখন গুহ তাঁহাকে সেই ইঙ্গুদী তরু দেখাইল, যাহার তলে রাম বনবাসের প্রথম রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, তখন ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "যিনি অতি উচ্চ অট্টালিকায় চির দিন থাকিয়াছেন, যাঁহার গৃহ সর্ব্বদা সুগন্ধে পূর্ণ থাকিত, তিনি ভিখারীর মত এই বৃক্ষতলে পড়িয়াছিলেন? আমি তবে আর কি বলিয়া রাজার মত বেশ পরিব? আজ হইতে আমিও জটা রাখিব ও বল্কল পরিব, ভূমি আমার শয্যা হইবে এবং ফল মূল খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিব।"

ভরত চিত্রকূটে গিয়া রামের তপস্বীবেশ দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন, কহিলেন "আমার অগ্রজের এ বেশ কেন? প্রজারা রাজ সভায় যাঁহাকে আরাধনা করিবে, বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র যিনি পরিধান করিতেন, তিনি মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন। যে শরীর বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, তাহা মলিন। আর্য্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। আমার এই ঘৃণিত জীবনে ধিক্।"

ভরত রামের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন "আর্য্য আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্রাশয়া মাতা আমার জন্য যে অকার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে, এখন প্রসন্ন হউন, আমার জননীর কলঙ্ক দূর করুন ও আমাদের পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাতক হইতে রক্ষা করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা না করেন, আমিও আপনার সহিত বনবাসী হইব।" অনেক তর্ক অনেক বিতণ্ডা চলিল কোনমতে রামকে বনবাস হইতে ফিরাইতে না পারিয়া ভরত অনশন ব্রত ধরিয়া রামের কুটীর দ্বারে ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। রাম তখন ভরতকে সাদরে উঠাইয়া আপন পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। বিদায় লইবার সময় ভরত কহিলেন, "আর্য্য আমি সমুদয় রাজ্য ব্যাপার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অযোধ্যার বাহিরে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিনে যদি আপনার দর্শন না পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস আমিও জানকী তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি আমার জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কখনও রুষ্ট হইও না।" এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর সুশীল ভরত সেই পাদুকা হস্তীর উপর স্থাপন করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। যাইবার সময় পথে আবার ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের মুখে সমুদয় বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "বৎস তুমি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, এখন বুঝিতেছি, তোমার মত ধর্ম্মশীল পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে একেবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই।"

ভরত আর অযোধ্যায় ফিরিলেন না। নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপিত হইল। বনবাসী রামের মত তপস্বী ব্রত ধরিয়া জটাবল্কলধারী ভরত রামের পাদুকাকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া চৌদ্দ বৎসর অযোধ্যার রাজ্য পালন করিলেন। তাহার পর রাম ফিরিয়া আসিলে সেই পাদুকা রামের পদে পরাইয়া দিয়া

কহিলেন "তোমার রাজ্য আমি এতদিন অনেক যত্নে রক্ষা করিয়াছি, ভাণ্ডারে যে অর্থ ছিল এই চৌদ্দ বৎসরে তাহা দশগুণ বেশী হইয়াছে। তুমি যে রাজ্যভার আমায় দিয়াছিলে, তাহা আবার লও।"

ভরতের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, এমন সুপুত্রের মাতা হইবার পুণ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝি বিধাতার নিকটে কৈকেয়ীর মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল।

সদাশয়তা।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা যখন মুকুলে আমেরিকার প্রসিদ্ধ দেশপতি এব্রাহাম লিঙ্কনের ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম তখন বলিয়াছিলাম যে তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক অনেক গল্প প্রচলিত আছে। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ তাহার একটী বলিতেছি। তখন লিঙ্কনের বয়স কুড়ি একুশ বৎসর। তখনও তিনি তাঁহার পিতার বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার জমি চাষ ইত্যাদি কাজ করেন। সংসারের কিছুই দেখেন নাই। লেখা পড়া বেশী শিখেন নাই। তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন, সেখান হইতে পনর মাইল দূরে বুনভিল নামে একটী ছোট সহর ছিল। সেখানে একটী বিচারালয় ছিল। লিঙ্কনের ইচ্ছা হইল, যে আদালতে উকীলেরা কেমন বক্তৃতা করে এবং কিরূপ বিচার হয়, তাহা দেখিবেন। এই স্থির করিয়া তিনি একদিন প্রত্যূষে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। পনর মাইল হাঁটিয়া ধূলি ধূসরিত ছিন্ন বসনে লিঙ্কন বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেদিন আদালতে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বিচার হইতেছিল এবং স্থানীয় এক জন শ্রেষ্ঠ উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। লিঙ্কন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে একবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে এরূপ বক্তৃতা কখনও শুনেন নাই। তাঁহার মনে হইল, যদি তিনি কখনও এরূপ বক্তৃতা করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে সেই উকীলের বক্তৃতা শুনিলেন। লিঙ্কন এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, যে উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর বক্তৃতা আমি কখনও শুনি নাই।" উকীলটী লিঙ্কনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি হয়ত লিঙ্কনকে পাগল, অথবা একজন পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। অবশ্য লিঙ্কন অপ্রতিভ হইলেন এবং উকীলটীর অসৌজন্যে একটু বেদনাও পাইলেন।

ইহার অনেক দিন পরে সেই উকীলটীর সহিত লিঙ্কনের আর একবার দেখা হইয়াছিল। তখন তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দেশাধিপতি। আর সেই উকীলটী বিদ্রোহী সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার জন্য বন্দী ভাবে লিঙ্কনের নিকটে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্য লিঙ্কনকে চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু লিঙ্কন তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন। লিঙ্কন তখন তাঁহাকে বহু বৎসর পূর্ব্বে বুনভিল আদালতে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলিলেন। উকীলটী তাঁহার ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন; এবং হয়ত মনে করিলেন যে এখন লিঙ্কন সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু সেই ঘটনা তাঁহার মুক্তির সহায় হইল। লিঙ্কন বলিলেন, সে সময়ে আমি তাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনি নাই। আমি সেদিন মনে করিয়াছিলাম আমি যদি কখনও এমন বক্তৃতা করিতে পারি, তাহা হইলে আর কিছু চাহিব না। এই বলিয়া তিনি বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

বীরবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজপুতানার অন্তর্গত টোঁড়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রতনসিংহ নামক জনৈক

রাজা ইহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রতনসিংহ সুপুরুষ ও সৎসাহসিক, কিন্তু উপযুক্ত সৈন্যবল না থাকায় তাঁহাকে অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। মুসলমানগণ বারবার আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ, দুর্গ অবরোধ এবং নগর লুণ্ঠন করিত। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি স্থানীয় রাজন্যবর্গের ও মিবারের মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হায়! সে সময় রাজপুতানায় আর সে গৌরব নাই, রাজপুতানা আজ হীন-বীর্য্য, হত-বল; অন্যের কথা কি, স্বয়ং মহারাণাও আজ মুসলমানের অত্যাচারে সশঙ্ক। সকলেই নিজ নিজ রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত; কে আজ রতন সিংহের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিবে? কেহই আসিল না। নিরুপায়ে রতন সিংহ শেষ বারের মত অদম্য উৎসাহে মুসলমানের বিপুল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন কিন্তু তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য দিল্লী অধিপতির অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে জল বুদ্বুদের ন্যায় মুহূর্ত্তে লীন হইয়া গেল।

রতনসিংহ রাজ্যচ্যুত। তাঁহার বড় সাধের টোডা মুসলমানের অধিকারে। তাই আজ তিনি স্বরাজ্য ছাড়িয়া, স্বাধীনতা হারাইয়া সুদূর বিদ্‌নরে। কে জানে এই সুদূর বিদ্‌নরে তিনি তাঁহার সাধের টোডার ও তাহার অধিবাসিগণের মঙ্গল আশায় কোন ঐশী শক্তির সাধনা করিতে ছিলেন কি না। কিন্তু তিনি যে এক দিনের জন্য এমন কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে সে চিন্তা অপসারিত করিতে পারেন নাই তাহা যথার্থ। কিন্তু এই সৈন্যহীন উপায়হীন, অর্থ-হীন রাজ্যচ্যুত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তনসিংহ সেই অগণিত মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে কি করিতে পারেন।

মানুষ আশার দাস। আশা মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে। রতনসিংহ সে আশা পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একদিন না একদিন এমন সময় আসিবে যে দিন তাঁহার সাধের টোডা আবার তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আসিবে—টোডার অধিবাসিগণ অবার তাঁহাকে আহ্বান করিবে। তাঁহার স্নেহের কন্যা তারাই সেই বিশ্বাসের কারণ। রতনসিংহের পুত্র ছিল না। তারাকেই তিনি পুত্র তুল্য ভাবিতেন এবং সেইরূপ শিক্ষা দিতেন, অতি বাল্যকাল হইতেই তারা অশ্বারোহণ, অস্ত্র চালনা প্রভৃতি যুদ্ধ কার্য্য অতি সুন্দররূপেই শিখিয়াছিল। যখন তাহার পিতা যুদ্ধে যাইতেন তারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। সেই ভয়াবহ যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তারার অবিচলিত ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইত। ভয় বলিয়া কিছু তাহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। সৌন্দর্য্যেও তারা রাজপুতানায় অতুলনীয়। স্ত্রীজনোচিত সকল গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও তারা বীরত্বে সিংহী সদৃশী, সাহসে ও নৈপুণ্যে রাজপুত বীরগণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত না।

রতনসিংহ অনেক সময়েই মনে মনে ভাবিতেন যদিই তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে না পারেন তাহা হইলেও তিনি তারাকে যে শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন সেই শিক্ষা বলেই সে তাহার পিতৃ রাজ্য উদ্ধার করিতে পরিবে, সেইজন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি বাহুবলে তাঁহার রাজ্য প্রবল প্রতাপশালী দিল্লী সম্রাটের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে তাঁহাকেই তিনি তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিবেন। তারার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণের ভূয়সী প্রশংসা রাজপুতনাময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল, অনেক রাজপুত্র তারাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন, কিন্তু তাহার পিতার কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সকলেই ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এইরূপে একে একে অনেক রাজপুত্র আসিলেন গেলেন; অবশেষে মিবারের মহারাণার দ্বিতীয় পুত্র জয়মল্ল তারাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। রতন সিংহ মহারাণার অধীনস্থ এক জন ক্ষুদ্র রাজা। কাজে কাজেই মহারাণার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ বড় সুখেরই সংবাদ। কিন্তু এই চিন্তার পূর্ব্বে তাঁহার মন পবিত্র স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়তার সহিতই বলিলেন "যিনি আমার ক্ষুদ্র

রাজ্য টোডাকে মুসলমানের দুর্জ্জয় হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন তিনি আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করিবেন, অন্যথা নয়।"

জয়মল্ল ভীরু কাপুরুষ যুবক। রতন সিংহের এ বীরোক্তি তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই অতি ঘৃণিত ভাবে তাঁহার এই উক্তির সমালোচনা করিলেন। রতন সিংহ কুমারের এতাদৃশ নীচতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্ষণেকে তাঁহার কটিবন্ধ হইতে অসি ঝলসিয়া উঠিল। কুমারের আত্ম রক্ষারও সামান্য সুযোগ হইল না। মুহূর্ত্তে তাঁহার রক্তাক্ত কলেবর ধূলায় লুণ্ঠিত হইল।

মহারাণা যখন পুত্রের নিধন সংবাদ শুনিলেন মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন "ভীরুতার উপযুক্ত প্রতিফলই এইরূপ। আমি সর্ব্বান্তকরণে আমার পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করিলাম।"

মহারাণার এই ভক্তি তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক।

(ক্রমশঃ)

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল।

১। রামের নিকট ২২টী এবং শ্যামের নিকট ২৬টী আম ছিল।

২। বন্দুক।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটা ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীমতী শৈলবালা সেন গুপ্ত, শ্রীআহাম্মদ আমী মিঞা, শ্রীমতী লীলাবতী দেবী, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরোহিন ভূঞা, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশৈবকৃষ্ণ দে, শ্রীরবীন্দ্র কান্ত রায়, শ্রীমহীতোষ বাগচী, শ্রীসুধীররঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীপূর্ণেন্দুকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীক্ষীরোদ বিহারী গুপ্ত, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীগুরুকান্ত দাস, শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী বিনোদবালা বসু, শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, Students of the 5th class, Jamlrta H. E. Scool, শ্রীমতী রাণীমায়া দেবী, শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়কুমার-নন্দী।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, শ্রীমতী রেণুকা দেবী, শ্রীমতী পরিমলরাণী দেবী, শ্রীনীরজনাথ ঘটক, শ্রীমনুজনাথ ঘটক, শ্রীসরোজনাথ ঘটক, শ্রীমিহিরকুমার মৈত্র, শ্রীউমেশচন্দ্র রায়।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীশান্তিনাথ বসু প্রেরিত)

১। এই রচনাটির মধ্যে মধ্যে '——' এইরূপ চিহ্ন কাছে। পাঠক পাঠিকাগণকে ঐ ঐ স্থানে একটা করিয়া কথা বসাইতে হইবে। প্রথম স্থানে যে কথাটী বসাইবে, দ্বিতীয় স্থানে ঐ কথাটারই অক্ষরগুলিকে উল্টাইয়া বসাইতে হইবে। যেমন, যদি প্রথম স্থানে বসাও "টাকা" তবে দ্বিতীয় স্থানে বসাইবে "কাটা"।

আমাদের পাড়ার '—' বাবু সে দিন বেড়াইয়া আসিবার সময় রাস্তার ধারে একটী '—' সাপ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। '—' বড় দুষ্ট ছেলে পড়া শুনা না করার দরুণ তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন '—' তোমাকে সোজা করিয়া দিতেছি! এই বলিয়া প্রহার করিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন! কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি সে '—'র ধারে বসিয়া অতি '—' ভাবে কাঁদিতেছে। ওহে একটু '—' আমাকে বাজারে '—' কিনিতে এখনই যাইতে হইবে। সে দিন '—' মহাশয়ের বাটীতে গিয়া দেখি যে তিনি সহস্তে বাড়ীর ভিতরে একটী সুন্দর '—' তৈয়ারী করিয়াছেন। '—' গাছ প্রায়ই কোনও '—' দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ '—'আমি লইব না, কারণ ইহা অল্প '—' রহিয়াছে।

(শ্রীমতী রাণীমায়া দেবী প্রেরিত)

২। 'পয়সা' 'দুয়ানী' 'আনি' সংখ্যায় সমান,
'টাকা' 'সিকি' 'আধুলি' ও সেই পরিমান।
একশো পঁচিশ টাকা হিসাবে হইল,
বল দেখি প্রতি মুদ্রা কত সংখ্যা ছিল।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
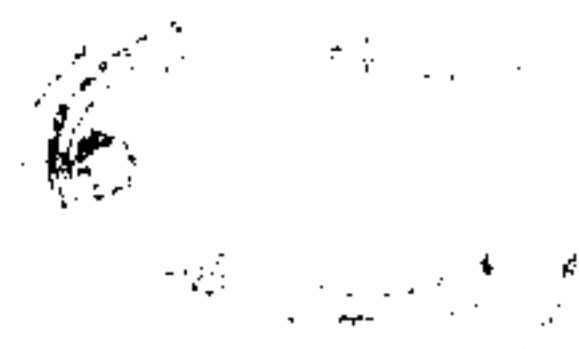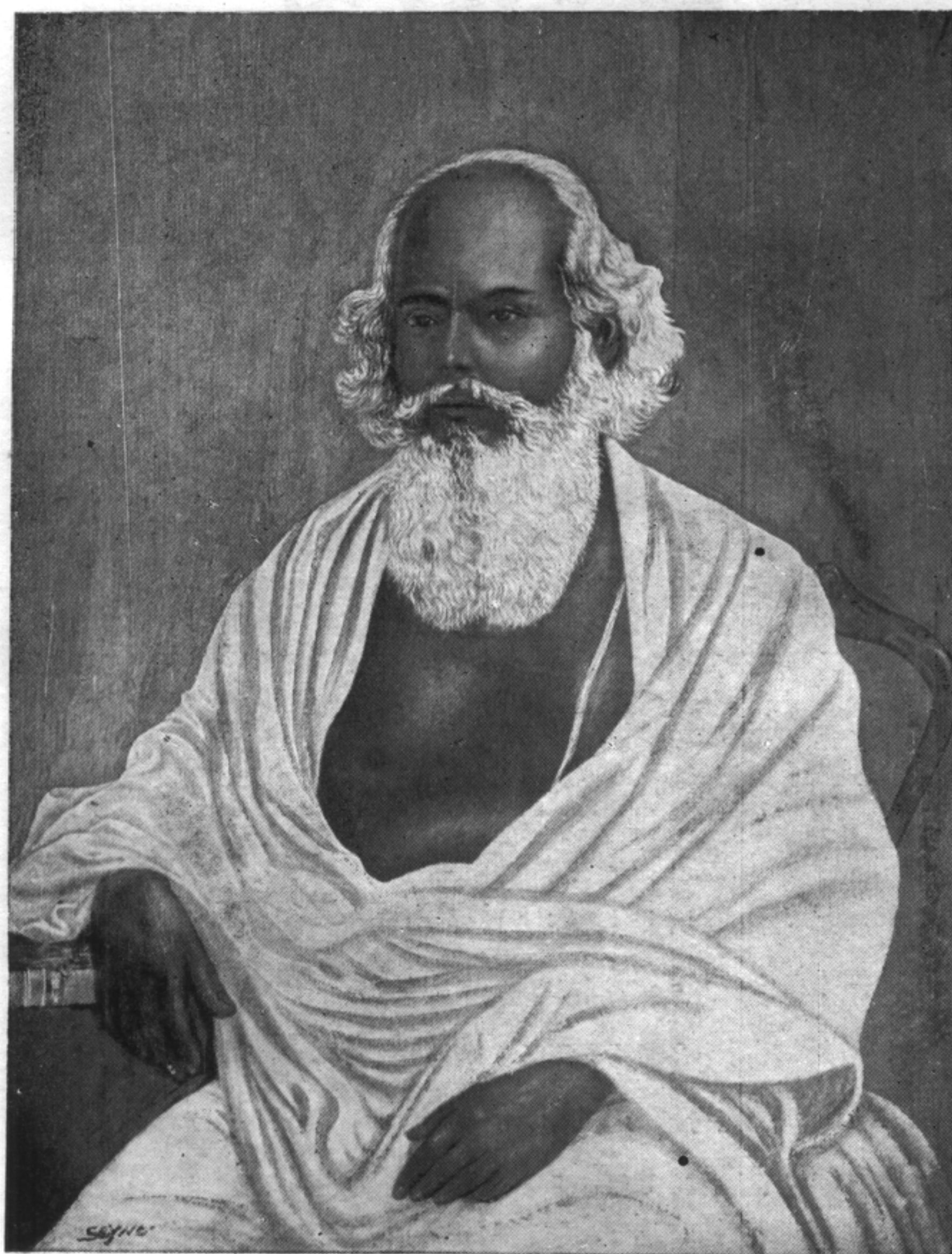
পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

মুকুল
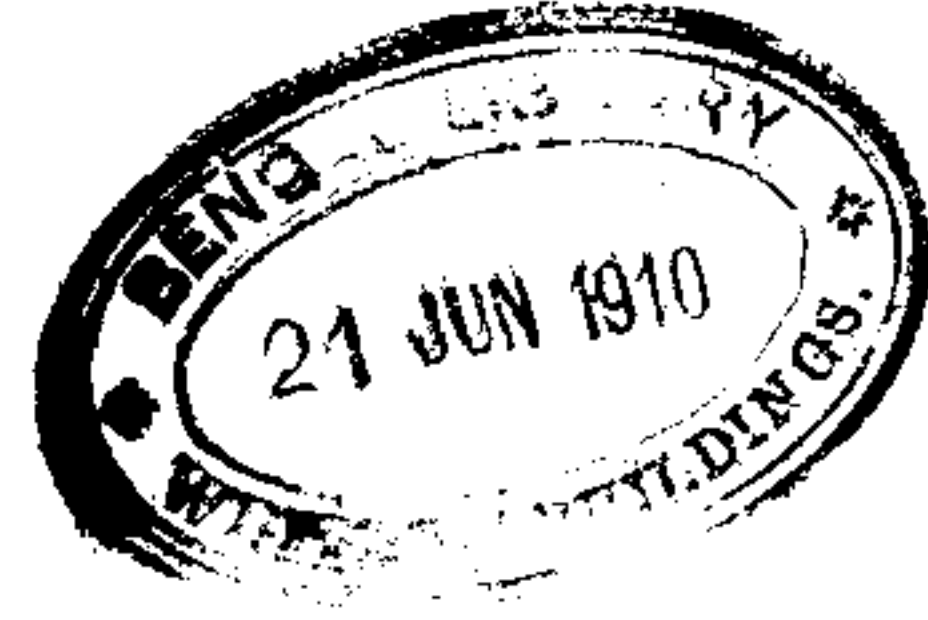
১৫শ ভাগ। মাঘ, ১৩১৬। ১০ম সংখ্যা।

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কাহারো অবিদিত নাই। এই স্বনামখ্যাত পুরুষ যেমন বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাবলম্বন ও দয়া গুণে ভূষিত ছিলেন, তেমনি আর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিব, যিনি সেই মহাপুরুষের ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ না করিলেও অনেক গুণে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। তিনি পরলোক-গত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে ১২৩০ সালে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামধন ভট্টাচার্য্য, মাতা মঙ্গলা দেবী। রাজপুর গ্রাম বৈদিক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। কথিত আছে বহুকাল পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। কোন দুর্দ্ধর্ষ যবন তাঁহাদের উপর অত্যাচার করায় তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ রাজপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন; তদবধি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বংশপরম্পরায় রাজপুর গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন।

অতি পূর্ব্বে রাজপুরে দুই জন খ্যাতনামা পুরুষ বাস করিতেন। ইঁহাদের এক জনের নাম চণ্ডীদাস, অপরের নাম বেদবাগীশ। এই চণ্ডীদাসের বংশে শ্যামসুন্দর তর্কপঞ্চানন নামে এক সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। অগ্রে রাজা ও বড় বড় ধনীদিগের সভায় শাস্ত্রীয় বা অন্য কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য সভা-পণ্ডিত সকল থাকিতেন। বিচারার্থ কোন পণ্ডিত উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত বিচার হইত। উপস্থিত বিষয়ের বিচারে যিনি জয়ী হইতেন, তাঁহাকে জয়পতাকাস্বরূপ বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হইত। পূর্ব্বে কলিকাতার শোভাবাজারে শ্রীযুক্ত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের রাজ-বাটীতে এক শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হয়। বিষয়—দ্বাদশী তিথিতে পুঁইশাক খাইতে আছে কিনা? রাজা নবকৃষ্ণের সভায় সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহিত শ্যামসুন্দর তর্কপঞ্চাননের বিচার হয়। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দেশের বহুদিনের প্রচলিত কথা "পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা" বচন আওড়াইয়া পুঁইশাক খাইতে নাই, আর শ্যামসুন্দর শাস্ত্রেরই বিপরীত বচন উদ্ধৃত করিয়া কেবল দ্বাদশী তিথিতে পুঁইশাক খাইতে আছে, তাহা প্রদর্শন করেন। বিচারে শ্যামসুন্দরই জয়লাভ করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর তর্কপঞ্চাননকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করেন। রাজা শ্যামসুন্দরকে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন

করিতে অনুরোধ করেন। বিনীত নিরহঙ্কারী শ্যামসুন্দর বলিলেন যে, চারি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, চতুষ্পাঠী স্থাপন করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণগণের বসতিস্থান রাজপুর গ্রামে তখন অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল; কিন্তু শ্যামসুন্দর তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্যের জন্য রাজপুরের ন্যায় একটি গণ্ডগ্রামও দক্ষিণ নবদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শ্যামসুন্দর তর্কপঞ্চাননের দুই সন্তান, হরিনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও চন্দ্রচূড় সার্ব্বভৌম। চন্দ্রচূড়ের চারিটি সন্তান। রাধানাথ, রূপনারায়ণ, ধনঞ্জয় ও রামধন। ইঁহাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ রামধনই শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। অপর সকলে পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; অবশেষে তাহাও নিশেঃষিত হইয়া পড়িল।

রামধনের জন্মগ্রহণের পর তাঁহার মাতা পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ রাধানাথ ছোট ভ্রাতাটিকে মাতার ন্যায় লালন পালন করিয়াছিলেন। রামধন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, কোন্নগরে আসিয়া শিবনাথ বাচস্পতির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপর নবদ্বীপে গমন করিয়া ও ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তথায় পাঠ সমাপনান্তে বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন।

রাজপুরে আসিয়া অধ্যাপনাকার্য্যে রত থাকিবার জন্য প্রয়াসী হইলে তৎকালীন রাজপুরের জমিদার দুর্গারাম কর মহাশয় তাঁহাকে দুই বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় এই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া টোলে কয়েকটী ছাত্র রাখিয়া শিক্ষা দানে রত হন।

দেশের প্রথানুসারে রামধন পরিণীত হইলেন। ক্রমে নিজের সন্তান সন্ততি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবারবর্গ লইয়া তাঁহার একটি বৃহৎ পরিবার হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ মাতৃবিয়োগের পর শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁহারও পরিবারবর্গের ভার গ্রহণ করিয়া অগ্রে তাঁহাদিগের অভাব মোচনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার উৎসাহদাতা ও চতুষ্পাঠীর সাহায্যকর্ত্তা, জমিদার দুর্গারাম কর ক্রমে অর্থ সম্বন্ধে হীনবল হইয়া পড়িলেন; তদীয় সাহায্য ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়াতে বিদ্যা বাচস্পতি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর অবস্থা ক্রমে শোচনীয় আকার ধারণ করিল। এই সময়ে অর্থাভাবে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; রাত্রে লেপের অভাবে তাঁহাকে ছিন্ন মশারী গাত্রে দিয়া শীত নিবারণ করিতে হইত।

রাজপুরের চতুষ্পাঠীর অবস্থা মন্দ হওয়াতে রামধন কলিকাতায় আসিয়া ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী গৃহের পশ্চাতে একটি টোল স্থাপন করেন। মাসিক আট আনা করিয়া ঐ গৃহের ভাড়া দিতে হইত। পুরোহিতদিগের উপর ভাগ্যদেবী সকল সময়ে বড় প্রসন্ন থাকেন না, যজমান-দিগের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অনুকম্পার উপরই তাঁহাদিগের সৌভাগ্য নির্ভর করিয়া থাকে। রামধনের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন মুখে তাঁহার নিকট কখন দণ্ডায়মান হন নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার আত্মকাহিনীতে পিতার ঠনঠনিয়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত টোলের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া এক স্থানে লিখিয়াছেন, "তখন কিঞ্চিদধিক বিদায় পাইতেন, তাহাতেই ঐ বৃহৎ গোষ্ঠীর ভরণপোষণ অতিকষ্টে নির্ব্বাহ হইত। আমার জন্য গব্যদুগ্ধ ক্রয় করিবার ক্ষমতা ছিল না।"

এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের পিতামহ ঠাকুর পরলোক যাত্রা করেন। শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য রামধন প্রায় ২০০ শত টাকা ঋণ করেন। তখন বঙ্গদেশের অবস্থা এরূপ ছিল না; জিনিষ পত্রের মূল্য অল্প ছিল; লোকে সামান্য আয়ে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিতেন। তখন বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে লুচি পোলাও সন্দেশ, রসগোল্লার প্রচলন ছিল না; চিড়া দধি ও চিনি দ্বারা ফলারের প্রথা প্রচলিত ছিল। গিরিশ চন্দ্রের পিতামহের শ্রাদ্ধে, ঐরূপ ফলারের ব্যবস্থাই হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা তাই পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার আত্মকাহিনীতে তখনকার সহিত এখনকার বঙ্গ দেশের অবস্থার তুলনা করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন, "এক্ষণকার সময় ২০০০ দুই

হাজার টাকায় যে কর্ম্ম হয়, তৎকালে ২০০ দুই শত টাকাতেই তাদৃশ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। কালের বিচিত্র গতি! তখন চিড়া মুড়কিতেই পরম সন্তোষ হইত, এখন লুচি মণ্ডাতেও মন উঠে না। আমার বেশ মনে পড়ে, যখন একটী মাঠ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে সমাজস্থ ব্রাহ্মণদিগের চিড়া, মুড়কি, দধির জলপান হয়, তৎকালে আমি বানরের মত ঐ মাঠের মধ্যস্থিত একটা হেলান লোনা গাছের স্কন্ধের উপর বসিয়া ঐ সমারোহের জলপান দর্শন করি।"

এখনকার বালকেরা যেমন বাল্যকালে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়, তখন বিদ্যারম্ভের সময় ছেলেদের হাতে খড়ি হইত, তৎপর তাহারা পাঠশালায় প্রেরিত হইত। গিরিশচন্দ্রের পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমে হাতে খড়ি হয়, তৎপরে তাঁহাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়। এখনকার ন্যায় তখন শ্লেটে বালকেরা ক, খ, গ, লিখিত না; তালপত্রে প্রথম বর্ণ পরিচয়ের অক্ষর সকল লিখিতে হইত এবং পাঠশালায় যাইবার ও আসিবার সময় ঐ তালপত্রগুলি একখানি ক্ষুদ্র মাদুরে গুটাইয়া লইত। বালক গিরিশচন্দ্র এক বৎসরের অধিককাল পাঠশালায় থাকিয়া, নানারূপ নাম ও পত্রাদি লিখিতে শিক্ষা করেন, তৎসঙ্গে কিছু শুভঙ্করী অঙ্কও শিক্ষা করেন। পল্লিগ্রামে তখন সচরাচর ইহার অধিক আর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

পাঠশালার লেখা সাঙ্গ হওয়ার দুই বৎসর পরে বালক গিরিশচন্দ্র অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় আসেন। পিতার উপর বৃহৎ সংসারের ভরণ পোষণের ভার, তাহার উপর আবার কলিকাতায় রাখিয়া সন্তানকে শিক্ষা দান কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতীয় বালকের অধ্যয়নের নিয়ম ছিল না। তখন উপযুক্ত পণ্ডিত সকল কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলে, রামধন পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিবার জন্য তৎকালীন ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকটে লইয়া গেলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার প্রস্তাব করিলেন। গিরিশচন্দ্রের পিতা বলিলেন, "আমি কি করিয়া দশটার মধ্যে খাওয়াইয়া দিব ;" ইহাতে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "গিরিশ ১০টার মধ্যে আমার বাড়ীতে খাইয়া কলেজে যাইবে।" রামধন এ প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং আপনাকে উপকৃত বোধ করিলেন। গিরিশচন্দ্র দুই বৎসর কাল তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে আহার করিয়া কলেজে পড়িতে যাইতেন। অধ্যবসায়ের গুণে গিরিশচন্দ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করিয়া, কলেজের নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিয়া মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। তখন তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে নিজ বাসায় পাক করিয়া খাইয়া কলেজে আসিতে বলিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে রন্ধন আরম্ভ করিলেন ; তরকারীর মধ্যে অনেক সময় একটা পটলপোড়া হইত, তাহা দিয়াই অন্নাহার করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। সুস্থ শরীর সুখের প্রধান নিকেতন; গিরিশচন্দ্রের শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল।

সংস্কৃত কলেজ হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথিতে বন্ধ থাকিত। ক্রমে ইংরাজ শাসনে সংস্কৃত কলেজে কেবল যবন ব্যতীত সকল জাতীয় বালকের পড়িবার ব্যবস্থা হইল, এবং ঐ দুই তিথির পরিবর্ত্তে, সপ্তাহে রবিবার দিবসই ছুটির দিন ধার্য্য হইল। আরও একটী বিশেষ নূতন কার্য্যের সৃষ্টি হইল, কলেজে কেবল সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র পঠিত হইত, এখন তৎসঙ্গে ইংরাজি সাহিত্য অধ্যয়নের অনুমতি প্রদত্ত হইল। ইংরাজি শিখাইবার জন্য একজন ইংরেজ ও একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

ডিনামাইটের প্রভাবে যেমন বৃহৎ পর্ব্বত সকল চূর্ণীকৃত হইয়া ভূমিসাৎ হয়, অনুরাগ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে সেইরূপ অনেক বিঘ্ন বাধাও আমাদের

সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন বাল্যজীবনে দারিদ্র্যের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের গুণে কলেজে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়া সম্মানের সহিত বৃত্তি লাভ করিতেন, গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ আন্তরিক যত্নের গুণে দুঃখ দারিদ্র্যের বিঘ্ন কাটাইয়া ছাত্র জীবনের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় পিতার যে টোল গৃহে থাকিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহারই কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "টোল ঘরের অবস্থা অতি হীন ছিল। প্রথমতঃ একটী বাহিরের কুটীর তাহাতে ভগ্ন তক্তপোষ পাতা তদুপরি একখানি মৌল দরমা; উহার উপরি দিন রাত্রি অবস্থিতি হইত। আর একখানি অতি মলিন বহু কালীন ছিন্ন মশারী ছিল, ঐ ছিন্ন স্থান সংস্কার জন্য ঝাঁটার কাটি বিদ্ধ করিতাম; ক্রমে এক গাছি ঝাঁটা ঐ কর্ম্মে লাগিয়াছিল। আর মশারির চাল এত নীচু যে শয়ন কালে বুকে ঠেকে। এই জন্য চালের মধ্যস্থানে দড়ি বাঁধিয়া উপরি আড়াতে বন্ধন করিতাম।

ঐ মৌলের উপর সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতাম। কিন্তু যখন ছারপোকা হইত, তখন কষ্টের সীমা নাই; গামছা খানি কাঁধে করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতাম; অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইলে ঐ গামছা দাবায় পাতিয়া তদুপরি কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা হইত।" আর একস্থানে লিখিয়াছেন "বস্ত্র পরিষ্কার জন্য ধোপার কড়ি জুটিত না। পিতাঠাকুর বস্ত্র মলিন হইলে সাজিমাটির জলে ক্ষুদ্র কলসীর ভিতরে বস্ত্র ভিজাইয়া কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লইতেন, পরে লোকলজ্জা ভয়ে রাত্রিকালে পশ্চাদ্বর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া ঐ বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া রাতারাতি শুকাইয়া লইতেন। বাল্যকালে ধোপা কাচা বস্ত্র প্রায় পরা হইত না। এইরূপে অতি দীন ভাবে দিন যাপন করিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলাম।"

এইরূপ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে গিরিশচন্দ্র তের বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সকল পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া কুড়ি টাকা অবধি বৃত্তি লাভ করিয়া পাঠ সমাপনান্তে কলেজ হইতে বাহির হন।

বৈদিক ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে, সেই প্রথানুসারে গিরিশচন্দ্রেরও দ্বাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। পরিণীতা ভার্য্যা গুণবতী ছিলেন, শ্বশুরের সাংসারিক অবস্থা অতি অসচ্ছল; স্বামী তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র; এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রামধন বিদ্যাবাচস্পতির পুত্রবধূ প্রফুল্লচিত্তে সাংসারিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন। গিরিশচন্দ্রের জননীর সাহায্যকারিণী হইয়া তাঁহার পরিশ্রমের লাঘব করিতেন; পুত্রবধূর কার্য্যের প্রতি তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে তিনি একবার একটী পীড়িতা কন্যা ও অন্যান্য ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া দুই মাসের জন্য শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন।

গিরিশচন্দ্রের কলেজের পাঠ সাঙ্গ হইতে না হইতেই, তাঁহার পিতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন; তাঁহার বাকরোধ হইয়া গেল। অন্তিমকালে অতি কষ্টে সন্তানকে কেবল এই অমূল্য উপদেশ বাক্যটি বলিয়াছিলেন, "কাহারও মন্দ করিও না।" গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, যে তিনি আজীবন এই বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন।

আন্তরিক জ্ঞানপিপাসার গুণে গিরিশচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন, সেই বৃত্তিতে এই দরিদ্র পরিবারের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইত। তাঁহার পিতার পরলোক গমনের সময়ে, তিনি পরীক্ষার ফলে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ ঐ ২০ টাকা বেশী দিন পাইতে হইল না; কলজের পাঠ করিবার দিন শেষ হইয়াছিল, সুতরাং কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।"

পিতার পরলোক গমনের পর গিরিশচন্দ্র বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতায়

পিতার যে টোলগৃহে থাকিয়া ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন, মাসিক সামান্য খাজনা দানে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল। গিরিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন উনবিংশতি মাত্র। সমস্ত পরিবারের ভার তাঁহারই মস্তকের উপর পতিত হইল। কিরূপে বৃহৎ গোষ্ঠি চালাইবেন, এই চিন্তাতে তাঁহার শরীর যেন শীর্ণ হইতে লাগিল। পরে দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "গিরিশ ভাবিস্ না; যতদিন তোর চাকরি না হয় আমার বাসায় থাক।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দর্শন করিতেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আর অধিক দিন কষ্টভোগ করিতে হইল না। সে সময় সংস্কৃত কালেজে দুইটি কর্ম্মখালি হয়, একটি ব্যাকরণের পণ্ডিতের পদ, অপরটি পুস্তকাধ্যক্ষের পদ। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে তদানীন্তন সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্ত ইঁহাদিগের পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এই পরীক্ষায় সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৫০৲ টাকা বেতনে ব্যাকরণ অধ্যাপক পদ ও বিদ্যারত্ন মহাশয় ৩০৲ বেতনে পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন।

যে দিবস বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথম মাসের বেতন ৩০৲ টাকা তাঁহার মাতার হস্তে প্রদান করিলেন, সে দিন তাঁহার মনে কিরূপ আনন্দের ঢেউ উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পিতা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার অর্থের অভাব হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র যখন মাতার হস্তে টাকাগুলি প্রদান করিলেন, মঙ্গলা দেবী নিজ স্বর্গগত স্বামীর দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া আনন্দাশ্রুর সহিত দুঃখের অশ্রুও বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ত্রিশ টাকা বেতনে সংসারের কিছু স্বচ্ছলতা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইতে লাগিল, যে যদি আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি, তাহা হইলে, এই বৃহৎ পরিবার কিরূপে চলিবে। সহজেই ন্যায় পথে থাকিয়া আরো অধিক অর্থ উপার্জ্জনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়া "সংস্কৃত যন্ত্র" নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকেও একজন অংশী করিয়া লইলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে কাহারো অর্থ ছিল না। ঋণ করিয়া এই কার্য্যটি আরম্ভ করা হয়। এই প্রেসের পৃষ্ঠপোষকেরা সুপণ্ডিত; তিনজনেই পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নব নব পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থই বহুল প্রকাশিত হইল, তৎপর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ অতীব অল্প। পুস্তক বিক্রয়ের সমস্ত লাভ একটি ফণ্ডে জমা হইত, এবং সেই ফণ্ড হইতে যখন যাহার যাহা লইবার আবশ্যক হইত, তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন, কোষাধ্যক্ষ তাঁহার নামে খরচ লিখিয়া রাখিতেন। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিশেষ পরিশ্রম সহকারে প্রেসের কার্য্যাদি পরিচালন করিতেন, সেজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকেও সমান অংশ দিতেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপ অর্থ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন না, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একদিন বলিলেন, "আপনার রচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না; মদনেরও এই মত হইবে; আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই, পরে যখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ন্যায় আপনার অভিমত প্রকাশ করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অগত্যা তাঁহাদিগের প্রস্তাব অনুসারেই কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত যন্ত্রের ফণ্ড হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, পরে যখন ঐ যন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত হইল, তখন তাঁহার হিসাবে তাঁহাকে আরও দুইশত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত যন্ত্রের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ

করিয়া লালচাঁদ নামক কোন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া সুচারু যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, লালচাঁদ পরলোক গমন করিলে বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই ছাপাখানা হইতে নিজ অংশ স্বরূপ আটশত টাকা প্রাপ্ত হন। লালচাঁদের মৃত্যুর পর মুদ্রাযন্ত্রও উঠিয়া গেল।

মানবের ভাগ্যচক্র নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গিরিশচন্দ্র আটশত টাকা পাইয়া আর একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজ নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই ফণ্ড হইতেই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। মুদ্রাযন্ত্রের আয় ব্যতীত তিনি সংস্কৃত কালেজেও কার্য্য করিতেন। তিনি প্রথমে ৩০ টাকার বেতনে কালেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন, তৎপর ব্যাকরণের অধ্যাপক হন, এবং ক্রমে কালেজের সর্ব্বোচ্চপদে উন্নীত হইয়া ১৫০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন। এই ১৫০ টাকা বেতন আট বৎসর প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে পেন্সন গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যবসায়ের কি অতুল প্রভাব! যিনি শৈশবাবস্থায় গোদুগ্ধ পান করিতে পান নাই বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি এখন যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কেবল অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহা নহে; তাঁহার চরিত্রে আরো অনেক সদ্‌গুণ ছিল।

তিনি স্বদেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কারের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগরের ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনিও বিধবাদিগের অশ্রুজল মুছাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের দলভুক্ত বলিয়া, তাঁহার কন্যার বিবাহের সময় ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। তিনি সে জন্য নিজ কন্যাকে মৌলিক বংশীয় সংস্কৃত কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে পরিণীতা করিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কলিকাতার গড়পারস্থ বাটীতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহ স্থলে সংস্কৃত কলেজের অনেক ছাত্র ও কয়েক জন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র এই বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া কোমরে চাদর বাঁধিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে লুচি পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই সংস্কারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে যে সমাজস্থ লোকের অনেক ভৎর্সনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

বাল্য জীবনে দারিদ্র্যের কষ্ট বিলক্ষণ ভোগ করিয়া পরিণত বয়সে দারিদ্র্যের অভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত করিবার জন্য বিশ হাজার টাকা দিয়া তিনি একটি ফণ্ড স্থাপন করেন। লোকের অনুরোধক্রমে সেটি "গিরিশ বিদ্যারত্ন ফণ্ড" নামে অভিহিত হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় বড় উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফণ্ড হইতে দানের কোন জাতি বিচার নাই। ফণ্ড ব্যতীত, তিনি নানা স্থানে অনেক দরিদ্রদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। নিজ দেশে রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দেশবাসীদিগের অনেক অসুবিধা দূর করিয়া, নিজ গ্রামস্থ লোকের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় যেমন জীবনে বিশেষরূপে আত্ম নির্ভরতার ভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তৎসঙ্গে দয়া, বিনয়, সরলতা, তেজস্বিতা, প্রভৃতি গুণ সকলও বিকশিত হইয়াছিল। দরিদ্রের প্রতি দয়ার কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার এমন বিনয় ছিল, যে কোন সামান্য লোক কোন কথা বলিলে তিনি মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন, এবং "তুমি ঠিক বলিতেছ" বলিয়া তাহার মনে আনন্দ দান করিতেন। অপরদিকে তিনি তেজী পুরুষ ছিলেন। একবার কোন ধনী বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার ফিটনে চড়িয়া বেড়াইতে যান, পর দিন তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আমি আর আপনার ফিটনে বেড়াইতে যাইব না কারণ লোকে তাহা হইলে আমাকে আপনার মোসাহেব বলিবে।" যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি বালকের ন্যায় সরল ছিলেন।

বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, অনেক সময় শারীরিক যন্ত্রণায় বড় অস্থির হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এ অবস্থার মধ্যেও যখন কেহ

থাকিতেন তখন শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেন। অবশেষে দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল; তিনি ১৩১০ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ, ইং ১৯০৩ ৩রা ডিসেম্বর মাসে ভবধাম ছাড়িয়া পরলোকে যাত্রা করেন।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

বসন্তের কাহিনী।

(১)

ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্ত ধৌত করে যে সুনীল ভূমধ্যসাগর তারি মাঝখানে একখানি মরকত মণির মত সুন্দর উজ্জল সবুজ বর্ণের সিসিলি নামে একটী দ্বীপ আছে, আজও আছে বহুকাল আগেও ছিল। সেই বহুকাল আগে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিরিস সেখানে বাস করতেন। তাঁরি স্নেহগুণে পৃথিবী শস্য শ্যামলা, ফল পুষ্পে মনোহরা হয়ে উঠিত; আবার তিনি যেদিন বিরূপ হতেন সে দিন চারিদিকে হাহাকার উঠিত, মাঠে শস্য হত না, গাছে ফুল ফুট্‌তনা, ফল ধর্‌তনা, প্রান্তরে ঘাস জন্মাতনা, মানুষ পশু পক্ষী সব জীব জন্তু হায় হায় করে ফির্‌ত। এত বড় যে বিশাল পৃথিবী, তার যে যেখানে আছে, তিনিই মায়ের মত ভালবেসে সকলের খাদ্য যোগাতেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে ছিল, তাঁকে বড়ই ভাল বাস্‌তেন, একেত একটি মাত্র সন্তানের উপর মায়ের কত ভালবাসা হয়; তার উপর তাঁর মেয়ে প্রসারপিনের মুখখান হাসি হাসি পুট পুটে ফুলের মত সুন্দর, স্বভাবটিও ফুলের মত প্রফুল্ল ও পবিত্র। তার মুখখানি কুন্দ ফুলের মত শুভ্র, ঠোঁট দুখানি আর গাল দুটি কচি কিশলয়ের মত সুকুমার গোলাপী, আর চোখের ভিতর এমনি স্বচ্ছ ঈষৎ নীলের আভা দেখা যেত যে চোখ দুটি দেখিলেই বসন্তের নীল আকাশ মনে পড়্‌ত; তার চুলগুলি সূর্য্যাস্তের সোনালি রং দিয়ে কেউ যেন রঙিয়ে দিয়াছিল। চুল গুলি দেখলে মনে হত সূর্য্যালোক যেন স্নিগ্ধ ও সুকুমার হয়ে রেশমের মত নরম হয়ে তার মুখখানি আর মাথাটিকে ঘিরে রয়েছে। সবশুদ্ধ তার সৌন্দর্য্যের এমন একটি মাধুর্য্য ও চিরনবীন ভাব ছিল, যে তাকে দেখ্‌লে মূর্ত্তিমতী বসন্তশ্রী বলে মনে হত। বসন্ত যেন তাঁর সূর্য্যালোকের নয়ননন্দন স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা, তার তরুণ পুষ্প পাতার লাবণ্য,তার আকাশের নীলকান্তি, তার বাতাসের আন্দোলিত লঘু ভাবটি সব একত্র করে এই সুন্দরী কিশোরী মেয়েটিকে গড়েছিলেন, তাই তার দিকে চাইবামাত্র দর্শকের মনে বসন্তের কথা উদয় হত। প্রসারপিন সারাদিন মাঠে মাঠে মায়ের সঙ্গে তার কাজের সাহায্য কর্‌ত, কুঁড়িটিকে ফুল হয়ে ফুট্‌তে শেখাত, অঙ্কুরটিকে কেমন করে গাছ হতে হয় দেখিয়ে দিত, ফলটিকে পাকিয়ে তুলে রসে ভরে সুমধুর করে দিত, ধানের শীষ গুলি সোনালী ধানে এমনি পূর্ণ করতো যে তারা শস্যের ভারে নুয়ে পড়্‌ত। সারাদিন মায়ের সঙ্গে কাজ করতো, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হেসে খেলে নেচে নেচে গান গেয়ে বেড়াত। একটি গান সে বড় ভাল বাস্‌ত, সেইটি সে প্রায় সর্ব্বদাই গাইত।

বসুন্ধরা মা আমার, তোর এই মৃত্যুহীন বুকে
দেব, নর, পশু, পাখী, তরু, তৃণ জন্মিতেছে সুখে
যে অনন্ত প্রাণ ধারা নিশিদিন দিতেছ সবারে
সে অমৃতে ডুবাইয়া রাখ তুমি রাখ গো আমারে।
বিছায়ে সন্ধ্যার,ছায়া, ধীরে শিশির ঢালিয়া
যে যতনে বর্ণ গন্ধে ফুল গুলি তোল ফুটাইয়া,
তৃণাঙ্কুরে জন্ম দাও, সে সোহাগ নিশিদিন ধরে,
দেও মোরে মা আমার অবিরাম দেও তুমি মোরে!

পৃথিবীর অনেক নীচে রসাতলপুরে প্রেতলোকে মৃত রাজ্যের দেবতা প্লুটো বাস করতেন, তাঁর অন্ধকার মূর্ত্তি দেখ্‌লে ভয়ের সঞ্চার হত; তিনি তাঁর রাজ্যে একলাই বাস করতেন, মৃত আত্মারা ছায়ার মত তাঁর চারিদিকে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু তাঁর সঙ্গী কেউ ছিল না, আর সেই ছায়াদের সঙ্গে ভিন্ন তিনি যে দুটো কথা কইবেন, এমন একটি বন্ধুও কাছা কাছি কেউ ছিল না। কতবার তিনি কত দেবীকে তাঁর রাজ্যের রাণী হয়ে তাঁর সিংহাসনের সঙ্গী হয়ে সেখানে এসে বাস করবার জন্যে কত অনুনয় বিনয় করেছিলেন, কত ধন রত্ন মণি মাণিক্য দেবার

প্রলোভন দেখিয়েছিলেন তবু আমাদের এই পৃথিবীর সূর্য্যালোক, এই আকাশ এই বাতাস, এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য ছেড়ে কেউ তাঁর অন্ধকার রাজ্যে যেতে সম্মত হয়নি। প্লুটো একদিন আমাদের পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁর কালো কালো তেজী আট ঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়ে মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় পাশের বনের মধ্য হতে অল্পবয়স মেয়েদের গলার স্বর আর মিষ্টি হাসি শুন্‌তে পেলেন। তাঁর সেই স্বর, আর সেই হাসি এতই মিষ্টি লাগ্‌ল যে গাড়ী থামিয়ে তিনি নেমে পড়্‌লেন, যে দিক হতে হাসির আওয়াজ আস্‌ছিল, সেই দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে ছোট ছোট গাছের বেড়া ফাঁক করে দেখলেন, কে হাস্‌ছে! দেখলেন প্রসারপিন্‌ মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর তার সখীরা চারিদিকে তাকে মালার মত ঘিরে ধরে, চারিদিক হতে তার গায়ে ফুল ছুড়ে মারছে, আর হাসছে। সে দৃশ্যটি তাঁর চোখে এমনি সুন্দর লাগল, যে তাঁর পাষাণের মত কঠিন হৃদয় দ্রব হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠিল। প্রসারপিনের সুন্দর মুখখানি অতৃপ্ত চোখে দেখে তিনি বল্লেন একেই আমি রাণী করব, এই সুন্দর আলোর মত মুখখানি, একে যদি নিয়ে যাই তাহলে আমার সেই অন্ধকার রাজ্যও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, একে আমি কিছুতে ছেড়ে যাব না, ডাকলেত আসবেনা; জোর করে নিয়ে যেতে হবে। এই মনে করে গাছের আড়াল সরিয়ে তিনি তাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। তরুণ মেয়ে গুলি তাঁর সেই ভীষণ আকৃতি, বর্ষার মেঘের মত গম্ভীর অন্ধকার মুখ দেখে যে যেদিকে পারলে ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল— প্লুটো তাড়াতাড়ি প্রসারপিনকে তুলে নিজের গাড়িতে নিয়ে গেলেন। তেজী আটটি ঘোড়া বাতাসের মত বেগে ছুটে চলল, প্রসারপিনের সঙ্গীরা মুহূর্ত্তের মধ্যে কত দূর হয়ে পড়ল। পাছে সিরিসের সম্মুখে পড়ে যান, মা মেয়েকে কেড়ে নেয় এই ভয়ে প্লুটো অনেক ঘোরান রাস্তা দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে চল্লেন। যেতে যেতে একটি নদীর সম্মুখে এসে পড়্‌লেন, নদীর দেবতা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে প্লুটো পৃথিবী দেবীর মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই তার গতি রোধ করবার জন্যে নদীর জলে বন্যা সৃষ্টি করলেন। জল কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। দুই তীর ছেয়ে পড়ল, প্লুটো দেখলেন গাড়ী চালান নিরাপদ নহে। তখন তাঁর হাতের দণ্ড দিয়ে মাটীর উপর তিনবার আঘাত করলেন—সেখানটা ফাঁক হয়ে গেল তিনি সেই পথে আপনার চির অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রসারপিন্‌ বুঝতে পেরেছিলেন যে নদীর দেবতা তাঁকে চিন্‌তে পেরেছেন আর তাঁকে রক্ষা করবার জন্যেই বন্যার সৃষ্টি করেছিলেন তাই পাতালে প্রবেশ করবার সময় তাড়াতাড়ি আপনার কটিদেশের মেখলা খুলে তুলে নদীর জলের মধ্যে ফেলে দিলেন, আশা করলেন, যদি কোন উপায়ে মেখলাটি পৃথিবী দেবীর কাছে পৌঁছায়, তাহলে একদিন নিশ্চয় এসে তিনি হারান মেয়েকে উদ্ধার করবেন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বীরবালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৃথ্বীরায় মহারাণার অন্যতম পুত্র; কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আজ মহারাণা আবার সস্নেহে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। পৃথ্বীরায়ের সরল অন্তঃকরণ, সস্নেহ ভালবাসা চিতোরবাসীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা এই কয়েক বৎসরের অদর্শনে মুছিয়া যায় নাই। তাই আজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য চিতোরবাসী উন্মত্ত। ফুলের আভরণ, ফুলের তোরণ, ফুলের মালায় আজ যেন চিতোর নগরী হাসিতেছে, প্রকৃতিদেবী নব আভরণে সজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রিয় সহচরী দিকবধূর সহিত যুবরাজের প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। আর চিতোরজননী পাঞ্চজন্যের মধুর নিনাদে সন্তানের মঙ্গল ঘোষণা করিতেছেন।

বহু দিনের পর পৃথ্বীরায় আবার চিতোরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চিতোরবাসী বহু দিনের পর আবার তাঁহাকে পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল। তাঁহার ন্যায় সুন্দর, তাঁহার ন্যায় সাহসী, তাঁহার ন্যায় বীর পুরুষ তৎকালে রাজপুতানায় দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ। সমগ্র রাজপুতনায় যদি কেহ তারার উপযুক্ত পাত্র থাকেন তিনি এই পৃথ্বীরায়। তারা পৃথ্বীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিল, পৃথ্বী ও তারাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মিলনের পথে ভীষণ বাধা রতন সিংহের প্রতিজ্ঞা।

পৃথ্বীরায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি তবে আবার চিতোর রাজ্যে ফিরিয়া আসিব, নচেৎ এ জীবনের শেষ সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে।" তিনি দুই শত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া থোডা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য তারাও তাঁহার সঙ্গিনী হইল।

ক্রমাগত অশ্বচালনের পর তাঁহারা এক গভীর অরণ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেই অরণ্য পার হইলেই তাঁহারা অভীষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিবেন। এখান হইতে থোডা কেবল অর্দ্ধক্রোশ মাত্র ব্যবধান। সেই গভীর অরণ্যেই পৃথ্বীরায় সে দিনের মত শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পৃথ্বীরায় ভাবিলেন কাল মুসলমানদিগের মহরম, সেই দিনই তাহাদের হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করা যাইবে। কিন্তু সে বড় ভয়ঙ্কর দিন। সে দিন প্রত্যেক মুসলমানই উত্তেজনায় উন্মত্ত প্রায়। প্রত্যেকেই যেন কালান্তক যমরূপে অবতীর্ণ। কিন্তু পৃথ্বীরায় এই দিনই তাহাদের আক্রমণের দিন স্থির করিলেন।

সন্ধ্যার প্রারম্ভেই তিনটী রাজপুত অশ্বারোহী দুর্গাভিমুখে চলিয়াছেন। পাঠক ইহাঁদের চিনিতে পারেন কি? ইহাঁরা আর কেহই নন্,—আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পৃথ্বীরায়, তারা ও শঙ্কর। শঙ্কর পৃথ্বীরায়ের প্রিয়বন্ধু। অতি বাল্যকাল হইতে পরস্পর পরস্পরকে আপন সহোদরের ন্যায় দেখিতেন। তাঁহারা তিন জনেই অতি সন্তর্পণে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব হইতে সৈন্যগণকে অতি ধীরে ধীরে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দেওয়া হইয়া ছিল। এখন রাজপুত সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে দুর্গের পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারও মুখে একটী কথা নাই। সকলেই নির্ব্বাক নিস্তব্ধ যেন পাষাণের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি অনেক দিন হইতে এমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে দুর্গের অভ্যন্তরের অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। পৃথ্বীরায়, তারা ও শঙ্কর এখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাশি রাশি মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। চতুর্দ্দিকে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। আর্ত্তনাদের করুণ স্বরে দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অসজ্জিত সৈন্যগণ কোন উপায় না দেখিয়া যে যে দিকে পারিল সেই দিকেই ছুটিল। তখনই দামামায় ঘা পড়িল। তৎক্ষণাৎই দুর্গের দ্বার অবরুদ্ধ হইল।

পৃথ্বীরায় এইরূপই আশা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যদি তিনি স্বসৈন্যে দুর্গ আক্রমণ করিতেন তাহা হইলে কখনই এত সত্বর কার্য্যোদ্ধার হইত না। মুসলমানগণ তাঁহাদের অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শ্রবণ করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিত তারপর দলে দলে তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িত। এই জন্যই তিনি সৈন্যগণকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়া কেবল তারা ও শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন তখন সকলের চক্ষু তাঁহাদের উপরেই পড়িল, বাহিরের কোন কাজে আর দৃষ্টি রহিল না। এই সময়ে পৃথ্বীরায় দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজপুত সৈন্যগণ দলে দলে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য একবার মাত্র চেষ্টা করিল কিন্তু তাহা বৃথা হইল। মুষ্টিমেয় রাজপুতের কাছে আজ অসংখ্য মুসলমান সৈন্যের বিজয়গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তারা পৃথ্বীরায়ের পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আজ যেন তারা আর সে তারা নাই। যেন কোন ঐশী শক্তি তাহার কোমল

হৃদয়কে নাচাইয়া তুলিয়াছে। তারা আজ রণচণ্ডী সাজিয়া দুই হস্তে শত্রু নিধনে ব্যস্ত। সন্ধ্যার মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল। রাজপুতের আজ আর উল্লাসের সীমা নাই। মুসলমানের রাশি রাশি মৃতদেহ তাহাদের পরিণাম জানাইতেছিল। থোডা আবার স্বাধীন হইল।

বলা বাহুল্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই পৃথ্বীরায়ের সহিত তারার বিবাহ হইয়া গেল। রতনসিং আবার স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু অল্প দিন পরই তিনি পৃথ্বীরাজকে রাজ্য দিয়া বিদ্নরে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে অতি সুখে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পৃথ্বীরায়ের এক অত্যন্ত প্রিয় ভগিনী ছিল। তাহার নাম কৃষ্ণা। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। এই যুবকের নৈতিক চরিত্র তত ভাল ছিল না। কৃষ্ণা এই চরিত্রহীন যুবকের সহবাসে এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারে নাই। ইহার অত্যাচার দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া কৃষ্ণা পৃথ্বীরায়ের আশ্রয় লইল। অতি গোপনে একখানি পত্র লিখিয়া পৃথ্বীরায়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। পৃথ্বীরায় যে দিন পত্র পাইলেন সেই দিনই কৃষ্ণার সহায়তার জন্য যাত্রা করিলেন। উদ্ধত প্রকৃতির যুবককে অনেক প্রকারে ভৎর্সনা করিলেন; এমন কি তিনি পত্নীর ব্যবহৃত পাদুকা মস্তকে করাইয়া তাহার পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাইলেন। এই অপমান যুবকের হৃদয়ে আঘাত করিল। প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। সে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মনে মনে এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া পৃথ্বীরায়কে সম্মান দেখাইতে ক্রটী করিল না। সে দিন এক মহাভোজের আয়োজন হইল। সরল প্রকৃতি পৃথ্বীরায় জানিত না যে এই আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনের বিরুদ্ধে এক মহা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভোজের সময় গোপনে সরবতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পৃথ্বীরায় সেই সরবত পান করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বিষের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল। তারা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। বৃদ্ধ পিতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুমূর্ষু পুত্র দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হায়! অনেক চেষ্টা করিয়াও আর পৃথ্বীরায়কে রক্ষা করা গেল না।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে সতীদাহ ছিল। তারা ইহকালে পৃথ্বীরায়ের সঙ্গিনী ছিল পরকালেও তাহাই হইতে চলিল! মহারাণা রতন সিং প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন, এমন কি সমুদয় চিতোরবাসী তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, অনেক প্রবোধ দিলেন কিন্তু তারা তাহার কর্ত্তব্য হইতে এক বিন্দুও বিচলিত হইল না।

যথা সময়ে চিতা সজ্জিত হইল অতি ধীরে ধীরে পৃথ্বীরায়ের মৃতদেহ চিতায় স্থাপিত হইল। তারার চিত্ত যেন বড় প্রফুল্ল। ইতিপূর্ব্বে তাহার হৃদয়ে যে প্রবল শোকের তুফান উঠিয়াছিল তাহা যেন হঠাৎ প্রশমিত হইয়া আনন্দ স্রোত বহিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তারা ধীরে ধীরে চিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। জন্মের শোধ স্বামীর পদধুলি লইল। তারপর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের সহিত চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর সহগামিনী হইল। চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল। দামামা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতির বাদ্যে দিক্ নিনাদিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তারার কোমলাঙ্গ নিশ্চল, নিস্তব্ধ—যেন চিতা প্রজ্জ্বলিত হইবার বহুপূর্ব্বে তাহার প্রাণ অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলই শেষ হইয়া গেল। পৃথ্বী ও তারার নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হইল। কিন্তু আজ তাহারা ইতিহাসের এক অঙ্কে যে বীর কীর্ত্তি রাখিয়া গেল চিতোরবাসী তাহারই একটা ক্ষীণ স্মৃতি লইয়া গৃহে ফিরিল।

শ্রীগুরুদাস আদি[illegible]।

কৃপণের বুদ্ধি।

(গাথা)

১

নামটী বটে 'দয়াল রায়'
কাযে নিদয় অতি,—
কুসীদ জীবি চায়না ফিরে
কারো মুখের প্রতি!
দেশের লোক শঙ্কা করে
কয় না কোন কথা,—
দয়াল ভাবে ছলনা শুধু
নরের কাতরতা!
হাজার টাকা দৈনিক আসে
করে না 'কড়ি' দান,—
সকাল বেলা লয় না কেহ
তাইতে তার নাম!
কৃপণ যারা এমনি তারা
সবার ঘৃণা সয়,—
দেয়না সুখ কারেও কভু
নিজেও সুখী নয়!

২

একদা হায় দয়াল রায়
বিপদে পড়ি ভাবে,—
'গাভীটী মরে গোয়াল ঘরে
টাকাটী আজ যাবে!
এখনো যদি বামন ডেকে
করি ইহার দান,—
পুণ্য হবে বিফল ব্যয়ে
অমনি পাব ত্রাণ!'
বামন এসে সভয়ে কয়
"শুন দয়াল-রায়,
এমন গাভী নিয়ে কি ফল
প্রাণটী বুঝি যায়!
দিবে গো তুমি গণ্ডা দুই
দক্ষিণা আমায়,—
ফেল্‌তে এরে টাকাটী মোর
বৃথাই যাবে হায়!"
দয়াল হাসি কয় "ঠাকুর,
কর্‌ছি দান তা'ই,—
সবল গাভী দিব তোমায়
মূর্খ নহি ভাই!"
অবাক্ দ্বিজ কয় না কথা
কবো গো কিবা আর,—
দান না নিলে দয়াল রায়
দিবেন সাজা তার!
মরলো গাভী খানিক পরে
দ্বিজের হাহাকার,—
সবাই কহে "এমন দাতা
বিশ্বে মেলা ভার!"

৩

কালের ভেরী একদা কবে
বাজে গভীর রবে,—
ধনের খেলা দয়াল রায়ের
সাঙ্গ হল ভবে!
কৃপণ-মণি ধনের মায়া
অনিচ্ছায় ছাড়ি'
যমদূতের সঙ্গে গেল
যম রাজের বাড়ী।
সেথার কথা কব কি আর
পার বুঝ্‌তে বেশ,—
যেমন কাজ তেমনি ফল
দুখের নাহি শেষ!
চিত্রগুপ্ত মন্ত্রী মশাই
মস্ত খাতা খুলে,
দয়াল রায়ে কহেন ধীরে
"যাও নি আজো ভুলে'
সারা জনম কেবলি পাপ
দহন শুধু পরে,
পুণ্য এক গাভীটি দান
তা'ও যখন মরে!
ইহার ফলে অশেষ ক্লেশ
অনাদি কাল ধরে'—
কেবল পাবে একটু সুখ
দণ্ড দুই তরে!
এখন কহ দয়াল রায়,
কোন্‌টি আগে চাও?"—
দয়াল কহে "আমায় প্রভু
সুখটি আগে দাও!
চিন্তা কিছু রবে না আর
সুখের তরে তবে,—
যতই ব্যথা দাওনা কেন
সহজেই তা' সবে!"

৪

যম রাজার আদেশ মত
বৃষভ এল এক,—
আপনি রাজা কহেন তারে
"ওরে দয়াল দেখ্!
বাঞ্ছা মত যে সুখ চাস্
ইহারি কাছে পাবি,—
দণ্ড দুই মিটায়ে আশ
রয় না যেন দাবী!"
দয়াল হেসে কয় "রে বৃষ,
আমার তুমি যদি
গুঁতাও তবে, গুঁতাও এঁরে
কঠোর যাঁর বিধি!"
পলকে বৃষ নোয়ায়ে শিং
যমের পানে ধায়,—
চিত্রগুপ্ত খাতাটি ফেলে
মুহূর্ত্তে পলায়!
সিংহাসন তেয়াগি যম
করেন চেঁচামেচি—
"রক্ষা কর, রক্ষা কর,
এবার বাবা, গেছি!"
কেই বা শোনে কাহার কথা
দয়াল জোরে হাঁকে—
"আচ্ছা করে গুঁতাও বৃষ,
ছেড় না কভু তাঁকে!"
বিষম দেখে তিনটি লাফে
যমের পলায়ন,—
পিছনে ছোটে ক্ষেপা বলদ
যেমন সমীরণ!
বুদ্ধিমান দয়াল রায়
ছুটে তারও পিছে—
"গুঁতাও ত্বরা" চীৎ করিয়া
হর্ষ ভরে কি যে!
নিমেষ মাঝে ত্রিলোক-ভরি
দারুণ কোলাহল,—
বাঁচাবে কেবা শমন রাজে
কাহার হেন বল!
দেবের কথা দেবে নারেন
ফিরাতে যেগো কভু,—
এম্‌নি করে ভুগেন কত
শিক্ষা নহে তবু!

৫

লক্ষ্মী সাথে গোলক ধামে
যেথা হরির বাস,—
শমন শেষে ছুটেন নিতে
শরণ তাঁরি পাশ
তখন দোঁহে অন্তঃপুরে
ছিলেন ঘুমাইয়া,—
যমরাজের আর্ত্তরবে
জাগেন চমকিয়া!
সেথায় পলে উপস্থিত
তিনটি মহাপ্রাণী—
দয়াল বৃষ, স্বয়ং যম,
ভীষণ হানাহানি!
ভেবেই দেখ ব্যাপার খানা
হল কেমন ধারা,—
লুকান দেবী হরির পাছে
ভয়েই হয়ে সারা!
আঁচলে তাঁর লুকাতে যম
করেন তাড়াতাড়ি,—
ছুটে বৃষভ পিছনে তাঁর
তীখণ শিং নাড়ি!
"গুঁতারে গুঁতা" হাঁকে দয়াল
পিছুনে তার ছুটি—,
চেঁচান লক্ষ্মী চেঁচান যম,
কণ্ঠ গেল টুটি!
বুঝ্‌তে নারি কিছুই হরি
আপনি ভ্যাবাচাকা,—
তিনটি লোক ত্রস্তে কাঁপে
হবে না বুঝি থাকা!
সহসা হরি বুদ্ধি করি
দয়ালে ডেকে কন,
"ক্ষান্ত হও, দিচ্ছি বর
তোমায় বাপ ধন!"
থামায়ে বৃষে যুক্ত করে
কহে দয়াল রায়,—
"দয়াল হরি, বাঞ্ছা ছিল
দেখ্‌ব তোমা হায়!
মিট্‌ল আশা চাইনে কিছু
কি লাভ আর বরে
হেরিনু তোমা এ পাপে চোখে
দণ্ড দুই তরে!

এখন মোরে বিদায় কর
যমের পুরী যাই,—
আজন্মের কুকর্ম্মের
ভুঞ্জি ফলটাই!"
দয়াল হরি কহেন হেসে
"কোথায় যাবে আর,
দেখ্‌লে মোরে পাপের বোঝা
রয় কি কভু কার?
এখন হতে তুমি আমার
হইলে সভাসদ্,—
নরক ভোগ তোমার আমি
করিয়া দিনু রদ!"

* * * *

* * * *

সবিস্ময়ে গাহে বিশ্ব
"ধন্য দয়াময়!
কৃপণ ধনী বুদ্ধি বলে
করিল যমে জয়!!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

এক বুড়োবুড়ির গল্প।

(জাপানী)

এক বুড়ো ও বুড়ির এক পোষা কুকুর ছিল। কুকুরটিকে তারা বড় ভালবাসত। তাদের ছেলেপুলে ছিল না, কুকুরটিকে তারা আপনার ছেলের মত দেখত। কুকুরটিও বুড়োবুড়িকে বড় ভাল বাসত। এক দণ্ড তাদের কাছ-ছাড়া হত না। বুড়ি বসে বসে যখন রান্না করত কুকুরটা রান্নাঘরের চৌকাট আগলে বসে থাকতো। রান্না শেষ হলে বুড়ী এসে কুকুরটার মুখ ধরে আদর করে চুমু খেত—কুকুরের প্রাণে তখন আর আহ্লাদ ধরত না। সে বুড়ির বুকের মধ্যে মুখ নিয়ে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কত কথাই বলত—কত আদর জানাত! রাত হলে বুড়ি কুকুরটাকে নিজের বিছানায় নিয়ে বুকের মধ্যে করে ঘুমত। সে যেন ঠিক তারই পেটের ছেলে!

একদিন ভোররাত্রে বুড়ি স্বপ্ন দেখলে, সে আর তার স্বামী যেন এক গহন বনের মধ্যে গেছে। তারা ছাড়া আর জন-মনিষ্যি সেখানে নেই, কেবল কুকুরটা সঙ্গে আছে। সেই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। যেতে যেতে যেতে যেতে তারা এক জায়গায় এসে পড়ল, যার পর আর যাবার যো নেই—সামনে এক প্রকাণ্ড পাহাড়! কুকুরটা তাদের সঙ্গে করে একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করল; গুহার সামনেটা ঘোর অন্ধকার, কিন্তু ভিতরটা জল্ জল্ করে জল্‌ছে। সেখানে মণি, মাণিক, মুক্তো হীরে জহরত মোহর পাহাড়ের মত থাকে থাকে সাজানো; লাল নীল সবুজ হলুদ কত রকমের তাদের যে রং তার ঠিক নেই! বুড়ো বুড়ী অবাক হয়ে সেই সব দেখতে লাগলো। এদিকে ভোর হয়ে আসতে কুকুরটা ভেউ ভেউ করে ডেকে উঠলো তাতেই বুড়ির স্বপ্ন ভেঙে গেলো।

বুড়ি সকালবেলা বুড়োকে স্বপ্নের কথা সব বললে। বুড়ো শুনে অবাক!

কিছু দিন যায়। একদিন বুড়ো কাঠ কাটতে বনে গেছে, কুকুরটাও সঙ্গে আছে। কাঠ কাটতে হাঁপিয়ে পড়ে বুড়ো এক গাছতলায় বসে একটু জিড়িয়ে নিচ্ছে; এমন সময় দেখলে কুকুরটা দৈত্যের মত একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় উপুড় হয়ে পড়ে সেখানকার মাটি নখ দিয়ে কেবলই আঁচড়াচ্ছে। সেই গাছে ছিল একটা বুড়ো শঙ্খ চিল, সেটা প্রাণপণে চীৎকার করছে। বুড়ো ভাবলে কি ব্যাপার! সে কুকুরকে ডাকলে, কুকুর তাতে একবার ভেউ ভেউ করে করে উঠলো, কিন্তু সেখান থেকে নড়লো না;—আরো জোরে মাটি আঁচড়াতে লাগলো। কি হয়েছে তাই দেখবার জন্য বুড়ো সেই গাছের দিকে এগিয়ে গেল। কুকুরটা তাকে দেখে তার মুখের পানে চেয়ে কেঁউ মেঁউ করে কি যেন বললে। বুড়ো তা বুঝতে পারলে না। কুকুরটা তখন তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে প্রাণপণে মাটির উপর আঁচড় দিতে লাগলো। কি-জানি-কেন ওদিকে গাছের মাথায় চিলটাও মনের দুঃখে ডানা ছুটে ঝটাপট্ ঝটাপট্

করতে লাগলো—আর থেকে থেকে চিরিরি চিরিরি করে কুকরে উঠতে লাগলো।

কুকুর আঁচড়ে আঁচড়ে অনেকটা মাটি খুঁড়ে ফেল্লে। বুড়ো মনে করলে আমিও খুঁড়ে দেখি না, কি আছে। বুড়ো তখন কোদাল ধরে মাটি খুঁড়তে লাগলো। খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে কোদালের মাথা ঠুং করে কিসের গায়ে লাগলো। বুড়ো তাতে হাত দিয়ে দেখে, একটা কলসী।

মাটি খুঁড়ে কলসী বেরুল। কলসীর ভিতর চকচকে মোহর।

বুড়ো সে দিন কাটের বোঝা মাথায় না নিয়ে মোহরের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফিরল। বুড়ি দেখে তো অবাক—ফোগলা মুখে হাসি ধরে না, বল্লে—"ওমা! স্বপ্ন তো তবে ঠিক—এই তো সেই মোহরের পাহাড়!"

কেমন করে পাড়াময় জানাজানি হয়ে গেল বুড়ো কাঠুরে বনের মধ্যে থেকে এক রাশ মোহর পেয়েছে, তার কুকুরটাই সেই মোহর মাটি আঁচড়ে বার করছে। সকলে বল্লে—"ও কুকুর নয়, যক্ষের চর। যক্ষের ধন কোথায় লুকান আছে ও সব জানে!"

এ দিকে বুড়োবুড়ির দুঃখ ঘুচে গেল—ভাঙা কুঁড়ে ভেঙে কোটা উঠলো; বাড়ীতে দাস দাসী ধরে না। সোনার পালঙে পালকের গদীতে শুয়ে তারা ঘুমত, দাসীরা পা টিপত, গান গেয়ে তাদের ঘুম ভাঙাতো। কুকুরের আদর ধরেনা, সোনার থালে তার খাবার আস্‌তো, জরি-মোড়া কিংখাপের জামা গায়ে দিত, সোনারখাটে পালকের বিছানায় বুড়ির পাশে ঘুমত।

পাড়ায় আর এক কাঠুরে ছিল সেও ভারি গরীব;—দুবেলা দুমুটো খেতে পেতোনা। বুড়োবুড়ির এই ঐশ্বর্য্য দেখে তার ভারি হিংসা হল। সে একদিন বুড়োর কাছে গিয়ে বল্লে—"ভাই, তোমার কুকুরটা আমার এক দিনের জন্যে দেবে!"

বুড়ো ভালমানুষ, অতশত বোঝেনা, সে বল্লে—"বেশত! নিয়ে যাওনা!"

কাঠুরে কুকুরটাকে সঙ্গে করে বনের মধ্যে নিয়ে গেল; নিয়ে গিয়ে বল্লে—"কোথায় মোহর আছে খোঁড়্!" কুকুর সে কথায় কান দিলে না, আপন মনে লেজ আর কান নাড়তে লাগলো। কাঠুরে বল্লে—"খোঁড়!" কুকুর চুপ্ করে গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাঠুরে রেগে উঠে বল্লে—"খোঁড় বলচি নইলে টের পাওয়াবো! কোথায় মোহর আছে বার কর!"

কুকুর সে কথায় নড়লনা;—যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল!

কাঠুরে রেগে উঠে তাকে মারতে লাগলো। কুকুর ডাক ছেড়ে ভেউ ভেউ করে উঠলো। কাঠুরে আরো মারতে লাগলো! তখন কুকুরটা প্রাণের দায়ে দৌড়ে গিয়ে বনের এক জায়গা নখ দিয়ে ঘস্ ঘস্ করে আঁচড়াতে আরম্ভ করলে। কাঠুরে ভাবলে ঠিক হয়েছে! মোহর পাবার আনন্দে সে লাফিয়ে উঠল! কুকুরের আঁচড়ানো জায়গাটা সে এক খানা কোদাল এনে খুঁড়তে লাগলো! খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে পাহাড়ের মত মাটি উঁচু করলে; হাত দুখানা ভেঙ্গে এল, গা বেয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরতে লাগলো, তবু তো কই মোহর দেখা যাচ্ছে না! কাঠুরে ভাবলে এখানে নিশ্চয়ই অনেক মোহর আছে তাই এত খুঁড়তে হচ্ছে! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুঁড়ে কাঠুরে মাটির সঙ্গে গাঁথা এক কলসী দেখতে পেলে, তাড়াতাড়ি সেইটে তুলে নিলে। মনে করলে এত পরিশ্রম এতক্ষণে সফল হ'ল! কলসীটাকে যত্ন করে নিয়ে তার গায়ের মাটি ছাড়িয়ে, মাথায় করে কাঠুরে বাড়ি চল্লো। বাড়িতে এসে বল্লে—"গিন্নি! গিন্নি! দেখ কি এনেচি!"

গিন্নি হাত বাড়িয়ে বল্লে—"কই দেখি!"

কাঠুরে হাত সরিয়ে নিয়ে বল্লে—"খপরদার ছুঁয়ো না—এ কলসীর গায়ে আমি কাউকে হাত দিতে দেবো না!"

গিন্নী এই কথায় চটে উঠলো, বল্লে—"আমি বুদ্ধি দিয়েছি তাইতে তো মোহর পেয়েছ, নইলে মোহর পেতে কোথা! ও মোহর আমার! দাও আমাকে!"

কাঠুরে বল্লে—সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

মোহরের ঘড়া মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলুম—সে মোহর তোমায় দেবো—কি কথাই বল্লে!"

মোহরের ঘড়া নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এ ওর হাত থেকে টানে ও এর হাত থেকে টানে। এমনি করতে করতে ঘড়াটা দুজনের হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেল। এ কি? আরে ছ্যাঃ! দুর্গন্ধঃ! কাঠুরে আর তার স্ত্রীর গা ময়লায় ভরে গেল! কাঠুরে তো চটে আগুন! একখানা কাটের চেলা নিয়ে কুকুরটার মাথায় ধাঁ করে বসিয়ে দিলে—তাইতেই কুকুরটা মরে গেলো।

কাঠুরে তখন তার স্ত্রীকে বল্লে—"তুই এই ময়লা সাফ্ কর্—দুর্গন্ধে ঘরে টেঁকা যাচ্ছে না!"

স্ত্রী রেগে বল্লে—"আমার বয়ে গেছে! মাথায় করে ময়লা বয়ে নিয়ে এলি সে ময়লা আমি সাফ্ করবো!"

কাঠুরে তখন কি করে নিজের হাতে সেই ময়লা সাফ্ করে রাত দুপুরে স্নান করে এসে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে পড়ল। রাগে তার গা জ্বলতে লাগলো। সকাল বেলা উঠে কুকুরটাকে এক গাছতলায় পুঁতে ফেল্‌লে।

বুড়োবুড়ির কানে খপর গেল তাদের কুকুরটি গেছে। তারা মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলো। বুড়ীর মুখে আর আহার রোচে না, রাতে ঘুম হয় না;—কুকুরের জন্য প্রাণ ছটফট করে!

এ দিকে হোলো কি? না, যে গাছের তলায় কুকুরটাকে পুঁতে ফেলেছিল, সেই গাছটা দেখতে দেখতে একটা প্রকাণ্ড গাছ হয়ে উঠলো—আকাশে তার মাথা ঠেকে, ক্রোশ জুড়ে তার বেড়!

সেই গাছটা বুড়োবুড়ির ছিল। সেটা যখন এত বড় হয়ে উঠলো তখন বুড়ো করলে কি, না, তারই একটা মোটা দেখে ডাল নিয়ে একটা জাঁতা তৈরি করালে। সেই জাঁতায় গম পেষা হবে। কি আশ্চর্য্য! জাঁতার এমন গুণ কেউ কখনো দেখেনি—একবার গম দিয়ে পিষতে আরম্ভ করেই দেখলে অফুরন্ত গম ভেঙে ভেঙে জাঁতা বেয়ে উপচে পড়চে, আর গম দেবার দরকার হচ্ছে না, কোথা থেকে আপনা আপনিই আসচে। যত খুসি জাঁতা ঘুরিয়ে যাও কেবল গম গম গম! এই জাঁতা ঘুরিয়ে যে গম পেলে বুড়ো তাই বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা করলে।

কাঠুরে যখন এই কথা শুনলে তখন তার প্রাণ হিংসায় জ্বলতে লাগলো। সে আবার বুড়োর কাছে গেল। গিয়ে বল্লে "ওগো, তোমাদের জাঁতাটা আমাকে একবার দেবে?"

বুড়ো ভালোমানুষ, কাঠুরে যে তার কুকুর মেরে ফেলেছে সে কথা সে মনে করেই রাখেনি। সে কাঠুরেকে বল্লে—"তার আর কি? নাও না!"

কাঠুরে বাড়ি গিয়ে জাঁতায় গম পিষতে লাগলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তার বেলায় সব উল্টে গেলো। সে যত গম দেয় জাঁতা তা কিছুতেই পিষতে চায় না, যত গম ঢালে সে গম যে কোথায় উড়ে যায় তার ঠিক নেই একটুও জাঁতার মুখ থেকে বেরোয় না। এমনি করে কাঠুরের অনেক গম লোকসান হল। সে রেগে উঠে জাঁতাটা মড়মড় করে ভেঙে ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। তার পর তার ছাই নিয়ে বুড়োর কাছে গিগে এসে বল্লে—"এই নাও তোমার জাঁতা!"

বুড়ো আর সে ছাই নিয়ে কি করবে? সে সেগুলো হাতের মুটোয় নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে। বাড়ীর সামনে কতক গুলো মরা ফুলগাছ ছিল, ছাই বাতাসে উড়ে এসে যেমন সেই মরা গাছগুলোর গায়ে লাগলো অমনি সেগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠলো—ফুলে ফুলে তাদের গা ভরে গেল।

সে দেশের রাজ-কন্যার ভারি ফুলের সখ। কিন্তু ফুল বাগানে বছর বছর তাঁর অনেক ফুল গাছ মরে যেতো। রাজকন্যা যখন মরা গাছ জ্যান্ত হওয়ার কথা শুনলেন তখনি তিনি অনেক টাকা দিয়ে বুড়োর কাছ থেকে সেই ছাই কিনে নিলেন। দেশের চারদিকের লোকে বুড়োর নাম গাইতে লাগল। রাজা তাকে আদর করে ডেকে নিয়ে নিজের রাজ সভায় বসবার আসন দিলেন—ধনে মানে বুড়ো গ্রামের সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠলো।

কাঠুরের তাতে হিংসা ধরে না। সে আবার বুড়োর

কাছে গেল। তার কাছ থেকে চারটি ছাই চাইলে। বুড়ো তখনি দিয়ে দিলে। কাঠুরে সেই ছাই নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে। দেখতে দেখতে চারদিকের গাছপালা দুলিয়ে ঝড় উঠলো। রাজকন্যা ঠিক সেই সময় সখীদের নিয়ে ছাতে বসে নানা রঙের ফুল মিলিয়ে মালা গাঁথছিলেন; ঝড়ের সঙ্গে উড়ে এসে এক তাল ছাই তাঁর চোখে পড়ল। রাজকন্যা হাতের মালা ফেলে দিয়ে নীলাম্বরীর আঁচল নিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। সখীরা সব বলে উঠলো—"কি হল? কি হল?" রাজকন্যা বল্লেন "কি জানি ভাই. কোথা থেকে কি ঝড়ে উড়ে এসে চোখে পড়ল!" সখীরা বল্লে "দেখি দেখি!" রাজকন্যা চোখ মেলতে পারেন না —চোখ দিয়ে হুহু করে জল পড়ছে, আঁচল দিয়ে মুছে মুছে চোখ দুটো ফুলে উঠলো। রাজা যখন এই কথা শুনলেন তখন ভারি চটে উঠে বল্লেন—"কে এমন করে ছাই ওড়ায় ধরে নিয়ে আয়!"

সন্ধান করতে দশ জন লোক ছুটল। খুঁজে খুঁজে তারা কাঠুরেকে বেঁধে নিয়ে হাজির করলে। রাজা তো তাকে দেখেই চটে আগুন। তার পর যখন শুনলেন যে বুড়োবুড়ির উপর হিংসা করে সে এত কাণ্ড করেচে তখনই তিনি হুকুম দিলেন "চালচুলো উড়িয়ে কাঠুরেকে এ দেশ থেকে এখনই তাড়িয়ে দাও!"

রাজার লোক কাঠুরের এক গালে চূণ এক গালে কালি মাখিয়ে, নেড়া মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিটে চড়িয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে দেশের বার করে দিলে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে দিয়ে দেওয়া গেল,—

১। আমাদের পাড়ার 'রাম' বাবু সে দিন বেড়াইয়া আসিবার সময় রাস্তার ধারে একটা 'মরা' সাপ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। 'হর' বড় দুষ্ট ছেলে পড়া শুনা না করার দরুন তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন 'রহ' তোমাকে সোজা করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া প্রহার করিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখি সে 'নদীর' ধারে বসিয়া অতি 'দীন' ভাবে কাঁদিতেছে। ওহে একটু 'সর' আমাকে বাজারে 'রস' কিনিতে এখনই যাইতে হইবে। সেদিন 'কর' মহাশয়ের বাটিতে গিয়া দেখি যে তিনি স্বহস্তে বাড়ীর ভিতরে একটি সুন্দর 'রক' তৈয়ারী করিয়াছেন। 'তাল' গাছে প্রায়ই কোনও 'লতা' দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ 'টাকা' আমি লইব না, কারণ উহা অল্প 'কাটা' রহিয়াছে।

২। ৬৪।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুনারায়ণ মুন্সী, শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীমতী সুপ্রভা দেবী, শ্রীমহেন্দ্র নাথ করণ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভবানীচরণ পাহিরী।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবসুভূতি রক্ষিত, students of the 6th class Jamirta, শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে, শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী, শ্রীবিনয়কুমার নন্দী, মহাম্মদ ইদ্রিছ খাঁ, শ্রীমন্মথমথন সরকার, শ্রীবিমলাংশুভূষণ মিত্র, শ্রীভূপেন্দ্রচরণ দত্ত রায়, শ্রীমিহিরকুমার মৈত্র, শ্রীমনন কুমার মৈত্র, শ্রীমতী অমলা দেবী, শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী উমা দেবী, শ্রীউপেন্দ্রলাল দত্ত।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত প্রেরিত।)

১। সলিল নিকটে রাখিলাম মুদ্রা এক।
একত্রে মিশিয়া ফল হইল অনেক।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রেরিত।)

২। পথি মধ্যে যেতে ছিল লোক দুই দল,
দৈবযোগে পথি মধ্যে লাগিল কন্দল;
প্রথম দলের পতি গণনা করিয়া,
অন্য দলে চাহি বলে হরিষ হইয়া।
"বার জন যদি এস মোর এই দলে,
তোমাদের দুই গুণ হবে মোর দলে।"
ইহা শুনি দ্বিতীয়ের দলপতি বলে,
"তোমাদের বার জন এস মোর দলে,
তাহ'লে সমান হব উভয় দলেতে,
সুখে সুখে থাকি, সবে যাইব নিশ্চিন্তে।"
বল দেখি হে পাঠক, কোন দলে কত,
রহিয়াছে স্থির করি জানাও ত্বরিত।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
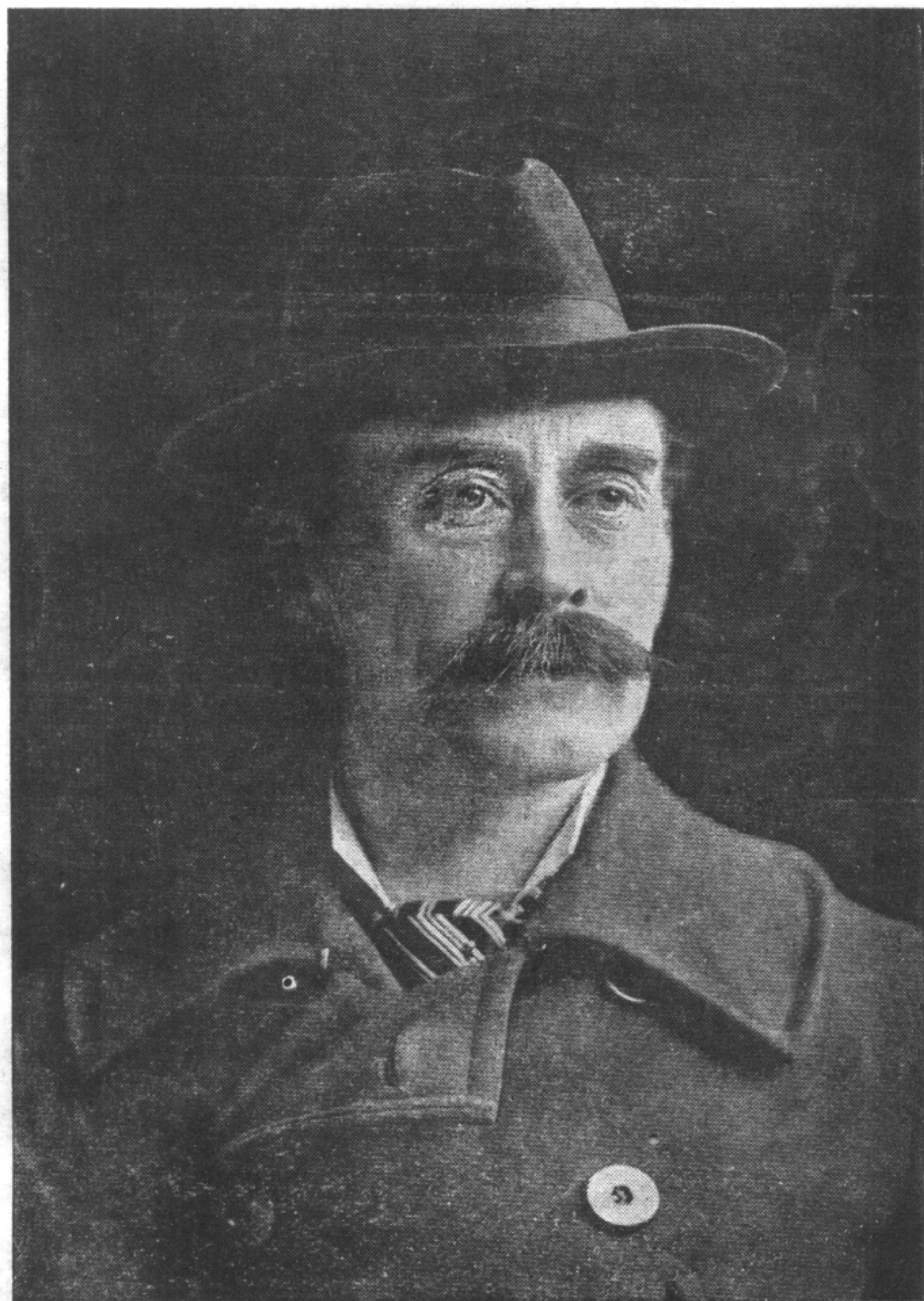
কাপ্তেন পিয়ারী

PARAGON PRESS

মুকুল

১৫শ ভাগ। | ফাল্গুন, ১৩১৬। | ১১শ সংখ্যা।

উত্তর মেরু আবিষ্কার।

কত দিন হইতে উত্তর মেরু গমনের চেষ্টা হইতেছিল। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশের অনেকে নানা উপায়ে উত্তর মেরুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; কেহবা জাহাজে, কেহবা বরফের উপরে কুকুরে টানা গাড়ীতে আমাদের পৃথিবীর ঠিক উত্তর প্রান্তে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই চেষ্টায় কত লোক প্রাণ হারাইয়াছেন, কত অর্থব্যয় হইয়াছে। মুকুলে সময়ে সময়ে তাহার বিবরণ বাহির হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নরওয়ে দেশের বিখ্যাত পর্য্যাটক ডাক্তার ন্যানসেন শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উত্তর মেরুর কিছু দক্ষিণ হইতেই তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি এতদিনের চেষ্টা সফল হইয়াছে। উত্তর মেরুতে মানুষের পদচিহ্ন পড়িয়াছে। সত্য সত্যই আমাদের মত এক জন মানুষ পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে পৌঁছিয়াছেন।

কিন্তু উত্তর মেরু যদি আবিষ্কার হইল, কে সর্ব্বপ্রথমে উত্তর মেরুতে পৌঁছিয়াছেন তাহা লইয়া মহা বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ডাক্তার কুক নামক এক জন লোক উত্তর মেরু অভিমুখ হইতে কোপেনহেগেনে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি বলেন যে তিনি উত্তর মেরু দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহার তিন চারি দিন পরে এক জন লোক আসিয়া বলেন যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উত্তর মেরু পৌঁছিয়াছিলেন। ইঁহার নাম কাপ্টেন রবার্ট পিয়ারী। ইঁহারা উভয়েই আমেরিকার লোক। প্রথম হইতেই অনেকে ডাক্তার কুকের কথায় বিশ্বাস করেন নাই। কাপ্তেন পিয়ারীও বলেন যে ডাক্তার কুক উত্তর মেরুর নিকটে ও যাইতে পারেন নাই। ডাক্তার কুক যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি কাপ্তেন পিয়ারীর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে উত্তর মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি দুই জন এস্কুইমোর সঙ্গে উত্তর মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন। ক্যাপ্তেন পিয়ারী ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল উত্তর মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন।

সুতরাং ডাক্তার কুকের কথা সত্য হইলে তাঁহাকেই উত্তর মেরুর আবিষ্কর্ত্তা বলিতে হইবে। কিন্তু অনেকেই মনে করিতেছেন তাঁহার কথা সত্য নহে। তাঁহার সঙ্গী এস্কুইমো দুইজন ইউরোপে আসে নাই; তাহাদিগকে পাওয়া গেলেও তাহাদের কথায় কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইবে না। কারণ উত্তর মেরুতে পৌঁছিয়াছে কি না তাহারা কিছুই জানে না। ডাক্তার কুক যে সমুদয় মানচিত্র এবং বৈজ্ঞানিক মাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় দেখিতে পাইলে, ইহার মীমাংসা হইতে পারিত। কিন্তু তিনি বলিতেছেন, যে সে সমুদয় কাগজ পত্র তিনি সঙ্গে লইয়া আসিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে গাড়ী বা অন্য কোনও প্রকার বাহন ছিল না। পথে একস্থানে তিনি সে সমুদয় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কাপ্তেন পিয়ারীকে সে সমুদয় আনিবার জন্য বলা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা আনেন নাই।

এরূপ অবস্থায় কে যে প্রথমে উত্তর মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। প্রথমে যাঁহারা ডাক্তার কুকের কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারাও সন্দিহান হইতেছেন। তিনি যে সমুদয় কাগজ পত্র দেখাইয়াছিলেন, এখন অনেকে সে গুলিকে জাল মনে করিতেছেন। তবে এবার যে উত্তর মেরু আবিষ্কার হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ডাক্তার কুক যদিও উত্তর মেরুতে না গিয়া থাকেন, কাপ্তেন পিয়ারী নিশ্চয়ই সেখানে গিয়াছিলেন। কাপ্তেন পিয়ারী যে উত্তর মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না; কেবল তিনি সর্ব্বপ্রথমে সেখানে গিয়াছিলেন, কি তাঁহার পূর্ব্বে ডাক্তার কুক উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া মত ভেদ হইয়াছে।

কাপ্তেন পিয়ারী বহু বৎসর ধরিয়া উত্তর মেরু অঞ্চলে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহারই পরিশ্রমে

ডাক্তার কুক ও তাঁহার সঙ্গীগণ।

গ্রীনলাণ্ড দ্বীপের চতুঃসীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম উত্তর মেরুর সন্ধানে যাত্রা করেন। সে বার তিনি ৮৩ ডিগ্রী ৫৪ মিনিট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি আবার উত্তর মেরু অভিমুখে অগ্রসর হন; ১৯০২ সালে কাপ্তেন পিয়ারী ৮৪ ডিগ্রী ১৭ মিনিট পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। ১৯০৫-৬ সালে ৮৭ ডিগ্রী ১৭ মিনিট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। চতুর্থ বারের চেষ্টায় উত্তর মেরু পৌঁছিয়াছেন। ১৯০৮ সালের রুজভেল্ট নামক ষ্টীমারে আমেরিকা হইতে যাত্রা করেন। ১৯০৯ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারি তিনি ষ্টীমার ছাড়িয়া ২৩ খানা কুকুরে টানা গাড়ী, ১২০টী কুকুর ও কয়েক জন এসকুইমোকে সঙ্গে লইয়া উত্তর মেরু অভিমুখে অগ্রসর হন। ৬ই এপ্রিল তিনি মেরুপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেখানে আমেরিকার জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন। এতদিনে উত্তর মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা সফল হইল। এখন বোধ হয়, অনেকেই তাঁহার পদানুসরণ করিয়া উত্তর মেরুতে গমন করিবেন। সেখানে ৬ মাস দিন এবং ৬ মাস রাত্রি; আর সেখানে আমাদের এখানকার মত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারি দিক নাই। সকল দিকই দক্ষিণ দিক। ঠিক উত্তর মেরু যেখানে সে স্থানটী স্থল নহে, সমুদ্র; কিন্তু সমুদ্রের জল জমিয়া বরফ হইয়া আছে। তোমাদের কি উত্তর মেরু দেখিতে ইচ্ছা করে না?

পৌরাণিক কাহিনী।

(রামায়ণ)

লক্ষ্মণ।

যাঁহাদের উচ্চ চরিত্রে রামায়ণ এমন সুন্দর হইয়াছে, লক্ষ্মণ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বাল্মীকি তাঁহাকে রামের অপর প্রাণের মত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, লক্ষ্মণের চরিত্র আলোচনা করিলে এই উপমা অতি সত্য বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্মণ রামকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, তেমন আত্মহারা গভীর ভালবাসা পুরুষে কখনও দেখা যায় না। তিনি রামের প্রতি তাঁহার সেই ঐকান্তিক অনুরাগ কোন দিন কথায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই, বাল্যাবধি ছায়ার মত রামের অনুগামী হইয়া তাঁহার জীবনের সকল কষ্ট ও ত্যাগের কঠোরতা তিনি সমুদয় হৃদয় মন দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে দিন বিশ্বামিত্র তাড়কা বধের জন্য রামকে লইয়া যান, সে দিন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে চির দিন তিনি রামের সহচর, তাঁহার সকল কঠিন ব্রত পালনে সহায়। কর্ণ যে স্বর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে সকল যুদ্ধে অজেয় করিয়াছিল, বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণের চরিত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, যে তিনি যেন রামের পক্ষে কর্ণের সেই সহজ কবচ ও কুণ্ডলের মত, শৈশব হইতে অনুপম ভ্রাতৃস্নেহের এই সুকোমল অথচ দুর্ভেদ্য রক্ষা কবচে আবৃত ছিলেন বলিয়া রামের পক্ষে জীবনের কঠিন ব্রত পালন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় মহিমায় সমুজ্জ্বল, রণে অজেয়, বিপদে অকুণ্ঠিত, সতত নির্ভীক ও প্রখর ন্যায়ানুরাগী এই ভ্রাতা সতত পার্শ্বে থাকিয়া চিরজীবন রামকে অনেক বিপদ ও পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে রামের ভ্রাতা, মন্ত্রী, সহায় ও ভৃত্য সকলই ছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এমন গাঢ় ছিল, যে কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। যে দিন নৃশংসা কৈকেয়ীর রাজ্যলোভে রামকে নিরপরাধে বনে নির্ব্বাসিত হইতে হইল, সেদিন লক্ষ্মণ পিতার এই অন্যায় আদেশ সহ্য করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি দেবী কৌশল্যার সম্মুখে অনেক তর্ক করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেবি, আমি হৃদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাকি। আমি সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম অগ্নি বা বনপ্রবেশ করেন, তবে নিশ্চয় ইঁহার অগ্রেই আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি

বিপরীত হইয়াছে, নতুবা ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কোন্ ব্যক্তি বিনা দোষে এইরূপ গুণবান্ পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? গুরু যদি সৎ ও অসৎ জ্ঞান বর্জ্জিত হন, তবে তাঁহাকে শাসন করা ধর্ম্মসঙ্গত। জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজ্য রামেরই প্রাপ্য, মহারাজ কোন্ যুক্তিতে তাহা কৈকেয়ীকে দিবেন? যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, যে তাঁহার হিতাভিলাষ করে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। বৃদ্ধ হইয়াও যিনি বালকের ন্যায় অবোধ, কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত সেই পিতাকে আমি এখনই বিনাশ করিব। সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আমি আমার বীরত্বে আপনার দুঃখ দূর করিব।" পিতার প্রতি ভক্তি ছিল না বলিয়া বা অকৃতজ্ঞ পুত্র বলিয়া লক্ষ্মণ যে পিতাকে এই সকল কটূক্তি করিয়াছিলেন. এমন নহে, স্বার্থপর বিমাতার বিদ্বেষে ও তাঁহার ষড়যন্ত্রে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সকল গুণে গুণবান সর্ব্বজনপ্রিয় কুমার রাজ্যহারা হইয়া গভীর বনে প্রবেশ করিবেন, ইহা তাঁহার ন্যায়পর ও তেজস্বী হৃদয় সহ্য করিতে পারে নাই তাই তিনি পিতাকে সকল অনিষ্টের মূল জানিয়া তাঁহার উপর এমন বিজাতীয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ভাবের আবেগে তিনি মহারাজ দশরথের সহিত তাঁহার পিতা ও পুত্র এবং রাজা ও প্রজা সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার প্রতি এমন উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, পিতৃ ভক্তির অভাব বলিয়া নহে। অকারণ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি প্রাণের এই জীবন্ত সহানুভূতি ও প্রখর ন্যায়বোধ হইতেই তাঁহার মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা সকল বাহির হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে অনেক সময়ে রুক্ষ প্রকৃতি ও দুর্বিনীত বলিয়া বোধ হইয়াছে। রাম বিচার না করিয়া পিতৃ আদেশ পালন করাই পুত্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণ তাহা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি রামকে কহিয়াছিলেন, "আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম ও সত্যের ছল ধরিয়া পিতা যে ঘোর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি দেবতুল্য, সরলচিত্ত ও কোমল প্রকৃতি, শত্রুরাও আপনার প্রশংসা করে, এমন পুত্রকে পিতা কি দোষে বনে পাঠাইতেছেন? স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম?" বনবাসে দিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার সময় সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, "কুমার, মহারাজের নিকট আপনার কিছু বলিবার আছে?" তখন লক্ষ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন, "সারথি, মহারাজ এই রাজপুত্রকে কোন্ অপরাধে বনে পাঠাইলেন? কৈকেয়ীর চিন্তাবিহীন আদেশে এই কার্য্য তাঁহার যোগ্য হউক বা অযোগ্য হউক, ইহাতে আমরা অতিশয় ব্যথা পাইয়াছি। কৈকেয়ীর রাজ্য লাভ বা সত্য সত্য বরদানের জন্য যে কারণেই হউক, রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া মহারাজ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাজ কেবল বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না ভাবিয়াই এই কর্ম্ম করিয়াছেন; ইহ পরকালে ইহার জন্য তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না। রামই আমার ভ্রাতা, বন্ধু, প্রভু ও পিতা। যিনি সকলের হিতকারী এবং সকলের প্রিয়, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে সকলকে অনুরক্ত করিবেন? যিনি প্রজাগণের প্রিয়, সেই ধার্ম্মিককে বনে পাঠাইয়া সকলের সঙ্গে বিরোধ করিয়া তিনি কিরূপে রাজ্য করিবেন?" এই প্রকার সুস্পষ্টও তেজঃপূর্ণ বাক্যে পিতৃকৃত এই বিষম অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লক্ষ্মণ কোন দিনই নিরস্ত হন নাই। অধর্ম্মের পরিণাম যে অতি ভয়ঙ্কর, তাহা যে অধর্ম্মকারীকে সমূলে বিনাশ করে, তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে এমন দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নষ্ট করিবে না, ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন।" "যে অধর্ম্ম আচরণ

করে, সে সমূলে বিনষ্ট হয়।" এই প্রখর ন্যায়বোধ, অন্যায় প্রতীকারের জন্য এই তীব্র প্রতিবাদ, বলশালী তেজস্বী পুরুষের ইহাই লক্ষণ। লক্ষ্মণে এই লক্ষণ সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

রাজা ধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রাজ্যে যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হয়, লক্ষ্মণের সে বিষয়ে সুদৃঢ় ধারণা ছিল, সে কথা তিনি নানা অবস্থায় রামকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। মায়া সীতার মস্তক দেখিয়া রাম লঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "কাম দর্প, শক্তি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই সমুদয়ই অর্থের আয়ত্ত। আমার এই মত, ইহাই ধর্ম্ম, আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।" ভরত হইতে রামের নির্ব্বাসন হইল বলিয়া লক্ষ্মণ চিরদিন তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, যে ভরতের উত্তেজনায় কৈকেয়ী এমন অন্যায় করিয়াছেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে দূর হইতে ভরতের সৈন্য কোলাহল শুনিয়া লক্ষ্মণ পুষ্প পরিপূর্ণ এক দীর্ঘ শাল বৃক্ষে উঠিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকে অনেক সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া রামকে বলিলেন, "অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহায় লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হউন। অদূরে ঐ বৃহৎ বনস্পতির পত্রের অন্তরালে ভরতের কোবিদার চিহ্নিত উচ্চ রথধ্বজ দেখা যাইতেছে। রাজ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয় নাই নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে বলিয়া ভরত আমাদের বধ করিতে আসিতেছে, আজ সকল অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব। অদ্য কৈকেয়ী হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের মত ভরতকে আমার হস্তে হত দেখিয়া দুঃখিত হইবে।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ তাহার পর ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভরত যখন জটাবদ্ধ মস্তক রামের চরণে লুটাইয়া কহিলেন, "আমার মাতা ঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" তখন লক্ষ্মণ ভরতের প্রতি আপনার নিষ্ঠুর মনের ভাব বুঝিয়া বড় লজ্জিত হইলেন। ভরতের নির্দোষিতায় প্রত্যয় জন্মিবার পর হইতে তাঁহার প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। একবার বনে দুরন্ত শীত উপস্থিত হইয়াছিল; রাত্রিতে ভরতের কথা স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণ রামকে কহিয়াছিলেন "এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধার্ম্মিক ভরত আপনার প্রতি ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, সুখ, ভোগ, বিলাস সমুদয় ত্যাগ করিয়া অনাহারে ভরত এই দুরন্ত শীতে রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া এই তীব্র শীতে তিনি শেষ রাত্রিতে সরযূতে স্নান করেন।" পূর্ব্বে লক্ষ্মণ ভরতের বধে আমি কোন দোষ দেখিনা বলিয়া তাঁহার প্রতি কত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অযোধ্যার ধনরাশির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত তাঁহারই মত কঠিন ব্রত আচরণ করিতেছেন, তখন ভরতের প্রতি তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল।

বনবাসকালে বন্য জীবনের সমুদয় কঠোরতার অধিক অংশ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল। তিনি মৃত্তিকা খনন করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিতেন, ফল মূল ও জল আহরণ করিতেন, অগ্নি জ্বালিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেন, নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভেলা প্রস্তুত করিতেন। তিনি বনে আসিবার সময় রামকে বলিয়াছিলেন, "দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিত থাকুন আপনার সকল কর্ম্ম আমি করিয়া দিব। খনিত্র পিটক ও ধনু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে ফিরিব।"

হার চুরি।

(১)

চট্টগ্রাম সহরটি দেখিতে বড়ই সুন্দর; সহরের প্রান্ত দিয়া কর্ণফুলী নদী সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; কর্ণফুলীর স্বচ্ছ বারিরাশির উপর কত রকম নৌকা, কত

রকম জাহাজ শোভা পাইতেছে। সহরের চারিদিকে ছোট বড় পাহাড়গুলি হরিতবর্ণ তরুলতায় সাজিয়া রহিয়াছে; তরুশাখায় নানা বর্ণের পুষ্পরাজি শোভা পাইতেছে। আবার কোন পাহাড়ের দিয়া ক্ষুদ্র ঝরণা ঝর ঝর করিয়া বহিয়া যাইতেছে; কোন পাহাড়ের নিম্নে সবুজ বর্ণের মাঠগুলি শোভা পাইতেছে; কোন পাহাড়ের উপর কমিসনার, জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোরম অট্টালিকাগুলি দণ্ডায়মান; কোন পাহাড়ের উপর দুই চারিজন বাঙ্গালীর দুই চারিটি দালান তাঁহাদের ধন সম্পত্তির সংবাদ প্রচার করিতেছে।

এই চট্টগ্রামের ছোট একটি পাহাড়ের উপর ভূষণ বাবুর অট্টালিকা; তিনি কারবার করিয়া ধনী হইয়াছেন। তাঁহার চাউলের কারবার; নানা দেশ হইতে চাউল আনাইয়া সহরে বিক্রী করেন।

ভূষণ বাবুর গৃহে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। মেয়েটি বড়, ছেলেটি ছোট। মেয়েটির নাম সুরবালা ছেলের নাম অক্ষয়। মেয়েটির বয়স বার বৎসর, ছেলেটি দশ বৎসরে পা বাড়াইয়াছে। দুটি ভাই বোনের মধ্যে বড় ভাব; দুটি যখন এক সঙ্গে বসিয়া থাকে, তখন মনে হয়, যেন একটি বৃন্তে দুইটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে।

এই সুন্দর বালক বালিকা ভিন্ন ভূষণ বাবুর আপনার লোক আর কেহই নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার গৃহে লোকের অভাব নাই। প্রতিদিনই দেশ বিদেশ হইতে অতিথি আসিয়া তাঁহার ঘরে বাস করিতেছে। ভূষণ বাবু এই সকল অতিথির সেবা করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন।

একবার তিনি এইরূপ একটি অতিথির সঙ্গে সমুদ্র দেখিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইলেন। সেই ভদ্র লোকটির সমুদ্র দেখিবার জন্য মনে বড়ই আগ্রহ ছিল। ভূষণ বাবু তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে লইয়া সমুদ্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভূষণ বাবুর বাড়ীর সাত মাইল দূরেই সমুদ্র; নদীর ঘাটে নৌকায় উঠিয়া নৌকা খানি ছাড়িয়া দিলে ভাঁটার টানে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যায়, আবার জোয়ারের জলে ঘাটে ফিরিয়া আসে। সেই জন্য ভূষণ বাবু সঙ্গে একটি মাঝি, একটি বিছানা এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন, এমন সময় অক্ষয় আসিয়া কহিল,

"বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে সমুদ্র দেখ্‌তে যাব।"

ভূষণ বাবু তাঁহার মাতৃহীন দুইটি পুত্র কন্যাকে অতিশয় ভালবাসেন; কোথাও যাইবার সময় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। আজ অক্ষয়কে সঙ্গে লইয়াই সমুদ্র দেখিতে চলিলেন।

ভূষণ বাবুর নৌকা যখন সমুদ্রের অনেকটা নিকটে দিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গের ভদ্রলোকটীকে কহিলেন, "ঐ সমুদ্র দেখা যাচ্ছে; কিন্তু নদীর বাঁক ঘুরে সমুদ্রের কাছে যেতে কিছু সময় লাগ্‌বে; আসুন না আমরা নৌকা থেকে নেমে এই পথটুকু হেঁটে যাই। তা হলে একটু বেড়ানও হবে, আবার তাড়াতাড়ি সমুদ্রের কাছে গিয়াও পৌঁছান যাবে। সঙ্গের ভদ্র লোকটি এই কথায় সম্মত হইলে ভূষণ বাবু তাঁহাকে লইয়া হাঁটিয়া চলিলেন। অক্ষয় নৌকায় রহিল; মাঝি তাহাকে লইয়া নৌকা বাহিয়া নদীর মুখে অর্থাৎ সমুদ্রের কাছে চলিল।

অতিথি ভদ্রলোকটি ভূষণ বাবুর সঙ্গে সমুদ্রের তীরে পৌঁছিয়া বিস্মিত হইলেন; কি চমৎকার দৃশ্য! অগাধ সমুদ্র আকাশের নীলিমার সঙ্গে নীল অঙ্গ মিশাইয়া দিয়াছে; সমুদ্র ভিতর হইতে একটার পর একটা ঢেউ আসিয়া কূলে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; ভদ্রলোকটি আত্মহারা হইয়া সমুদ্রের দিকেই চাহিয়া রহিলেন!

এ দিকে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল। সে দিন অমাবস্যা তিথি ভাঁটার বড় জোর, জলের বড় টান; মাঝি সমুদ্রের নিকটে পৌঁছিবামাত্র স্রোতের বেগে সেই ক্ষুদ্র নৌকা সমুদ্রের মধ্যে ছুটিয়া চলিল। মাঝি প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা ফিরাইতে পারিল না। নৌকা সমুদ্রে পড়িবামাত্র বাতাস, স্রোতের জল ও ঢেউ এই তিন একসঙ্গে মিলিত হইয়া একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড করিয়া তুলিল। নৌকার মাঝি

চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ওগো বাবু, শীগ্‌গির বড় নৌকা নিয়ে এস; নইলে আর ত আমাদের প্রাণের আশা নেই।"

এই চীৎকার শুনিয়া ভূষণ বাবু চাহিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মাঝি এবং অক্ষয়কে লইয়া তাঁহার নৌকাখানি মোচার খোলের ন্যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর নৃত্য করিতেছে। তখন সমুদ্রের কাছে একখানিও বড় নৌকা নাই যে, ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে। এ দিকে জোয়ার আসিল, বাণ ডাকিল, সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত হইয়া নদীতে প্রবেশ করিতে লাগিল; তখন আর নৌকার সাধ্য কি যে, সেই জল ঠেলিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে? ভূষণ বাবু নিরুপায় হইয়া চট্টগ্রাম চলিয়া গেলেন। সেখানে একখানা জাহাজ ভাড়া করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, সমুদ্রের দিগন্তবিহীন অনন্ত জলরাশির মধ্যে কোথায় সে ক্ষুদ্র নৌকা? জাহাজের কাপ্তেন ভূষণ বাবুকে বলিলেন,

"আপনার টাকার অভাব নাই' টাকা পেলে আমাদেরও সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে আপত্তি করবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আপনি কি মনে করেন সেই ছোট নৌকাখানি এখনও সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে? এই জায়গায় কোন জাহাজ এসেছিল, তারও খবর পাইনি' কাজেই আপনার ছেলেকে ফিরে পাবার আশা করা বৃথা।"

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া ভূষণ বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাপ্তেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন। শোকার্ত্ত পিতা বলিয়া উঠিলেন বৃথা আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কচ্ছেন? ঐ এক মাত্র ছেলে ভিন্ন আমার আর কে আছে? আমি বড় আশা করে এই ছেলের মুখের পানে চেয়েছিলাম; হায়, আজ আপন দোষে তাহাকে হারালাম;—আমি কি এ জন্মে আর শান্ত হতে পারব?"

ভূষণ বাবু শূন্যমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং কন্যা সুরবালাকে বুকে লইয়া বলিলেন—"মাগো, আয় একবার তুই আমার বুকে আয়; তুই ছাড়া আর ত কেউ আমার রইল না; তোকে বুকে নিয়ে আমার প্রাণ জুড়াই।"

সুরবালা এতক্ষণ কিছুই বলে নাই, সে তাহার মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়াছে। এখন বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, ভাইকে আর আমি দেখ্‌তে পাব না?"

এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এইরূপ অনেক দিন দুই পিতা ও কন্যাকে চোখের জলে ভাসিয়া বিলাপ করিতে হইল; কিন্তু অক্ষয় আর ফিরিয়া আসিল না; কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

(২)

সুরবালার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স হইল, তখন এক ধনীর ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। সেই ধনী রেঙ্গুণে কারবার করিয়া বিস্তর টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তাহার মৃত্যুর পর পুত্র ভবেশ আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের শক্তিতে সেই টাকা আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

ভবেশের সঙ্গে যে দিন সুরবালার বিবাহ হইল, সে দিনও সুরবালা ভায়ের কথা ভুলিতে পারিল না; সে দিন বাড়ীতে কত লোক জন আসিল, কত ধুম ধাম হইল, কত বাজনা বাজিল, কত বাজি পুড়িল তবুও সুরবালার দুটি করুণ নয়নের কাছে অক্ষয়ের সুন্দর মুখখানি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল; তাহার উদাস মন সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ভাইকেই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর বিবাহের সময় যখন করুণ সুরে সানাই বাজিয়া উঠিল, তখন ভাইএর শত কথা মনে পড়িয়া চোখ দিয়া জল ঝরিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে বিবাহের পর ভবেশ সুরবালাকে লইয়া রেঙ্গুণ চলিল। হায়, সে দিন একেই তাহার পিতার জন্য, বাড়ীর লোকজনদের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছিল, তাহার পর যখন তাহাদের জাহাজ কর্ণফুলী নদীর নীচে

সেই সর্ব্বনেশে সমুদ্রে গিয়া পড়িল, তখন সে ভাইএর কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। কান্নার পর তাহার মনের ভিতর কতই কল্পনা জাগিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সুরবালা সমুদ্রের ভিতর দুই একটা দ্বীপ দেখিয়া ভাবিতে লাগিল—

"সত্যই কি আমার ভাই ডুবিয়া মরিয়াছে? যদি নৌকাখানি জলের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া একটা দ্বীপের কাছে গিয়া লাগিয়া থাকে, যদি দ্বীপের মানুষেরা আমার ভাইকে পাইয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া থাকে, যদি আমার ভাই সেই দ্বীপ হইতে সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়ায়, যদি এই জাহাজখানা সেই দ্বীপের কাছে গিয়া লাগে এবং আমার ভাই আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়;— তাহা হইলে আমার মনে যে কি রকম সুখ হয়, তাহা ত কাহাকেও বলিতে পারি না!"

বালিকা আপন মনে এইরূপ কল্পনা করিয়াও, যখন কোথাও আর ভাইএর দেখা পাইল না; তখন সে দুখানি হাত যোড় করিয়া ভগবানকে বলিত—"হে ঈশ্বর, তুমি নাকি মানুষের দুঃখ দেখিয়া দয়া কর? আমার ত দুঃখ দেখিতেছ; আমাকে একটিবার দয়া কর, আমার প্রার্থনা শুন, একটিবার আমার ভাইকে কাছে আনিয়া দেখাও।"

ইহার পর সুরবালা রেঙ্গুনে পৌঁছিল; রেঙ্গুণে পৌঁছিয়াও কতদিন ভাইএর জন্য অশ্রুপাত করিল। কিন্তু এখন সুরবালার বয়স ত্রিশ বৎসর; এখন সে গৃহের কর্ত্রী; শুধু কর্ত্রী কেন? এখন সে ছোট খাট একটি রাণী; সহরের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া তাহার স্বামীর সুন্দর অট্টালিকা ও সুরম্য পুষ্পোদ্যান; তাহার গৃহে কত লোক জন ও কত দাসদাসী; তাহার হাতীর দাঁতের বাক্স ভরা স্বর্ণালঙ্কার ও মুক্তাহার, তাহার বাড়ীতে প্রতিদিন আনন্দোৎসব, এখন আর ভাইএর কথা মনে পড়ে না, মনে পড়িলেও তেমন আর কষ্ট হয় না। সুরবালার বিবাহের পর তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; এখন তাহার ভাইএর জন্য কেহই আর চোখের জল ফেলে না; কেই বা ফেলিবে? তেমন আত্মীয় কেহই ত আর নাই।

(৩)

সুরবালার যে অনেক দাস দাসী আছে, সে কথা আগেই বলিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বাড়ী ব্রহ্মদেশে; শুধু রামা চাকরই বাঙ্গালী; ভবেশ তাহাকে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণে লইয়া আসিয়াছেন। সেজন্য রামার মাহিনাও বেশী, মানও বেশি। মান বেশি হইবার আরও একটা কারণ আছে। রামা সুচতুর, তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; সে বেশি কিছু কাজ না করিয়া কেবল চাকরদের উপর সর্দ্দারি করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু সে কাজে একবার হাত দিলে, তাহার মত আর কে সুন্দর করিয়া কাজ করিতে পারে?

তা ছাড়া রামার জিনিষ চিনিবার এবং কিনিবার একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। সে পাঁচ টাকায় কিনিয়া তাহার দাম ছয় টাকা বলে বটে; কিন্তু কোন দোকানদার খারাপ জিনিস ভাল বলিয়া চালাইয়া দিয়া, তাহার চোখে ধূলা দিতে পারে না। সে খাঁটি জিনিসটি বেশ চিনিয়া লইতে পারে। সেই জন্য ঠিক্ পছন্দসই জিনিসটি কিনিয়া সুরবালার হস্তে অর্পণ করে; সুরবালা মনের মত জিনিসটি পাইয়া ভারি খুসী হয়। তাই সুরবালা আর সকল চাকরের চেয়ে রামাকেই বেশি ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে। সুরবালার হাজার টাকার জিনিষ কিনিতে হইলেও সে রামার উপর ভার দিবে এবং রামার কেনা জিনিসই পছন্দ করিবে। এই সুবিধা পাইয়াই ত রামার নবাবী বাড়িয়া গিয়াছে; সে দেদার চুরি করে, আর সেই চুরির টাকায় ভাল জুতা, ভাল পোষাক কিনিয়া বাবুগিরি করিয়া বেড়ায়। অথচ সুরবালার এমনই বিশ্বাস যে, যে ঘরে তাহার রত্নালঙ্কার থাকে, সে ঘরেও রামার যাইতে কোন নিষেধ নাই।

কিছুদিন পরে ভবেশ আর একটি নূতন চাকর রাখিলেন। চাকরটি ব্রহ্ম দেশীয়; তাহার নাম ফুকণ। সুরবালা ফুকনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইল; ব্রহ্মদেশের কোন ভদ্রলোকের ছেলেরও তেমন সুন্দর চেহারা দেখা যায় না। সত্য বটে ব্রহ্মদেশের অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের খুব ফর্সা রং দেখিতে পাওয়া যায়,

কিন্তু ফুকনের মত অমন সুন্দর মুখ, সুন্দর চোখ, সুন্দর নাক কাহারও দেখা যায় না। লোকেরা কথায় বলে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনিব যদি সুনজরে দেখেন, তাহা হইলে তাহার মন পাইতে বড় কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। ফুকনের তাহাই হইল; সে সহজেই সুরবালার মন অধিকার করিল। সুরবালা তাহার নম্রতা, বাধ্যতা এবং ভদ্র ব্যবহারে বড়ই খুশী হইল। কেবল সুরবালার কথাই বা বলি কেন? এই নূতন ভৃত্যটির এমন করুণ ভাব ছিল এবং তাহার কথা বার্ত্তায় এমন একটি সরল ও সুমিষ্ট ভাব প্রকাশ পাইত, যে, স্বয়ং ভবেশ বাবু তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু এইবার ভৃত্য রামচন্দ্রের আসন টলিল; ফুকন উড়িয়া আসিয়া তাহার জায়গাটি জুড়িয়া বসিল। এখন আর মেয়েরা রামাকে কোন জিনিস কিনিবার জন্য ফরমাস করেন না। ফরমাস যাহা তাহা ফুকনকেই যোগাইতে হয়। সে রামার মত পছন্দসই জিনিসটি কিনিতে না পারিলেও মেয়েরা অসন্তুষ্ট হন না। ফুকন ব্রহ্মদেশের নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; ব্রহ্মদেশের বিস্তর গল্প ও উপকথা শিখিয়াছে; তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় মিষ্ট। এইজন্য মেয়েরা সন্ধ্যার পর তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া, তাহার মুখে ব্রহ্মদেশের গল্প শুনেন। ফুকন দুঃখের গল্প বলিতে বলিতে যখন অশ্রুপাত করে, তখন সুরবালার নয়নপল্লবও অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া যায়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রামা হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। এক এক সময় তাহার এমন রাগ হয়, যে, সে যদি সেই মুহূর্ত্তে বনের একটা বাঘ হইতে পারে, তাহা হইলে ফুকনের হাড় মাংস চিবাইয়া খাইয়া ফেলে। হায়, বেচারা দশ টাকা বেতনের চাকর হইয়া পঞ্চাশ টাকা মাহিনার বাবুর মত চলিত; এখন আর তাহার সিকি পয়সাটি চুরি করিবার যো নাই। কাজেই মুস্কিলে পড়িয়া বাবুগিরি বন্ধ করিতে হইয়াছে। শুধু কি তাই? যে সুরবালার কাছে রামার সাত খুন মাপ ছিল সেই সুরবালা এখন তাহার ক্রুটি দেখিলে রাগিয়া উঠেন। এই ত সেদিন সামান্য অপরাধের জন্য তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন,

"তুই যে বড়ই জুলুম আরম্ভ করলি, দেখ্‌ছি। আমি তোর অন্যায় অনেক বরদাস্ত করেছি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে এ বাড়ী হতে অন্ন জল উঠ্‌বে, সে কথা আগেই বলে দিচ্ছি।"

রামা এই তিরস্কার শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "এই সয়তান মগের ছেলেটাকে পেয়ে আমার উপর এত নিগ্রহ? আচ্ছা, আমিও কেমন কায়েতের ছেলে, মগটাকে ভাল করেই বুঝাব; দেখ্‌ব ও কতদিন এই বাড়ীতে টিঁকে থাক্‌তে পারে।"

রামা ফুকনকে জব্দ করিবার জন্য মনে মনে এক ফন্দী আঁটিল এবং সেই ফন্দীর মত কাজ করিবার জন্য আজ কাল করিয়া দিন গুণিতে লাগিল। অবশেষে এক দিন ফুকনকে জব্দ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। সে দিন রেঙ্গুনের এক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের কন্যার বিবাহ। বিবাহে সহরের প্রায় সকল বড় লোকের ঘরের মেয়েরা উপস্থিত থাকিবেন। সুরবালাও সেই বিবাহ দেখিতে যাইবে। সেজন্য বিকাল বেলায় সে তাহার স্বর্ণ খচিত বোম্বাই শাড়ী পরিল এবং লোহার সিন্ধুক হইতে গহনার বাক্সটি বাহির করিয়া উহা খুলিবার জন্য চাবি লাগাইল। এমন সময় ঘড়িতে টুং টাং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। সুরবালা ঘড়ির শব্দ শুনিয়া বলিয়া উঠিল,

"মাগো! আমার কি ভুলই হয়েছে। সাড়ে চারটার সময় যে সুশীলাকে ঔষধ খাওয়াবার কথা।"

সুশীলা সুরবালাদের একটি আত্মীয়া বালিকা। তাহার জ্বর হইয়াছে। তাহাকে ঔষধ খাওয়াবার সময় অতীত হইয়াছে বলিয়া, সুরবালা গহনার বাক্সের গায়ে চাবি লাগাইয়া, বাক্সটি বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি সুশীলার ঘরে চলিয়া গেল। সুচতুর রামা ফুকনকে বিপন্ন করিবার জন্য যে এক বুদ্ধির চাল চালিবে বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিল। সে জানিত, এই সময়ই তাহার সুযোগ উপস্থিত হইবে। তাই রামা আড়ালে দাঁড়াইয়া সুরবালার সিন্ধুক খোলা, গহনার বাক্স বিছানার নীচে রাখা, সকলই লক্ষ্য করিয়াছিল। এখন সে নিঃশব্দে

ঘরে প্রবেশ করিয়া সুরবালার গহনার বাক্স হইতে একগাছি মুক্তাহার বাহির করিল এবং হার ছড়া লইয়া ফুকনের ঘরে প্রস্থান করিল। বেচারা ফুকন তখন বাহির বাড়ীতে আস্তাবলের কাছে দাঁড়াইয়া কোচোয়ানকে গাড়ী সাজাইতে বলিতেছিল। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে এই সময়ে তাহার ভয়ানক বিপদ ঘটিবে। এই সময় রামা তাহার বিছানার তোষকের খানিকটা ছিঁড়িয়া তুলার ভিতর মুক্তাহার লুকাইয়া রাখিল। ফুকন কোন দিনও তোষক পাতিয়া শোয় নাই; তোষকের পয়সা জুটিবে কোথা হইতে? কিন্তু এবার শীতকালে সুরবালা তাহাকে এই সুন্দর তোষকখানি তৈরী করিয়া দিয়াছেন। আজ সেই তোষকই তাহার বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

(৪)

সুরবালা সুশীলাকে ঔষধ খাওয়াইয়া সত্বর আপনার গৃহে আসিয়া গহনার বাক্স খুলিল; কিন্তু এ কি। তাহার বড় সাধের মুক্তাহার যে বাক্সে নাই? সুরবালা পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া সিংহল হইতে এই মুক্তাহার আনাইয়াছে, হারগাছি সে কত যত্ন করিয় রাখিয়াছে; আজ কে তাহার সেই হার চুরি করিল? সুরবালা গহনার বাক্স, লোহার সিন্ধুক এবং আপনার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল; কিন্তু কোথাও হার পাওয়া গেল না। তখন ভবেশ বাবুর কাছে খবর গেল। ভবেশ বাবু সমস্ত চাকর চাকরাণী ডাকিয়া তম্বী আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কেহই হারের সন্ধান বলিতে পারিল না।

সেই রাত্রেই থানায় খবর গেল। সহরের পুলিস আসিয়া সন্ধান আরম্ভ করিল। অনেক সন্ধানের পর ফুকনের তোষকের ভিতর হইতে হার বাহির হইল। পুলিস ফুকণকেই চোর বলিয়া গেপ্তার করিল। তাহার পর তাহার হাত বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া গেল। থানায় ফুকনের উপর মার পিট আরম্ভ হইল। সে কহিল,

"আমাকে মেরে খুন করলেও আমি মিথ্যা কথা বল্‌তে পারব না। যে মুনিব ঠাকুরাণ আমাকে কত ভালবাসেন, আমি কি তাঁরই হার চুরি করে জেলে যাব? এমন কুবুদ্ধি কি মানুষের হয়?"

পুলিসের দারগা কহিল, "বেটা যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! হারে বদমায়েস তুই হার চুরি না কর্‌লে, হারের কি দুখানা পা বেরিয়ে ছিল? হার কি হেঁটে গিয়ে তোর তোষকের মধ্যে লুকিয়ে ছিল?"

পুলিস বিচারের জন্য ফুকনকে হাকিমের কাছে পাঠাইল। সুরবালা মনের দুঃখে লোকের কাছে বলিতে লাগিল, "ফুকন এমন কাজ কেন কর্‌ল? আমি যে তাকে বড়ই স্নেহ করতাম; তাকে ভালবেসে কত খাবার জিনিস খাওয়াতাম, কত কাপড় জামা দিতাম। সে এমন অপকর্ম্ম করেছে, তবু তার জন্য কষ্ট হয়। সে দিন শুনলাম, চুরি স্বীকার করাবার জন্য দারগা তাকে বেত মেরে গায়ের রক্ত বের করে দিয়েছে' শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল।"

রামা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শোনে, আর বলে, "মা, এ দেশের মগগুলাকে কি বিশ্বাস করতে আছে? ওদের মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা, কিন্তু ভিতরে বিষ। বেটারা সুবিধা গেলে মনিবের গলায় ছুরি বসাতে পারে।"

ইহার পর হাকিমের আদালতে ফুকনের মোকদ্দমা উঠিল। হাকিম একজন বাঙ্গালী। তিনি পঁচিশ বৎসর আদালতে কাজ করিয়া পাকা হইয়াছেন। এখন লোকের মুখের ভঙ্গী ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া কে দোষী, কে নির্দ্দোষী মোটামুটি তাহা বুঝিয়া লইতে পারেন। আজ ফুকনের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তাহাকে যখন আদালতে উপস্থিত করা হইল এবং সরকারী উকিল তাহাকে কূট প্রশ্ন করিয়া যখন অস্থির করিয়া তুলিল, তখন হাকিম ফুকনের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন এবং মনোযোগের সহিত তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। হাকিম তাহার ম্লান মুখ, করুণ দৃষ্টি ও সরল উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি সে জন্য সরকারী উকিলের কূট প্রশ্নে বাধা দিয়া স্বয়ং ফুকনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমাকে দেখে সরল মানুষ বলে বোধ হচ্ছে। তুমি অপরাধ করে থাক্‌লে হয় ত এই প্রথম অপরাধ করেছ। যদি যথার্থই প্রলোভনে পড়ে হার চুরি করে থাক, তা হলে স্বীকার কর। তোমার শাস্তি যাতে কম হয়, সে বিষয়ে আমি চিন্তা করব।"

ফুকন। আমি হার চুরি করি নাই। এই বয়সে এ দেশের অনেক বড় লোকের বাড়ীতে চাকুরি করেছি, কাকেও ফাঁকি দিয়ে একটি পয়সা পর্য্যন্ত গ্রহণ করি নাই। কেনই বা তা করব? আমার আর কে আছে? আমি একলা মানুষ, যা রোজগার করি, তাই আমার পক্ষে ঢের।

হাকিম। তুমি ক্ষুদ্র লোক; সামান্য ভৃত্যের কার্য্য কর; এক ছড়া মুক্তাহার দেখে তোমার প্রলোভনে না পড়া কি সম্ভব?

ফুকন। হুজুর, আজ আমি আমাকে মগ বলে পরিচয় দিই এবং চাকরের কাজ করি বটে; কিন্তু আসলে আমি মগও নই, ক্ষুদ্র লোকের ঘরেও আমার জন্ম হয় নি। আমার মুক্তাহার না থাকলেও হাতে হীরা বসান আংটি ছিল।

উকিল। বাপ্‌রে! তবে ত তুমি এক জন মস্ত লোক ছিলে; হাতে সেই হীরা-বসানো আংটি ছিল বলেই বুঝি মুক্তাহারের উপর দৃষ্টি পড়েছে!

হাকিম। বটে! তুমি মগ নও? তবে তুমি কি? কেন মগের ছদ্মবেশে ভৃত্যের কাজ করছ?

ফুকন। বিপদে পড়ে ভৃত্যের কাজ করছি; যদি শুনেন ত আমার সকল দুঃখের কথা ভেঙ্গে বলি।

উকিল। হুজুর, এই ছোঁড়াটা পাকা বদমায়েস; খালি টালবাহানা করে, একথা সে কথা বলে, আমাদের ধোঁকা দিতে চায়। বলি মগের পো, তুমি তোমার ও সকল কেচ্ছা এখন রেখে দাও; যদি চোর না হয়ে ভাল মানুষই হবে, তবে মুক্তাহার তোমার তোষকের ভিতর গেল কি করে?

হাকিম। তুমি তোমার সকল কথা বলে যাও।

ফুকন। আমি বাঙ্গালী। কলকাতার এক কায়স্থ পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা ভূষণচন্দ্র বসু চাটগাঁয়ে কারবার করতেন। ছেলে বেলায়ই আমার মাতার মৃত্যু হয়েছিল; সেই জন্য পিতা আমাকে ও আমার একটি ভগিনীকে কাছে রেখে প্রতিপালন করতেন। আমার যখন দশ বৎসর বয়স, তখন নৌকায় সমুদ্র দেখ্‌তে গিয়াছিলাম। সে দিন অমাবস্যা, ভাঁটার বড় টান; জলের তোড়ে নৌকা সমুদ্রে গিয়া পড়্‌ল। মাঝি কিছুতেই আর নদীর মুখে ফিরে যেতে পারল না। তার পর বাতাস আর জলের স্রোত নৌকাটিকে ভাসিয়ে একটা চরের কাছে নিয়ে গেল। চরের কাছে গিয়েই নৌকা ডুবে গেল। নৌকার মাঝি খুব সাঁতার জান্‌ত; সে আমাকে নিয়ে সাঁতার কেটে চরের উপরে উঠ্‌ল। শেষকালে এক মগের একখানি দেশী জাহাজে আমরা আশ্রয় পেলাম। ঐ মগ এক সময় ডাকাতি করত, তখন ডাকাতি ছেড়ে কারবার আরম্ভ করেছিল। তবু সে আমার হাতের হীরার আংটির লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লে না। সেই আংটিটি খুলে নিয়ে আমাদের ব্রহ্মদেশের এক পল্লীগ্রামে লুকিয়ে রাখ্‌লে। সেই গ্রামেই আমার সঙ্গের মাঝিটি মারা গেল; তখন আমি একেবারে অসহায়। এই অবস্থায় সেই মগ আমাকে নিয়ে ব্রহ্মদেশের এক প্রান্তে চলে গেল। সেখানে সে চামড়ার ব্যবসা করত; আমাকে তার চাকর হয়ে থাক্‌তে হল।

হাকিম। তার পর?

ফুকন। তার পর কয়েক বৎসর পরে আমি বড় হয়ে স্বাধীন হলেম বটে, কিন্তু চাটগাঁয়ের এক বর্ম্মিজের কাছে শুন্‌লাম, আমার বাবা কারবারে মন দিতেননা বলে তাঁর কারবারে বিস্তর লোকসান ও সেজন্য দেনা হল; দেনার দায়ে ঘর বাড়ী বিক্রি হয়ে গেল। শেষকালে তিনি মনের দুঃখে মারা গেলেন। তিনি মারা যাবার অনেক আগেই আমার বোনের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু কার-সঙ্গে বোনের বিয়ে হয়েছে, আমার সে বোন কোথায়, কিছুই জানবার সুবিধা হল না।

হাকিম। থাম্‌লে কেন? বলে যাও।

ফুকণ। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে আর চাটগাঁয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছা হল না। মনে হল, দুঃখ সহ্য করবার জন্যই আমি জন্মেছি। চিরদিন দুঃখ সহ্য করেই যাব, আমার পক্ষে এই মুলুকে মগ হয়ে থাকাই ভাল। তার পর ব্রহ্মদেশের অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেক বড় লোকের বাড়ী কাজ করেছি। সম্প্রতি এই এক বৎসর হল রেঙ্গুন সহরে এসেছি।

৫

ফুকনের পরিচয় পাইয়া ভবেশ বাবু বিস্মিত হইলেন। হাকিম এজলাস হইতে উঠিয়া তাঁহাকে একটি নির্জ্জন ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন,

"ফুকনের কথা কি সত্য? সে কি তবে যথার্থই আপনার স্ত্রীর সহোদর ভাই?"

ভবেশ। এ বিষয়ে আমার ত সংশয় প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না।

হাকিম। কেন?

ভবেশ। উহার চেহারার সঙ্গে আমার স্ত্রীর চেহারার আশ্চর্য্য ঐক্য। আমি ত প্রথম দিনই উহাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। বোধ হয়, রক্তের একটি স্বাভাবিক টান বলেই ফুকনের প্রতি আমার স্ত্রীর অতিশয় মমতা জন্মেছিল।

হাকিম। আপনি কি হার চুরির কথা সত্য বলে মনে করেন?

ভবেশ। সত্য নাও হতে পারে। হয় ত আমার রামা চাকর ফুকনকে বিপন্ন করবার জন্যই এই কার্য্যটি করেছে। কারণ, রামার সে শত্রু, রামা তাকে জব্দ করবে বলে ভয় দেখায়েছিল।

হাকিম একটু চিন্তা করিয়া পুলিসের একজন দারগাকে সেই গুপ্ত কুটুরিতে ডাকিয়া আনিয়া এবং রামার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করা যায় কি না সে বিষয়ে একটু চেষ্টা করিতে বলিলেন।

দারগা তৎক্ষণাৎ রামাকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেলেন এবং কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া, নানা রকম ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রামা আর কখনই পুলিসের হাতে পড়ে নাই; আজ দারগার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও কনেষ্টবলের হাতে বেত দেখিয়া, হার চুরির সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিল। হাকিম ফুকনকে খালাস দিয়া, রামাকেই দুই বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইলেন।

ফুকন যখন খালাস পাইয়া কাছারির নীচের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ভবেশ বাবু গাড়ী লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন "ফুকন, তুমি আমার গাড়ীতে উঠ।"

ফুকন। বাবু আমাকে মাপ করবেন; আমার আর চাকুরি করবার ইচ্ছা নাই।

ভবেশ। না ফুকন, আর তোমায় চাকুরি করতে হবে না। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, আজ নিঃসঙ্কোচে আমার গাড়ীতে এস বস।

ভবেশের বিস্তর অনুরোধে ফুকন তাহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভবেশ কহিলেন, "তোমার যে একটি বোন ছিল, তাঁর নাম কি?"

ফুকণ। সুরবালা।

ভবেশ। তোমার নাম অক্ষয়।

ফুকণ। আমার নাম অক্ষয়। সেই যে মগের কথা বলেছি, সে আমাকে ফুকন বলে ডাকৃত।

ভবেশ। কিন্তু তুমি কেন সুরবালা নাম শুনেও তোমার বোনকে বোন বলে বুঝতে পারলে না?

ফুকণ। আমার বোন কে?

ভবেশ। আমার স্ত্রী সুরবালা।

ফুকণ। আপনি কি বলুছেন? তাঁর নাম সুরবালা বলেই কি তিনি আমার বোন?

ভবেশ। তিনিই তোমার বোন। আমিই তোমার ভগিনীকে বিবাহ করেছি।

ইহার পর ভবেশ তাঁহার বিবাহের কথা বলিতে লাগিলেন। ফুকন শুনিতে শুনিতে চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর ভবেশ কহিলেন "তুমি কি তোমার বাপ, মা, বোন ও নিজের সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে পার, যা তোমার বোন আর তুমিই জানতে; তা ছাড়া আর কেহই জানতে পারেন নাই।"

একটু চিন্তা করিয়া ফুকন কতকগুলি কথা বলিল। এমন সময় গাড়ী ভবেশের বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভবেশ তাহাকে বাহির বাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া, সুরবালার কাছে গিয়া ফুকনের কথিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "তোমার ছেলেবেলার এই কথাগুলি কি সত্য?

সুরবালা হাসিয়া কহিলেন "মাগো, এ সকল কথা তোমাকে কে বল্লে? কাছে শুনলে? আমি ত এর অনেক কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

ভবেশ। তোমাকে একটা আশ্চর্য্য কথা বলব; আজ কয়দিন কথাটা গোপন করে রেখেছিলাম।

সুরবালা। কি আশ্চর্য্য কথা?

ভবেশ বাবু বাহির বাড়ী হইতে ফুকনকে লইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত কাহিনী সুরবালাকে শুনাইতে লাগিলেন। সুরবালা ফুকনের মুখের পানে চাহিয়া চোখে জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ইহার পর সুরবালা ফুকনকে আপনার ভাই বলিয়া গ্রহণ করিল এবং হৃদয়ের সুনির্ম্মল স্নেহ দিয়া তাহাকে সুখী করিল। ফুকন ঈশ্বরের উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া বলিতে লাগিল,

"হে ভগবান, একদিন আমি আমাকে দুঃখী মনে করিয়া কত চোখের জল ফেলিতাম। আর আজ তোমার করুণায় আমার কোন সুখেরই অভাব নাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন চিরদিন তোমাকে দয়াময় পিতা বলিয়া ভক্তি করিতে পারি।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বসন্তের কাহিনী।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্রান্ত পৃথিবী দেবী সিরিস বাড়ী ফিরে এলেন, কিন্তু কৈ অন্য দিনের মত হাসিমুখ প্রসারপিন ছুটে এসেত তাঁকে জড়িয়ে ধরল না, তার হাসির মধুর নিক্কণ কোথাও শোনা গেল না, তার সুন্দর আলোকরা মুখ খানি কোথাও দেখ্‌তে পেলেন না। সিরিস এঘর, ও ঘর, সে ঘর সারা বাড়ী অস্থির হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধান পেলেন না। সন্ধ্যা বয়ে গেল, রাত্রির অন্ধকার চারিদিক ঘিরে এল, তবু প্রসারপিনের দেখা নাই। তখন আবার তিনি তাকে খুঁজতে বেরুলেন। অন্ধকারে পথ দেখা যায় না. তাই কাছের একটি আগ্নেয় গিরির অগ্নি শিখা হতে একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বলিয়ে নিয়ে মাঠে মাঠে, বনে বনে, নদী তীরে তাকে খুঁজতে চল্লেন। কত পথ অতিক্রম করে গেলেন, রাত্রির অন্ধকার দূরে চলে গেল, সূর্য্যদেব সমস্ত পৃথিবী আলোতে, গানে, আনন্দে উজ্জ্বল ক'রে দেখা দিলেন, রাত্রির নিদ্রা, নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার কাটিয়ে পৃথিবীবাসী সকলের যেন নব জন্ম লাভ হল, তবুও যখন প্রসারপিনকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন পৃথিবীর যিনি অধিষ্ঠাত্রীদেবী, যিনি জননী অন্নপূর্ণা, তিনি জীবনের অবলম্বন ও একমাত্র আনন্দ তাঁহার সেই একটি মাত্র কন্যার বিরহে ও শোকে আমাদের সামান্য মানুষের মত একেবারে পাগলের মত হয়ে গেলেন। সেই দিন হতে তাঁর সব কর্ত্তব্য পড়ে রইল। সিরিস হাতে সেই মশালটি ধ'রে রাত নেই, দিন নেই, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কুয়াশা কিছুরই বাধা না মেনে পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, মনের মধ্যে অতি ক্ষীণ একটি আশা জেগে রইল, যদি কোথাও পৃথিবীর কোন দূর অজানিত কোণে তাঁর স্নেহের পুতলিটিকে আবার খুঁজে পান। এদিকে তাঁর অযত্নে মাঠে আর ধান হয় না, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, আকাশে মেঘের ছায়া নাই, নদীর জল শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগল, আগুনের মত তপ্ত বাতাস ঝড়ের মত ছুটে চলল, মনে হতে লাগল, পৃথিবীদেবীর দুঃখে সমস্ত পৃথিবী যেন হায় হায় করছে। দলে দলে পৃথিবীর লোক তাঁর কাছে এসে পড়তে লাগল, কান্নাকাটি করতে লাগল, বল্লে "মা, তুমি যদি দয়া না কর, তবেত আমরা আর বাঁচিনা, তুমি যদি একবার আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর, তবেই আমরা প্রাণধারণ করতে পারি।"

পৃথিবীদেবী কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত দুটি উদাস চোখ তুলে তাদের দিকে চেয়ে বল্লেন, যত দিন আমার মেয়েকে খুঁজে না পাই, তত দিন তার কথা ছাড়া আর কোন কথাই মনে আনতে পারছিনে, ততদিন আমি কোন কাজেই হাত দিতে পারব না, যদি কোন দিন তাকে আবার ফিরে পাই, তবে আবার তোমাদের যত্ন করতে পারব, তা না হলে আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, তোমরা অন্য উপায় দেখ।" তখন পৃথিবীবাসী সকলে দেবতাদের যিনি রাজা, জুপিটার তাঁরি কাছে প্রার্থনা করতে লাগ্‌ল, "হে দেবরাজ, দয়া কর, আমাদের দুর্দশা দেখে কৃপা কটাক্ষ কর, আজ্ঞা কর, পৃথিবীদেবী যেন তাঁর কন্যাকে ফিরে পান, তা না হলে এক কন্যার জন্যে আমরা সবাই মারা যাব, এই কি তোমার বিচার? আমরা তো তোমারি সন্তান, তুমি আমাদের বাঁচাও।" রাত্রি দিন এই কাতর প্রার্থনা দেবরাজ জুপিটারের আকাশ মন্দিরে ধ্বনিত হতে লাগ্‌ল।

সমস্ত পৃথিবী ব্যর্থ অন্বেষণে ঘুরে ঘুরে দেবী সিরিস আবার সেই শূন্য সিসিলি দ্বীপে ফিরে এলেন। এক দিন বনের পাশে একটি নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় নদীর জল বেড়ে উঠে দুধার ছাপিয়ে গেল, আর ঠিক সেই খানে নদীর স্রোতে কি একটা ভেসে এসে পড়ল। সিরিস সেটা কি দেখ্‌বার জন্য উঠিয়ে নিয়ে দেখেন, যে সেটা প্রসারপিনের মেখলা। প্লুটো যে দিন তাকে চুরি করে নিয়ে যান, সে দিন প্রসারপিন মাকে আপন সংবাদ জানাবার জন্যে নদীর জলে সেটা ফেলে দিয়েছিলেন। নদীর দেবতা সেটিকে এতদিন যত্ন করে তুলে রেখে ছিলেন, আজ সিরিসকে দেখে তাঁর সম্মুখে সেটি এনে দিলেন। সিরিস সেটিকে হাতে তুলে নিয়েই চিনতে পারলেন, তখন তার দুচোখ বেয়ে অনবরত জল পড়ে বুক ভেসে যেতে লাগ্‌ল, মেখলাটিকে কখনো বুকের উপর কখনো মুখের পাশে তুলে ধরে রাখতে লাগলেন, যেন এমনি করে তাঁর সেই আদরের মেয়েটিকে আবার আদর করছেন। এমন সময় পাশের একটি উৎসের কলধ্বনি ক্রমশঃই বেড়ে উঠতে লাগল, মনে হতে লাগল, সে যেন কি বলছে। সিরিস মনোযোগ করে শুন্‌তে পেলেন, উৎস বলছে, "আমি এই উৎসের সুন্দরী, আমি একেবারে পৃথিবীর বুকের ভিতরের পাতাল রাজ্য হতে আসছি। মা বসুন্ধরা, তোমার মেয়েটি সেই অন্ধকার রাজ্যে প্লুটোর সঙ্গে এক সিংহাসনে বসে আছেন, দেখতে পেয়েছি; তাঁর মাথায় রাজমুকুট, সর্ব্বাঙ্গ মণিমুক্তায় খচিত, কিন্তু মুখে হাসি নেই, চোখ দুটি কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত, বিষণ্ণ, ম্লান। আমি বেশী আর কি বল্‌ব, আমার ছুটি ফুরল, এখনি আবার আমাকে সূর্য্যালোকে নৃত্য করতে হবে, আকাশ আর বাতাস বার বার আমাকে ডাকছে।"

মেয়ের সংবাদ পাবামাত্র সিরিস জুপিটারের কাছে গিয়ে বল্লেন, "হে দেবরাজ, আমার মেয়েকে কোথায় রাখা হয়েছে, এনে দাও, আমি পৃথিবী আবার ফুল, ফল ও শস্যে পরিপূর্ণ করে দেব, পৃথিবী বাসীর সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। জুপিটার মায়ের দুঃখ দেখে আর পৃথিবীবাসীর কাতর প্রার্থনায় চঞ্চল হয়ে উঠে ছিলেন। তিনি বল্লেন, "সিরিস, তোমার মেয়ে প্লুটোর রাজ্যে গিয়ে যদি কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে না থাকে, তাহলে তাকে ফিরে নিয়ে আস্‌তে পারবে।" আজ্ঞাপাবামাত্র কত আনন্দে সিরিস সেই রসাতল রাজ্যে ছুটে গেলেন, কিন্তু হায় গিয়ে শুন্‌লেন, সেই দিনই প্রসারপিন ছয়টি দাড়িমের দানা খেয়েছে, আর তারি জন্যে তাকে ছয় মাস করে পৃথিবী ছেড়ে সেই অন্ধকার পাতালপুরে বাস করতে হবে। দেবতার বিধানের উপর তো আর কারো হাত নাই; তাই ছয় মাস করে প্রসারপিন মায়ের কাছে থাকেন, আর ছয় মাস করে প্লুটোর কাছে থাকেন। ছ মাস মেয়েটিকে নিয়ে সিরিস মনের আনন্দে বাস করেন, গাছে ফুল ফোটে, পাখীরা গান গায়, আকাশ সুনীল হয়, সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বসন্ত লক্ষ্মীকে অভিবাদন করবার জন্যে সমস্ত পৃথিবীময় উৎসব আয়োজন হয়। আবার তিনি যখন প্লুটোর কাছে ফিরে যান, তখন কন্যার বিরহে পৃথিবী দেবী কাতর হয়ে পড়েন, তখন তিনি কোন কাজই করেন না, তাঁর কত যত্নের গাছ

পালা, মাঠ ক্ষেত, নদী, উৎস, পর্ব্বত, উপত্যকা সব অনাদরে পড়ে থাকে। আকাশে হয় বজ্র বৃষ্টি, নয় কুয়াশার অধিকার বিস্তার হয়। সুন্দরী পৃথিবী যেন বিধবা স্ত্রীলোকের মত শ্রীহীন হয়ে পড়ে, পাখীর গান শোনা যায় না, নদীর জল শীতে কাতর হয়ে নীরব হয়ে থাকে, ফুল, ফল, শস্য কিছুরই কোন শোভা থাকে না। শোকাতুরা পৃথিবী উদাসীনও শ্রান্ত ভাবে আলু থালু বেশে মাটীতে বুক দিয়ে পড়ে শুধুই বিলাপ করেন। হঠাৎ এক দিন প্রসারপিনের সুকুমার পদধ্বনি শোনা যায়, অমনি যাদুমন্ত্রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জেগে ওঠে, নদীর কল তানে, পাখীর কাকলীতে, বাতাসের মর্ম্মর শব্দে আগমনীর উৎসব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, ফলে, ফুলে, শস্যে, নত কিশলয়ে, পথে, ঘাটে, মাঠে উৎসবের সুন্দর তোরণ শ্রেণী সজ্জিত হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ঘুমন্ত-পল্লী।

গাঁয়ের বাটে লাগ্‌ল যবে
আমার ছোট তরী.
ঘনিয়ে আসে তখন ভবে
শীতের বিভাবরী।
রাখাল শিশু গোপাল নিয়ে
গাঁয়ের বাঁকা পথটী দিয়ে
ফিরিছে ঘরে নাচিয়ে হিয়ে
বাঁশীতে তান ধরি!
বিমান-পথ পাখীরা সবে
জাগায়ে কত মধুর রবে
আপন নীড়ে গিয়াছে কবে
আকুল মুখে মরি!
গাঁয়ের ঘাটে লাগ্‌ল যবে
আমার ছোট তরী,
ঘনিয়ে আসে তখন ভবে
শীতের বিভাবরী!

উঠিয়া তীরে বিশাল মাঠ
হেরিনু আঁখি পাশে,
কোথায় মোর নিঝুম বাট
আসিনু যার আশে!
শীতল বায়ু পাগল প্রায়
বেড়ায় খুঁজি কাহারে হায়,
খড়ের রাশি হেথা হোথায়
ভরিল তা'রি বাসে!
নিভায়ে দিয়ে সোনার তারা
ধরায় করি আপনা-হারা
ঢালিয়ে শুধু সুধার ধারা
আকাশে চাঁদ হাসে!
উঠিয়া তীরে বিশাল মাঠ
হেরিনু আঁখি পাশে,
কোথায় মোর নিঝুম বাট
আসিনু যার আশে।

কি জানি ভাই, কিসের টানে
উতরি' মাঠ ধীরে,
চলিনু ত্বরা গৃহের পানে
দীঘীর তীরে তীরে!
আমের বনে বাঁশের-ঝাড়ে
দোলায়ে শির নীরব-ঠারে
চায় কি মোরে উভয় ধারে
বাঁধিতে হিয়াটীরে!
নারিকেল ও খেজুর গাছে
বীরের মত দাঁড়িয়ে আছে,
তা'দের ছায়া কেমন নাচে
দীঘীর কালো নীরে!
কি জানি ভাই, কিসের টানে
উতরি' মাঠ ধীরে,
চলিনু ত্বরা গৃহের পানে
দীঘীর তীরে তীরে!

কেয়া বনের কাঁটায় মোর
কাপড় ধরি' টানে,

টুটিয়া দিনু ঘুমের ঘোর
তাই কি কর কাণে!
সিমের লতা মাচার 'পরে
হাজার ফুলে আকুল করে
শিশির-কণা পড়িছে ঝরে
বাঁধন নাহি মানে!
চাঁদের কণা কলাগাছের
পাতার' পরে কত দেশের
মাণিক-মণি রাজ রাজের
বিলায় কেবা জানে।

কেয়া বনের কাঁটায় মোর
কাপড় ধরি টানে,
টুটিয়া দিনু ঘুমের ঘোর
তাই কি কর কাণে।

বিশাল কায় বট-অশথ
রচেছে মায়া-পুরী,
পাতার ফাঁকে জোছনা কত
খেলিছে লুকোচুরী।
স্বপন-বালা স্বরগ ছেড়ে
দাঁড়াল আসি আঁচল নেড়ে
বিরাম-সুখ বিকায় কে রে
সারাটী গ্রাম জুড়ি'!
শিবার দল কভু বা মুখে
চীৎকারিছে ঊর্দ্ধ মুখে
জননী সুতে লয়েন বুকে
সকল ভয় দুরি'!

বিশাল কায় বট-অশথ
রচেছে মায়া-পুরী,
পাতার ফাঁকে জোছনা কত
খেলিছে লুকোচুরী!

বিজন পথে আমি যে একা
নাইকো লোকজন,
চেনা-মুখটী যায় না দেখা
সবাই অচেতন!
শুনেছিলাম ছেলেবেলায়
ঘুমের দেশ আছে কোথায়
ঘুমায় সবে শুধু সেথায়
হরষে অকারণ!
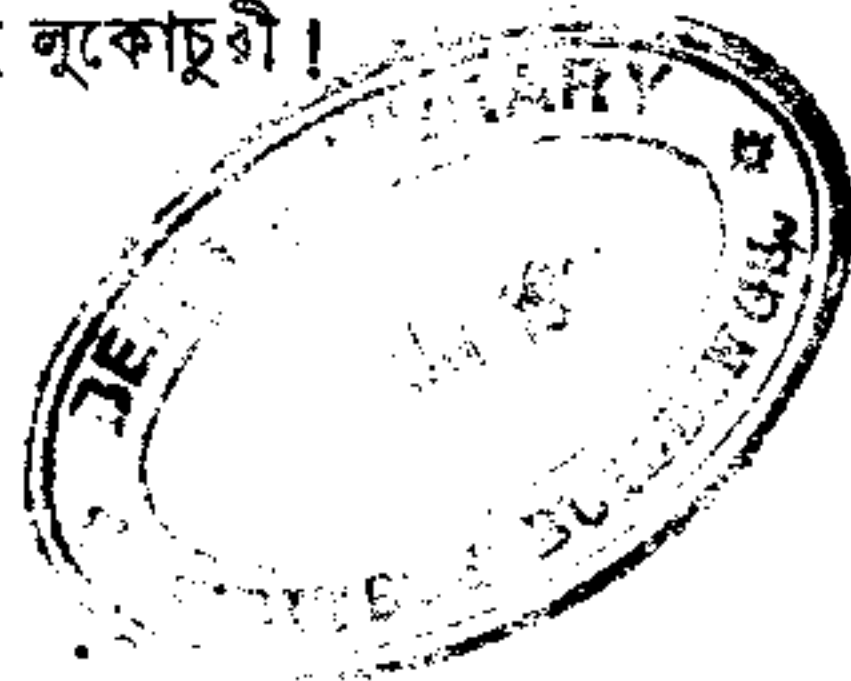
আজ কি আমি মনের ভুলে
সাধের তরী ঊষায় খুলে
পশিনু আসি তাহারি কূলে
লভিতে সমাজন!
বিজন পথে আমি যে একা
নাইকো লোকজন,
চেনা-মুখটী যায় না দেখা
সবাই অচেতন!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল,—

১। জলপাই।
২। ৮৪, ৬০।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, আবুল কাসেম মহম্মদ ইদ্রিছ খাঁ, শ্রীমতী রাণীমায়া দেবী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বজ্রযোগিনী এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীকানাই লাল গঙ্গোপাধ্যায়, N. N. De, Esqr. শ্রীবিনয়কুমার নন্দী, শ্রীঅমিয়েন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ।

নূতন ধাঁধা।

(T. W. Ahmed প্রেরিত।)

১। দেখিলে তা পায় না,
পেলে কিন্তু দেখে না,
বল দেখি কি?
(শ্রীনীরদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

এতটুকু মুখ তার প্রকাণ্ড শরীর,
হস্ত পদ নাই তার উদর গভীর;
যত দাও তত খায় করিয়া আনন্দ,
খাবার না দিলে পর সবে করে অন্ধ;
মিটি মিটি চায় সে বসি উচ্চাসন,
পড়ুয়া ও গৃহিণীর আদরের ধন॥

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ রায়, রায় বাহাদুর

ART PRESS

মুকুল

১৫শ ভাগ। } চৈত্র, ১৩১৬। { ১২শ সংখ্যা।

ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়, বাহাদুর।

"মহৎ চরিত দেখি সদা হয় মনে,
মহৎ হইতে পারি, আমরা যতনে।"

মাঝে মাঝে মহাত্মাদের চরিত্র এবং জীবনী আলোচনা করিতে হয়। কেমন করিয়া তাঁহারা বড় হইলেন, কত দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর দিয়া তাঁহাদের যাইতে হইয়াছে, তাঁহারা কেমন নির্ভীকভাবে বাধা বিঘ্ন দূরে ঠেলিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন, চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রাণে বল পাওয়া যায়। তাঁহাদের চরিত্রের পুণ্যময় প্রভাব আমাদিগকে প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সদ্‌বিষয় এবং সাধু চরিত্রের আলোচনায় মনে ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়।

আজ আমি তোমাদিগকে আর এক জন কৃতী পুরুষের কথা বলিয়া দেখাইব, সাধু চেষ্টায় এবং সৎ ইচ্ছায় মানুষ কত ভাল কাজ করিতে পারে। তোমরা কৃষ্ণ নগরের স্বনামধন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনিয়াছ। ইঁহার সভায় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান এবং সৎপুরুষগণ সর্ব্বদা সমবেত হইতেন। গোপাল ভাঁড় ইঁহারই পারিষদ্ ছিলেন। এই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিখ্যাত বংশে ১৮৪৮ খৃঃ ২৭শে জুলাই, রায় দেবেন্দ্রনাথ রায়, বাহাদুরের জন্ম হয়। দেবেন্দ্রনাথ যখন আট বৎসরের বালক, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। রায় যদুনাথ অশেষ সদ্‌গুণ সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন। পরোপকারিতা তাঁহার অসাধারণ গুণ ছিল। অন্যের বিপদে, অপরের প্রয়োজনে তিনি যেমন প্রাণ দিয়া খাটিতেন, এমন প্রায় দেখা যায় না।

কলিকাতা হইতে অনেক বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধব যদুনাথের কৃষ্ণনগর ভবনে যাইয়া সময় সময় অবস্থান করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি মহামনা ব্যক্তিগণের আদর্শে বালক দেবেন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হইতেন।

সম্মুখে মহত্ত্বের জীবন্ত আদর্শ দেখিলে প্রাণ উচ্চাভিমুখে ধাবিত হয়। প্রাণ যাহার উচ্চাভিমুখ

ধাবিত, সঙ্কল্পে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যসাধনে যে তৎপর, তাহার সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী. কার্য্যের গুরুত্ব এবং শ্রম দেখিয়া যে ভীত হয়, সে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ :এই সকল মহাপুরুষদিগকে স্বগৃহে দেখিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের মত হইতে চেষ্টা করিতেন।

কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ করার পর, দেবেন্দ্রনাথকে শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য কলিকাতা আসিতে হইল। কলিকাতা আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ "কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে" (এই স্কুল পরে হেয়ার স্কুল হইয়াছে।) ভর্ত্তি হইলেন, এবং এখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র. তখন পরলোকগত লালমোহন ঘোষ মহাশয় বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। লালমোহনের পূর্ব্বনিবাস ঢাকা হইলেও তাঁহারা ইদানীং কৃষ্ণনগরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সূত্রে দেবেন্দ্রনাথের সহিত লালমোহনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। দেবেন্দ্রনাথ লালমোহনের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া বিলাত যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ষ্টীমার ছাড়িবার পূর্ব্ব রাত্রে এ ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। যদুনাথ আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিছুতেই তাঁহাকে বিলাত যাইতে দিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের ক্রীত টিকিট, তৈয়ারী পোষাক প্রভৃতি লইয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেবারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সকল আশা ভরসা নিষ্ফল হইয়া গেল।

এই নৈরাশ্যে বিষম ক্ষুণ্ণ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরিলেন না। তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন। মন যাহার সবল, পৃথিবীর কোন প্রতিবন্ধকতা তাহার পথ রোধ করিতে পারে না। প্রথম হইতেই দেবেন্দ্রনাথ আপনার মেধাবিত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। বৎসর বৎসর বিশেষ সার্টিফিকেট পাইয়া ১৮৭৩ খ্রীঃ তিনি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইলেন। নদীয়ার রাজা তাঁহাকে আপনার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন. কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সে কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য স্বীকার করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের মনের বল অসাধারণ ছিল। যেখানে অন্যান্য চিকিৎসকগণ গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, তিনি নির্ভয়ে তথায় বিচরণ করিতেন। যে সকল গুণ থাকিলে সুচিকিৎসক হওয়া যায়, তাঁহার সে সকল গুণ প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি মিষ্টভাষী, সহৃদয়, এবং ধীর ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মধুর সৌজন্যে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন। কর্ম্মোপলক্ষে তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেই স্থানেই তিনি প্রভূত যশোমান লাভ করিয়াছেন।

কিছু দিন কাজ করিবার পর দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইল; গবর্ণমেণ্ট তখন তাঁহাকে রাজপুতানা, দিল্লী, আগরা, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। ১৮৭৭ খৃঃ মান্দ্রাজের সেই অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় দেবেন্দ্রনাথ উপযাচক হইয়া তথায় গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে কেবল চিকিৎসা ব্যবসায় নহে, অনেক রাজকার্য্যও করিতে হইত। এক সময়ে তাঁহার অধীনে বেলারি ক্যাম্পে চারি সহস্র দুর্ভিক্ষ পীড়িত মান্দ্রাজবাসী অবস্থান করিতেছিল। এত লোকের অভাব ও অসুবিধা মোচনের সুব্যবস্থা করা সহজ নহে। দেবেন্দ্রনাথ এমন কৃতিত্বের সহিত এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যে ভারতের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ বাহাদুর প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বনামাঙ্কিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছিলেন। ভারতের তৎকালীন চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তা, সার্জ্জন জেনারেল ডাঃ বীট্‌সন্. দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ এবং তৎসহ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি প্রশংসিত হইয়াছেন। এই সময় একটি ভাল কাজের জন্য একজন দক্ষ

ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। ডাঃ বীট্‌সন্ দেবেন্দ্রনাথের উপর এমন বিশ্বাসসম্পন্ন ছিলেন, যে তিনি যত দিন মান্দ্রাজে ছিলেন, তত দিন ঐ পদে অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহাতে প্রবিষ্ট হন। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর এমন বিশ্বাস লাভ আর কয় জন বাঙ্গালী ডাক্তারের ভাগ্যে ঘটিয়াছে জানি না।

এই সমস্ত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সিভিল সার্জ্জনের কার্য্য দিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসর মাত্র দেবেন্দ্রনাথ তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এই অল্পকালের মধ্যে তিনি তথায় বিপুল যশের অধিকারী হন। তৎপর বঙ্গদেশে ফিরিবার কালে ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার সার্ চার্লস্ বার্‌নার্ড মহোদয় দেবেন্দ্রনাথের অশেষ সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার হঠাৎ আগমনে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ যদিও ব্রহ্মভাষা বা ব্রহ্মবাসীর সহিত পরিচিত ছিলেন না, তথাপি তিনি কার্য্য ক্ষমতায় সকলেরই প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন।"

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ মালদহে সিভিল সার্জ্জনের কার্য্য করেন; তথা হইতে ১৮৮৪ খৃঃ তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে অধ্যাপক হইয়া আগমন করেন। এই কার্য্য হইতে কুড়ি বৎসর পরে তিনি ১৯০৩ খৃঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

কলিকাতা অবস্থান কালে দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য "কলিকাতা পুলিশ সার্জ্জনের" কার্য্য করেন। এই পদটি মেডিকেল সার্ব্বিসের লোকদের একচেটিয়া। দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বা পরে অন্য কোন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ঐ কার্য্য পান নাই।

যাঁহারা পরহিতকর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, কলিকাতায় তাঁহাদের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে। সুবিধা পাইয়া অনলস দেবেন্দ্রনাথ একেবারে কর্ম্মের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট্ সভার সভ্য হইয়া তথায় বাঙ্গালী ছাত্রগণের উন্নতি কল্পে বহু পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বহু সভা সমিতিতে তাঁহার নাম স্থায়ীভাবে জড়িত। তিনি "কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স ও সার্জ্জন্‌সের" সভাপতি, কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটি ও কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের সহকারী সভাপতি, বড় লাট বাহাদুরের অবৈতনিক চিকিৎসক প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্য করিয়া অবসরকাল চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক প্রণয়নে যাপন করিতেন।

রোগী, শয্যাপার্শ্বে দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ডাক্তারকে অবলোকন করিয়া এবং তাঁহার সহানুভূতি সূচক কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রাণে বল পাইত। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি পীড়িত লোকদের যে আবাস গৃহ, দেবেন্দ্রনাথ তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। এই কার্য্য তিনি চিরদিন এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, যে বহু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার অশেষ সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ এক জন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন, কার্য্যদক্ষতা এবং সদ্‌গুণে ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত তাঁহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শেষ জীবনে দেবেন্দ্রনাথ বহুমূত্র পীড়াতে অনেক সময় বড় যন্ত্রণায় কাটাইতেন। গত ১৯০৯ খৃঃ ২৮শে নভেম্বর তারিখে পুত্র পৌত্রাদির সম্মুখে কলিকাতার বাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এক জন প্রকৃত কর্ম্মবীর এবং হৃদয়বান্ ব্যক্তি হারাইয়াছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ।

চাষার ভাগ্য।

১

বনের ধারে ছোট একখানি গ্রাম। সেই গ্রামে বনোয়ারীর বাস। বনোয়ারী গরিব চাষা; দিন আনে, দিন খায়। তাতেই সে বেচারী সুখী হইতে পারিত, কিন্তু তার যে স্ত্রী, সে ছিল, ভারী বদ। ঝগড়া-ঝাঁটি

না হইলে, বনোয়ারীর স্ত্রী শ্যামার কিছুতেই যেন দিন যায় না! বনোয়ারীর কথায় কাণ দিতে তার দায় পড়িয়াছিল।

দুপুর রোদে ঘামিয়া, সেদিন যখন বনোয়ারী মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়া, শ্যামার কাছে ভাত চাহিল, তখন শ্যামা তার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কহিল, "আর ভাত খেতে হবে না! ভাত রাঁধে কে? আমার আজ হাতে ব্যথা হয়েছিল, ভাত রাঁধা হয়নি!" বনোয়ারী বেচারী ভালমানুষ। ঝগড়া-কিচিমিচি সে ভালবাসিত না, তার উপর, সে শ্যামাকে খুবই ভয় করিত। সে বলিল, "তাহলে, আমি খাব কি?"

শ্যামা বলিল, "কেন, তোমার কি হাত নেই? নিজে, না হয়, একদিন রাঁধলে!"

বনোয়ারী বলিল, "এই রোদে খেটে-খুটে এসে এখন কি রাঁধা যায়, শ্যামা?"

শ্যামা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "বটে! আর এই গরমে আগুনের তাপে বসে, রাঁধলে, আমার বড্ড আরাম হয়, না?"

বনোয়ারীর সেদিন আর সহ্য হইল না। ইহার চেয়ে অনেক দুঃখ সে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আজ যেন তার অসহ্য হইয়া উঠিল! সে গামছাখানিতে কপালের ঘাম মুছিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মাঠে গেল না, বরাবর সরু পথ ধরিয়া, পুকুরের পাড় ঘুরিয়া বাঁশবন ছাড়াইয়া ক্রমে সে একটা বনে আসিয়া পৌঁছিল। নিস্তব্ধ বন! মাঝে মাঝে কাঠঠোকরা পাখীর কটকট্ শব্দ, মাঝে মাঝে ঘুঘুর করুণ ডাক, এই সবগুনিতে শুনিতে, ক্ষুধায় কাতর বেচারী বনোয়ারীর চোখে ঘুম আসিল।

ঘুম ভাঙ্গিলে, সে দেখে, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। রৌদ্রের তাপ কমিয়াছে! গাছের আড়ালে লাল মেঘের মধ্যে সূর্য্য অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে! সে বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিল। বনের মধ্যে, রাত্রে থাকিতে তার কেমন ভয় হইল!

আসিবার পথে, ঝাউগাছের পাশে, বনোয়ারি দেখে, একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত! উঁকি মারিয়া দেখে, গর্ত্তের মধ্যে অত্যন্ত অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না! মনে হয়, কে যেন ইহার মধ্যে খুব গাঢ় কাল কালি ঢালিয়া দিয়াছে। বনোয়ারীর মাথায় একটা মতলব আসিল। সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল।

২

তার পর দিন, সকালে উঠিয়া বনোয়ারী শ্যামাকে কহিল, "আমি আজ যেখানে যাব, তুমি যেন সেখানে, আমার পিছনে পিছনে আসিও না।"

শ্যামার একটি বিষম দোষ, যদি তাহাকে কেহ কোন কাজ করিতে বারণ করে, তাহা হইলে সে কাজ সে করিবেই! তা যতই কঠিন কেন, সে কাজ হউক না!

শ্যামা কহিল, "না, যাবে না! আমার খুসী, আমি যাব, দেখি তুমি কেমন আটকাতে পার।"

বনোয়ারী মনে মনে ভারী খুসী হইল। সে আবার কহিল, "না, কখনো তুমি যেতে পাবে না, কখনো না।"

আর তখন শ্যামাকে পায় কে? বনোয়ারী শ্যামাকে যত বারণ করে, শ্যামার জিদও তত বাড়িয়া যায়!

শেষে সত্যই সে বনোয়ারীর পিছনে চলিল।

বনোয়ারী, আসিয়া, বনের মধ্যে সেই গর্ত্তের সম্মুখে দাঁড়াইল, শ্যামাকে কহিল, "এধারে আসিও না।"

শ্যামা যদি বা এধারে না আসিত, বনোয়ারীর কথায় সে তাড়াতাড়ি গর্ত্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বনোয়ারীর দিকে চাহিয়া সে কহিল, "এই ত এসেছি, করবে কি?" তাহার কথা শেষ না হইতেই, সেখানকার মাটী ভাঙিয়া শ্যামা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল।

বনোয়ারী চাহিয়া দেখে, যতদূর দেখা যায়, শ্যামার কোন চিহ্নও নাই! তার মনে ভারী আহ্লাদ হইল। আঃ, এত দিনে ঝগড়াটে স্ত্রীটার হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে! আনন্দে সে গৃহে ফিরিল।

৩

কিছু কাল যায়। বনোয়ারী নিজের হাতেই রাঁধে, মাঠে যায়, কাজ করে। কিন্তু একদিন সে ভাবিল, নিজের হাতে রাঁধিতে ত বড় কষ্ট! শ্যামা এতদিনে

গুমরাইয়া গিয়াছে, এবার, আর সে ঝগড়া করিবে না তাহাকে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া আনা যাক্।"

লম্বা একটা দড়ি লইয়া আসিয়া বনোয়ারী সেটি গর্ত্তের মধ্যে ঝুলাইয়া দিল।

কিছু ক্ষণ দড়ি ঝুলাইয়া বনোয়ারী বসিয়া আছে, এমন সময় দড়িতে ভার বোধ হইল। বনোয়ারী হিড় হিড় করিয়া দড়ি টানিতে লাগিল। তুলিয়া দেখে, এ'ত শ্যামা নয়, এ যে একটা বাঁটুল দৈত্য! বনোয়ারী তাড়াতাড়ি তাহার গলাটা ধরিতে যাইবে, এমন সময় বাঁটুল কহিল, "আমাকে মেরো না। ও গর্ত্তে আর ফেলো না। গর্ত্তের মধ্যে আজ কদিন যে কষ্টে আছি, তা বলতে পারি না। কোথা থেকে একটা ঝগড়াটে মাগী এসেছে, তার জ্বালায় ত তিষ্ঠানো ভার হয়েছে! যাকে-তাকে সে কিল-চড়-ঘুসি মেরে বেড়াচ্ছে, আর গালাগালি, চীৎকার—উঃ, কদিনে আধমরা হয়ে গেছি। ভাগ্যে তুমি দড়ি ফেললে, তাই উঠে বাঁচলুম!"

বনোয়ারীর আর বুঝিতে বাকী রহিল না, সে ঝগড়াটে মাগী কে? বাঁটুলের কথা শুনিয়া, তার মনে দয়া হইল। সে নিজেও ত শ্যামার হাতে অল্প যন্ত্রণা পায় নাই, সে কহিল, "আচ্ছা, আমি তোমাকে ফেলে দেব না।"

বাঁটুল কহিল, "তুমি, ভাই, আমাকে উদ্ধার করলে, তার আমি প্রত্যুপকার করতে চাই। তুমি গরীব, বড় লোক হতে চাও?" বনোয়ারী কহিল, "সে আর কে না চায়, বল?" বাঁটুল কহিল, "তবে এক কাজ কর! আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলের অসুখ করে দেবো, কোন ডাক্তারের সাধ্য নাই, সে রোগ সারায়। কেবল তুমি গেলেই রোগ সারবে। তাহলে সকলে তোমাকে অনেক টাকাকড়ি দেবে, আর তুমিও মাসখানেকের মধ্যে বড় লোক হয়ে উঠবে।"

দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। দেশে এক নূতন রোগ আসিয়াছে, ডাক্তারেরা তাহা আরাম করিতে পারে না। ডাক্তারী বহিতে তার কোন কথাই নাই! হঠাৎ বনোয়ারী এক দৈব ঔষধ পাইয়া গিয়াছে। তার আর স্নানাহারের সময় নাই। রোগীর বাড়ী ঘুরিতেই সময় কাটিয়া যায়! বাড়ীতে অবধি রোগীর দল কাতার দিয়া বসিয়া থাকে! টাকাকড়িরও আর বনোয়ারীর আজ, অভাব নাই!

সেদিন শেষ রাত্রে বাঁটুল আসিয়া বনোয়ারীকে ডাকিল, "বন্ধু!"

বনোয়ারী কহিল, "কেন, বন্ধু?"

বাঁটুল কহিল, "দেখ, এখানকার রাজকুমারীর, কাল, ঐ অসুখ করবে। সে অসুখ সারিবে না, তুমি যাইও না, যদি যাও ত তোমার ভাল হবে না, তা কিন্তু বলে রাখছি! রাজকুমারীকে সারাতে গেলে, তোমাকে আমি মেরে ফেলবো।"

বনোয়ারী কহিল, "আচ্ছা।"

পরদিন রাজকুমারীর রোগের কথায় দেশে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। রাজবাটী হইতে গাড়ী-পালকী আসিয়া বনোয়ারীর দ্বারে দাঁড়াইল। একবার যাইতেই হইবে! বনোয়ারী আসিল না। শেষে রাজা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত, বনোয়ারীকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে প্রস্তুত, রাজ কুমারীকে সুস্থ করিয়া দিতে হইবে! না দিলে, প্রাণদণ্ড হইবে!

বনোয়ারী দেখিল, বিপদ!

অবশেষে তার মাথায় একটা মতলব আসিল। সে কহিল, "রাজবাড়ীর যত চাকর-নফর আছে, সকলকে, ডাকুন! সকলে চীৎকার করুক, "সে মাগী এসেছে, সে মাগী এসেছে" তার পর আমি যাচ্ছি।"

দেশের লোক মিলিয়া যখন চীৎকার আরম্ভ করিল, "সে মাগী এসেছে, সে মাগী এসেছে", তখন বনোয়ারী রাজবাটীতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাকে দেখিয়াই বাঁটুল কহিল, "কি? আমার কথা না মেনে তুমি এসেছ, আবার?"

বনোয়ারী কহিল, "বন্ধু, সাধে এসেছি, তোমারি ভালর জন্য এসেছি। শুনছ না, লোকে কি বলছে, সে মাগী এসেছে।" বাঁটুলের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "এঁ্যা, বল কি?"

বনোয়ারী কহিল, "আর কি বলি! সে মাগী আবার তোমাকেই খুঁজছে।"

বাঁটুল ভয়ে কহিল "এখন, আমি কি করি, তবে?"

"তুমি? তাইত—" থমকাইয়া বনোয়ারী কহিল, "ভাল কথা, তুমি সেই গর্ত্তে চলে যাও, বরং! সেইটিই হচ্ছে, এখন, তোমার পক্ষে নিরাপদ জায়গা।"

মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, বাঁটুল ছুটিয়া গিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রাজকুমারীর রোগ সারিয়া গেল। রাজা অর্দ্ধেক রাজত্ব ও বনোয়ারীকে কথামত দিলেনই; পরে একদিন খুব ধূমধামে কাড়া-নাকাড়া-সানাই-রসুনচৌকির বাজনার মধ্যে, রাজকুমারীর সহিত বনোয়ারীর বিবাহ হইয়া গেল। দেশের লোক মনের সাধে লুচি সন্দেশ খাইয়া রাজপরিবারের জয়-জয়-কার করিতে লাগিল। শ্যামা ও বাঁটুলের কথা আর ত কিছু শুনা যায় নাই। তারা, বোধ হয়, এখনো, সেই গর্ত্তের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করিতেছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সহরের বাহিরে।

সে পথে অনেক বার গিয়াছি, আজ অনেক দিন পরে গেলাম বলিয়া আরও কত ভাল লাগিল। সহরের কোলাহল ছাড়িয়া রেলগাড়ী গুলি দুই ধারে ঘাট, মাঠ ও বৃক্ষলতা শোভিত গ্রাম্য ছবির ভিতর দিয়া ছুটিতে লাগিল। দুই পাশে পল্লীবাসীর বসত বাটী, আর সহরের অব্যবহিত পরেই সৌখিন লোকদের বড় বড় বাগানযুক্ত বাঙ্গলা বা পল্লী আবাস। তাহার পরে কেবল গরু, বাছুর, মাঠ, ঘাট, শস্যক্ষেত্র ও মরাই বিশিষ্ট দরিদ্রদের কুটীর। সে গুলি প্রকৃতই শান্তির প্রিয় নিকেতন। ছোট ছোট ছেলেগুলি প্রকৃতির দত্ত বস্ত্রে প্রকৃতি দেবীর কোলে অসঙ্কোচে ধূলাখেলা করিতেছে।

সহরের বাহিরে যত ইচ্ছা স্থানের অভাব নাই বলিয়া সকল প্রকার কারখানার এই স্থানে অধিষ্ঠান। ধোপা কাপড় কাচিতেছে, চামড়াওয়ালা চামড়া পরিষ্কার করিতেছে। এক স্থানে বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর, তাহা দরিদ্র মুসলমানদের গোরস্থান। সেখানে মাটীর ঢিপির নিম্নে পাশাপাশি অসংখ্য কবরে শব নিহিত; কবরগুলির উপরে প্রস্তরফলক বা অন্য কোন স্মৃতি চিহ্ন নাই। এই রেল লাইনটী ঠিক কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার সহিত সমরেখায় ধারে ধারে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, শেষে একটী নদীর ধারের বন্দরে ইহার সমাপ্তি। সে স্থানটী অতি মনোহর ও বিপুল বাণিজ্যের স্থান। বর্ম্মার কিরোসিন প্রভৃতি খনিজ তৈলের এই স্থানেই আড়ত।

আমি যাঁহাদের বাড়ী গেলাম, তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র বাড়ীটীর চারিদিকে গ্রাম্য ছবি। আম, কাঁটাল ও নারিকেল গাছের বাগান। সম্মুখে বেড়ার মধ্যে ফুলের ক্ষুদ্র একটী বাগান, গৃহস্থদের স্বহস্তের পরিচর্য্যা ও যত্নে যতটা সম্ভব, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে। দুপুর রৌদ্রে বাগানের ঘন গাছের ছায়ায় সুখে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। পুকুরের ধারে ঘেঁটু ফুলের সারি, ঐ ফুলটী নিরাশ প্রণয়ীর কবি কল্পনার উপমাস্থল হইয়াছে। সারা রাত্রি কাব্য রচনা করিয়া আশা ও প্রতীক্ষা করিয়াও যিনি নিরাশ হইয়াছিলেন, বোধ হয়, এমন কোনও কবিবরের কল্পনা, তবে সে ছোট ছোট ফুলগুলিও দেখিতে শুভ্র ও নিষ্পাপ বটে!

গৃহস্থেরা গাছের পাকা ফল সদ্য পাড়িয়া অতিথি সেবা করিলেন। পরিষ্কার করিয়া মাজা কাঁসার রেকাবীতে সে সুমিষ্ট ফলগুলি যেরূপ পরিপাটীরূপে সাজান ছিল, তাহা দেখিয়া মনে হইল, যিনি তাহা স্বহস্তে সাজাইয়া ছিলেন, তিনি অন্তরের কত শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দিয়া এই কাজটী করিয়াছিলেন। বড় বড় ডাবের সুমিষ্ট জল সুধার ধারার মত বোধ হইল, সকলই মধুমাখা, অমৃতময় লাগিল।

সেই খানে ব্রজবাসী এক জন ভিখারী আসিয়া গাহিতে লাগিল। তাহার এক হাতে একটী একতারা, অন্য হাতে খঞ্জনী, তাহাই বাজাইয়া গান করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। ভিক্ষা করিবার উদ্দেশে নয়, কিন্তু মনের পূর্ণ আবেগে নাচিতে ও গাহিতে লাগিল, মুখে গায়, "কহ নারী, নাম তুমারী" আর তানপুরা ও খঞ্জনী বাজাইয়া ভাবে তন্ময় হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্রজ বুলিতে

আত্মহারা গানগুলি কি মধুরই শোনায়! এমন কোন দেশের কোন ভাষাতে নাই। গানের সঙ্গে নাচের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে একটী আর একটীকে আরও মধুর করে। যেমন হৃদয় ঠিক তালে তালে সঙ্কুচিত হয়, তেমনই অন্য সাধারণ মাংসপেশীও তালে তালে নাচিয়া থাকে। আমাদের হস্ত, পদ ও দেহের অন্যান্য মাংসপেশীগুলি তালে তালে নাচিলে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়।

পরে কাজ সারিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেলাম। সে স্থানে পূর্ব্বে মহা সমৃদ্ধিশালী জনতাপূর্ণ হাট, বাজার ও লোকের বসতি ছিল, এখন বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী সরকারের সাহায্যে তাহাদের সেই, পৈতৃক ভিটা অল্প মুল্যে কিনিয়া লইয়া কারখানা করিতেছে, তাহাতে কত লোক চক্ষুর জল ফেলিয়া নিরাশ্রয় হইয়াছে, তিন হাজার টাকার মাল তিন শত টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

নদীর ধারে সে নুতন বাঁধান উচ্চ পথটী অতীব মনোহর। বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত বায়ু অবাধ গতিতে তথায় সর্ব্বদা বহিতেছে। সে নির্ম্মল বায়ু সেবনে নগরবাসীর প্রাণে বলের সঞ্চার হয়। সে দিন শুক্ল তৃতীয়ার রজনী, কাস্তের মত খণ্ড চন্দ্র সন্ধ্যার আকাশে উঠিয়া ক্ষীণ আলোক দিতেছিল। আকাশে অগণ্য তারা, চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোক চঞ্চল জলে প্রতিফলিত হইয়া শত খণ্ডে বিভক্ত হইতেছিল। নদী স্রোতের অবিরাম কুল কুল ধ্বনি, চারিদিকে দুরে দুরে গ্রামগুলি অস্পষ্ট আলোকে দেখা যাইতেছিল, গামের বৃক্ষে বৃক্ষে অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছিল।

জেটির উপর গিয়া বসিলাম। ব্রাইটনের সমুদ্রমধ্যস্থিত সুন্দর জেটির কথা মনে হইতে লাগিল, যে দেশের লোকে সে সকল বেড়াইবার স্থানে গিয়া মনে কত আনন্দ লাভ করে, আজ আমার মনে কিন্তু সে ভাব তত আসিল না।

বহু পূর্ব্বে অন্য অবস্থায় অন্য ভাবে দেখিলে কত অসীম আনন্দ হইত, এখন কে জানে কেন মন ভারাক্রান্ত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারিলামনা, কি গভীর অভাবে চারিদিক আচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। উপরে উন্মুক্ত অসীম আকাশ, তারকা খচিত গম্ভীর দর্শন নভোমণ্ডল আমার বড়ই ভাল লাগে, প্রতিদিন গভীর রাত্রে উঠিয়া সেই দৃশ্য আমি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া দেখি, একবার সেদিকে চাহিলে প্রাণ উদাসীন হইয়া কোন্ রাজ্যে চলিয়া যায়, চিরদিনের সংকীর্ণতা নিমেষে কোথায় দুর হয়।

যতক্ষণ সেখানে ছিলাম সংসারের অন্য কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম মনে হইতেছিল আর, নিজ স্থানে ফিরিব না। আমাদের ভাববহুল কোমল মনে সংসারের ঘর্ষণ অল্পদিনে এতই বলবান হয়, যে আমাদের মধ্যে মধ্যে কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়ার ব্যবস্থা বড়ই ভাল, নতুবা চারিদিকে সংঘর্ষণে শরীর মনের বড়ই অনিষ্ট হয় ও মনের সঙ্কীর্ণতা জন্মে।

ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস।

একটি দুঃখী বালক, অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছিল। সে পিতামাতার এক মাত্র পুত্র। তদীয় ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন, তাহার এরূপ কোনও আত্মীয় ছিলেন না। আহার প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে, তাহার ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আমি প্রাণান্তেও পরের গলগ্রহ হইব না; পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা, অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, যাহা পাইব, তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিব।

এক দিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তির একটি অল্প বয়স্ক পরিচারকের আবশ্যক হইয়াছে; তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সে ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনকার কি একটি অল্প বয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে; যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আমায় নিযুক্ত করুন।" সে ব্যক্তি কহিলেন, "এক্ষণে আমার

ওরূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই।" বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোথাও কর্ম্ম জুটিতেছে না।" তখন বালক কহিল, "না মহাশয়, আমি অনেক স্থানে চেষ্টা দেখিতেছি, কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছেনা; একটি স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই জন্যে আপনকার নিকট আসিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, তিনি, সবিশেষ না জানিয়াই, ওরূপ বলিয়া ছিলেন।"

বালকের ভাব দর্শনে, তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, "তুমি হতোৎসাহ হইও না।" এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্ল চিত্তে কহিল, "না মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি, একদিনের জন্যেও, আমি হতোৎসাহ হই নাই। আমার সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি, অচিরে কোনও স্থলে নিযুক্ত হইয়া, আপন ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থলে, অবশ্যই, আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।"

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া বালকের এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "অহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব; আমার তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে সে সকল কর্ম্ম করিতে হইবেক, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, কর্ম্ম করিতে লাগিল। এক দিন, এক বেলার জন্যেও, আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদ্দর্শনে ডাক্তার, যারপরনাই, প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিশুর বাণিজ্য।

আমার খোকার নৌকাখানির দাম সে লক্ষ টাকা!
ঝিনুক নায়ে পাল তোলা তার প্রজাপতির পাখা;
চাঁপার কলির দাঁড় ক'খানি, অপরাজিতার হাল,
মাস্তলটি সদ্য গড়া পদ্ম ফুলের নাল!
কোথায় যাবে সোণার খোকা? বাণিজ্যি করতে,
দেশ বিদেশের মুক্তো এলে বেসাতি ভরতে।

আমার খুকীর গাড়ী খানির দাম সে লক্ষ টাকা!
ইঁদুর ছানার সাদা ঘুড়ি, কদম ফুলের চাকা;
গাঁদাফুলের গদিটি তার, ধুতরো ফুলের ছই,
ঝুম্‌কো ফুলের ঝালর ঝোলে ছইয়ের পরে ওই!
কোথায় যাবে সোণার খুকী? বানিজ্যি করতে,
দেশ বিদেশের রত্ন এলে পসরা ভারতে।

যারে সোণার খোকাখুকী, বাজার লুটি আনি'
রাজার মতন সাজা তোদের আপন গৃহ খানি।
দুহাত দিয়ে বিলিয়ে দিলেও তোদের আনা ধন,
লক্ষ গুণে বাড়্‌বে ছাড়া কম্‌বে না কখন।
জ্ঞানই তোদের মুক্তোমাণিক, ধর্ম্ম তোদের হীরে,
সকল রতন চেয়ে যতন করিস্ এ দুটীরে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি, এ।

কক্সবাজার।

অনেক দিন হইতে স্থির করিয়াছিলাম, যে কক্সবাজার ভ্রমণ করিতে যাইব। হঠাৎ এক দিন সে আশা পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিল; আবশ্যক মত জিনিষ পত্র লইয়া বুধবার দিন প্রাতে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় বাসা হইতে অশ্বযানে যাত্রা করিলাম। অশ্বচালকের কশাঘাতে অশ্বদ্বয় যানসহ পবন বেগে ছুটিতে লাগিল।

এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া দেখি, ষ্টীমার ছাড়িবার আরও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সুবিধা মত টিকেট কিনিয়া জিনিষ পত্র সহ ষ্টীমারে উঠিয়া গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা আটটার সময় "নীলা" নামক ষ্টীমার প্রায় এক শত যাত্রী লইয়া কর্ণফুলী নদীতে চলিতে লাগিল এবং প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আমাদিগকে লইয়া বঙ্গোপসাগরে পৌঁছিল। বঙ্গোপ সাগরের নাম এত দিন কেবল ভূগোলেই পড়িয়াছিলাম; কখনও দেখি নাই। এখন ভূগোলে লিখিত সেই বিশাল সমুদ্র দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল; সেকি অপূর্ব্ব শোভা! যাঁহারা কখনও সমুদ্র দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে পারেন। উত্তাল তরঙ্গমালা, সেই নীল ফেণিল আকুল জলোচ্ছ্বাস, দেখিতে কি সুন্দর! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া আমাদের ষ্টীমারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বর্ষাকালে সমুদ্রের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হয়। তখন ছোট ষ্টীমারের সাধ্য কি, যে সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করে; পাহাড়ের সমান উচ্চ এক একটী ঢেউ আসিয়া ষ্টীমারটীকে যাত্রিসহ গ্রাস করিতে চেষ্টা করে। বড় ষ্টীমার ব্যতীত তখন সমুদ্রে যাওয়া অসম্ভব। সমুদ্রে এক প্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি দেখিতে ঠিক্ বড় বড় কপোতের ন্যায়। ইহাকে এদেশে 'গাঙ্গ কপোত' বলে, ইংরাজীতে (sea-gull) বলে। শুনিলাম, কোন ষ্টীমার দিকহারা হইলে, ইহারা তাহাকে দিক্ প্রদর্শনে সহায়তা করে; এই জন্য ষ্টীমারের লোকেরা ইহাদিগকে ভক্তি করে, এবং ইহাদের কোনও অনিষ্ট করে না। আমরা সমুদ্রের শোভা দেখিতে দেখিতে, এবং ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিতে করিতে বেলা চারিটার সময়, "বাঘখালী" নামক একটী নদীর মোহনায় আসিয়া পড়িলাম। এখানে আমাদের ষ্টীমার নঙ্গর করিল; এখান হইতে আমাদের গন্তব্য স্থান তিন মাইল। ষ্টীমার বর্ষাকাল ছাড়া এই নদীতে প্রবেশ করে না। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিন ষ্টীমার এদিকে যাতায়াত করে, এবং এই স্থান হইয়া আকিয়াবের অন্তর্গত, "মংগ্‌ডু" গিয়া পরদিন প্রাতে আবার কক্স্‌ বাজার হইয়া যাত্রিসহ চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসে। যা হোক আমি 'বাঘ্‌খালীর" মুখ হইতে, 'সাম্পান' নামক এক প্রকার নৌকা ভাড়া করিয়া কক্স্‌বাজার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। 'সাম্পান' দেখিতে ঠিক বড় মোচার খোলার মত। ইহা অতি লঘু কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত এবং ওজনেও নৌকা অপেক্ষা লঘু; অল্প জলেও অনায়াসে যাইতে পারে এবং সহজে উল্টায় না। ইহা এক সঙ্গে আট দশ জন লোক বহন করিতে পারে, এক জন লোক দুইটা দাঁড় বাহিয়া চালায়; ইহাতে পাল খাটাইবারও বন্দোবস্ত আছে। ঠিক পাঁচটার সময় আমি কক্স্‌বাজার জেটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম; মাঝিকে আমাকে এখানকার সব-রেজিষ্টার বাবুর বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে বলিলাম, সে আমাকে জিনিস পত্র সহ সেখানে উপস্থিত করিল। বলা বাহুল্য, উক্ত সব-রেজিষ্টার বাবুর সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল। এইজন্য সেখানে উঠিলাম; অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সহিত দেখা হইল। ইতিমধ্যে, আর এক আগন্তুক আসিয়া পৌঁছিলেন; ইনি অত্রত্য স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। শুনিলাম, ইনি আমার সহযাত্রী ছিলেন; আমরা দুই জনেই তাঁহার অতিথি হইলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া, আমরা তিন জনে ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। কক্স্‌বাজার দুইদিকে সমুদ্র, একদিকে নদী এবং অন্যদিকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। ইহা চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ক্যাপ্টেন্ কক্স নামে এক সাহেব এইখানে বাজার বসাইয়াছিলেন, বলিয়া, ইহার নাম কক্সবাজার হইয়াছে। ইহার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ জানিবার সুযোগ ও সময় পাওয়া যায় নাই। ইহা এখন চট্টগ্রামের সব-ডিভিসান্ (Sub-Divison) রূপে পরিণত হইয়াছে।

কক্স্‌বাজারের লোক সংখ্যা ও মন্দ নহে। এক তৃতীয়াংশ কেবল 'মগ'; অবশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান, এখানকার বাঙ্গালীরা চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কলিকাতার অধিবাসী। ইঁহারা কর্ম্মচারী, ইঁহাদের

সংখ্যাও অতি অল্প। কয়েকটী বাঙ্গালী দোকানদারও আছে। এখনকার সব-ডিভিসানেল এবং মুন্সেফী আদালত ব্যতীত আর সব বাঁশের ঘর; কেবল উক্ত আদালত দুইটীই পাকা। দুইটী ডাক বাঙ্গালাও এখানে আছে। একটী সরকারী, এবং অপরটী ষ্টীমার কোম্পানীর। এখানে এক জন দেশী ফিরিঙ্গী সব-ডিবিসেনেল কর্ম্মচারী এবং একজন ইংরাজ সল্ট-ইনিস্পেক্টরআছেন; এতদ্ব্যতীত সব-ডিবিসনের উপযোগী অপরাপর কর্ম্মচারীরাও অবস্থিতি করেন। এইখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী জেলখানা এবং স্থানীয় ছাত্রদের পড়িবার জন্য একটী মধ্য ইংরেজী স্কুলও আছে। চারিটার সময় আমরা সমুদ্র দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমাদের বাসা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী; সুতরাং যাইতে বেশী দেরী হইলনা।

সমুদ্রের কি সুন্দর শোভা! একদিকে ধূ ধূ বালিচর, আর একদিকে সীমাহীন অনন্ত জলরাশি। এই স্থানটী এমন সুন্দর, যে পাষণ্ডও এইস্থানে আসিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বর যে কতরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত, তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। সমুদ্রতীরে সুন্দর সুন্দর ঝিনুক, কড়ি ও শামুকাদি পাওয়া যায়। আমি কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া লইলাম। অতঃপর আমরা বালীর উপর একস্থানে বসিয়া একদৃষ্টে সমুদ্র দেখিতে এবং সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে, সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিল; বোধ হইতে লাগিল, যেন সমুদ্রের উপর ভাসিতেছে। বাস্তবিক, সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত অতি চমৎকার দৃশ্য। সূর্য্য অস্তগমনের অল্প পরে অন্ধকার হইয়া আসিল; আমরাও বাসায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি, কএক জন ভদ্রলোক উপস্থিত। তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। পরে আহারাদি করিয়া নিদ্রা গেলাম। হঠাৎ এক ভীষণ শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া বোধ করিলাম, যেন ভয়ঙ্কর ঝড় হইতেছে; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে, আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। ইহা ঝড় নহে; ইহা অদূরবর্ত্তী সমুদ্রের গর্জ্জন মাত্র, এই গর্জ্জন অতি ভীষণ। বোধ হইতেছিল, এইবার বুঝি সমস্ত কক্সবাজার ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং আমরাও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হই। এই গর্জ্জন দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে, দিবসের কোলাহলে তত শোনা যায় না। কিন্তু রাত্রে অতি স্পষ্ট শুনা যায়; পর দিন আমরা তিন জনে, স্থানীয় হাট বাজার দেখিতে চলিলাম। এই খানে সপ্তাহে তিনবার হাট বসে; আজকার হাটটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। হাটের ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকাংশই মগ রমণী; এখানে নানা রকম তরকারী বিক্রয় হয়, এবং এমন কি কাঠ পিপীলিকার ডিম্বও বিক্রয় হয়; ইহা মগদের অতি প্রিয় খাদ্য; সুতরাং তাহারা অতি আগ্রহ করিয়া কিনিয়া থাকে। অতঃপর মাছের বাজারে গেলাম, নানা রকম মাছে বাজার পরিপূর্ণ দেখিলাম। ভেঙের মত এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য দেখিলাম; সে গুলি মগ ছাড়া আরও কেহই খায় না। এই বাজারে "নাপ্পি" নামক এক প্রকার পচা খাদ্য বিক্রয় হয়; সেই "নাপ্পি" মাছ ও মাংস পচাইয়া গুঁড়া করিয়া গোল গোল "রসগোল্লার" আকারে বিক্রয় করে। ইহার গন্ধ অতীব তীব্র; প্রায় এক মাইল হইতেই ইহার উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়; এবং উহাতে আমাদের অন্ন প্রাশনের ভাতও বাহির হইবার উপক্রম হয়; অথচ যাহারা খায় তাহাদের তাহাতে কোনও প্রকার অসুখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং রসাস্বাদনের স্পৃহাও বলবতী হইয়া উঠে। এই হাটে রাঁধা ভাত তরকারী ও তাহার ক্রেতার অসম্ভাব নাই; ফলতঃ এই সব আয়োজন কেবল মগদেরই জন্য। বৈকালে চারটার সময় মগ পল্লী দেখিতে বহির্গত হইলাম। এই পল্লীতে কেবল মগদের অধিবাস; দুই ধারে সারি সারি কেবল মগেরই বাসা। মগদের পরিচ্ছদ পরণে এক লুঙ্গী, গায়ে কোটের ফেশনে এক "কুর্ত্তী" মাথায় রেশমের বন্ধনী, রমণীদের পরিচ্ছদও প্রায় এইরূপ; কেবল মাথা

হইতে কোমর পর্য্যন্ত বড় বড় গামছা দ্বারা আবৃত। এই সকল পরিচ্ছদ মগ রমণীরা নিজ গৃহে প্রস্তুত করে; এখানকার মগ পুরুষেরা বড় অলস ও অপদার্থ; মগ রমণীরা কিন্তু পরিশ্রমশালিনী, ভোর চারটা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত হাট, বাজার, রন্ধন, বয়ন, সব কার্য্যই এই রমণীরা করে। বস্তুতঃ তাহারাই পুরুষদের একরূপ ভরণ পোষণ করিয়া থাকে; এখানে স্থানে স্থানে উহাদের "আরাম খানা" অর্থাৎ আমাদের ভাষায় "অলস খানা" আছে। রাজ্যের যত আফিঙখোর এবং অলসদের ইহাই প্রধান আড্ডা। ইহারা অত্যন্ত চুরট প্রিয়।

মগেরা অত্যন্ত বিলাসী; মূল্যবান রেশমী ও পশমী বস্ত্র ইহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য; ইহাদের অধিকাংশই ধনশালী সদাগর। মগ পল্লী দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, আমরাও বাসায় ফিরিলাম। পর দিন প্রাতে আমরা আবার মগদের "বৌদ্ধ মন্দির" দেখিতে গেলাম, এই গৃহগুলি দেখিতে সুন্দর; ইহা বড় বড় কাঠের উচ্চ মাচার উপরে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ঘর; যাঁহারা কখনও রেঙ্গুনে গিয়াছেন, কিম্বা রেঙ্গুনের (Pagoda) এর ছবি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। এই মন্দিরগুলি ঠিক সেই প্রকারে নির্ম্মিত। এখানে এক জন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক এবং দুই তিন জন করিয়া তাঁহার শিষ্য থাকেন। পূজা অর্চ্চনা এবং মগদের ছেলে পড়ানই তাঁহাদের একমাত্র কাজ; এই যাজকেরা অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। এই সকল মন্দির দেখা শেষ করিয়া এবং কয়েকটী সুন্দর সুন্দর পাহাড়ের উপর উঠিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। বৈকালে আবার সমুদ্র এবং সূর্য্যাস্ত দেখিতে গেলাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, যে কক্সবাজার হইতে হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ স্থান শ্রীশ্রীআদিনাথ ধাম, মাত্র ছয় মাইল ব্যবধান।

শ্রীনরেন্দ্রভূষণ দত্ত।

"এলিফাণ্টা গুহা।"

পাঠক পাঠিকাগণ! আজ আমি তোমাদিগকে এলিফাণ্টা গুহার বিষয় কিছু বলিব। বম্বে নগরী হইতে সাত মাইল দূরে এলিফাণ্টা দ্বীপস্থ একটী মনোহর পর্ব্বত শিখরে ইহা অবস্থিত। ষ্টীমারে অথবা নৌকাতে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়। নৌকাতে অল্পাধিক কষ্ট হয়, কিন্তু ষ্টীমারে কোন কষ্ট নাই।

পূর্ব্বে এই দ্বীপে একটী বৃহৎ প্রস্তর খোদিত হস্তী ছিল। সেই জন্য পর্ত্তুগাল বাসীরা ইহাকে এলিফাণ্টা দ্বীপ নামে অভিহিত করে। এই প্রস্তর খোদিত হস্তীটীকে এখন Victoria Garden এ রাখা হইয়াছে। প্রাচীনকালে এই পর্ব্বতের নাম ছিল ঝারাপুরী। এই দ্বীপটীতে এখন অতি অল্প লোকেরই বাস। এক জন ইংরাজ এখন এই দ্বীপটীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। এই দ্বীপটীতে প্রথমে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ আসিয়া বিহার নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখন এখানেও বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সর্ব্বত্র হিন্দু প্রভাব দৃষ্ট হয়। যে সকল মূর্ত্তি বৌদ্ধগণ প্রথমে খোদিত করেন, সেই সকল মূর্ত্তি পরবর্ত্তীকালে হিন্দুগণ হিন্দু মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই রূপ পরিবর্ত্তন কেবল এখানে নহে, অন্যান্য অনেক গুহাপুঞ্জেও দৃষ্ট হয়।

আরব্য মহাসাগরের সুপ্রশস্ত বক্ষে এলিফাণ্টা একটী রমণীয় দ্বীপ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। দ্বীপটী ঘন বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা আচ্ছাদিত। মৃদু মন্দ বাতাস দিবারাত্র বহিতেছে এবং সেই মৃদু পবন স্পর্শে ইহার বক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। অসংখ্য বিহঙ্গ বিচিত্র কলরবে স্থানটী পরিপূর্ণ তুলিয়াছে। অদূরে আরব্য সাগর একখানি শুভ্র বস্ত্রের ন্যায় প্রসারিত। দূরে দুই একটী ক্ষুদ্র দ্বীপও দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত থাকে।

এলিফাণ্টা গুহা দুইটী বৃহৎ হলে বা দালানে বিভক্ত। প্রথম দালানটীর আয়তন নব্বই ফিট। ইহা আবার

লিঙ্গ মন্দির।

চারটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দালানে বিভক্ত। প্রত্যেক দালানটী প্রস্থে ১৬ ফিট এবং উচ্চতায় ৫৪ ফিট। বড় দালান ছাব্বিশটী স্তম্ভ দ্বারা রক্ষিত। এখন চারিটী স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই হলের ছাদ ও গৃহতল বন্ধুর, এই নিমিত্ত ইহাদের উচ্চতা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। প্রায় ১৬ হইতে ১৭ ফিট হইবে। এই স্তম্ভগুলি যেমন সুদৃঢ় ও বৃহৎ, সেইরূপ পরিপাট্য সহকারে নির্ম্মিত। অন্যান্য গুহাপুঞ্জের ন্যায় এগুহাটীরও সম্মুখে দ্বার ও অপর তিন দিক বন্ধ। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ত্রিমস্তক শিবের মূর্ত্তি। মধ্যম মস্তক ব্রহ্মার প্রতিরূপ। ইহাতে স্থির ও কোমলভাব উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তটী এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বাম হস্তে একটী লেবুর ডাল রহিয়াছে। বাম দিকের মস্তকটী শিবের রুদ্রমূর্ত্তি। ইহা ভীষণ ও তেজদীপ্ত। একটী অজগর সর্প উহার হস্তদ্বয় বেষ্টনপূর্ব্বক শিবের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। শিব তাহা দেখিয়া হাসিতেছেন। তৃতীয় মস্তকটী শিবের বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটীতে শান্তিভাব উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিষ্ণুর হস্তে বৃক্ষের শাখা রহিয়াছে। এখানে অন্যান্য প্রকারও মূর্ত্তি রহিয়াছে। কোন প্রহরী এক দৈত্যের দেহে হেলান দিয়া দণ্ডায়মান এইরূপ।

বামপার্শ্বের গৃহে একটী বৃহৎ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটী অর্দ্ধনারীশ্বরের প্রতিকৃতি। অর্থাৎ ভগবান পুং ও স্ত্রীরূপে প্রকাশমান। এই মূর্ত্তি প্রায় ১৭ ফিট উচ্চ। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে ব্রহ্মা বসিয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মার দুইটী মুখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিকটে অপর একটী মূর্ত্তিতে ইন্দ্রদেব উপবিষ্ট ও তাঁহার হস্তে একটী বজ্র রহিয়াছে।

দক্ষিণ পার্শ্বের হলে শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহ খোদিত হইয়াছে। শিবের মস্তকের উপর ত্রিমস্তক এক রমণী দণ্ডায়মানা। এই তিনটী মস্তক গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি। এই স্থানে আর একটী মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। শিব যখন শুনিলেন, যে যজ্ঞে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই, তখন তিনি অতিশয় কুপিত হন। এই মূর্ত্তি তাহাই জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে দ্বাদশ মস্তক বিশিষ্ট মূর্ত্তিটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাবণের করলা পর্ব্বত উঠাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা ইহাতে খোদিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দুই পার্শ্বে বহু পুরুষ ও রমণীমূর্ত্তি পূর্ণাকারে খোদিত হইয়াছে। এলিফান্টা গুহার এক পার্শ্বে একটী ঝরণা রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ঝরণাটী জলপূর্ণ। জল অতিশয় সুস্বাদু ও শীতল। দর্শকগণ এখানে আসিয়া জলপান করেন, কারণ এইরূপ ধারণা, যে এ ঝরণার জলপান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

এলিফান্টা গুহার কীর্ত্তিগরিমা অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এই স্থান সম্ভ্রমে, বিদ্যা ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত। সমুদ্রস্থিত এই পবিত্র দ্বীপে কত মহা সাধু ও যোগী কত দূর দেশ হইতে আগমন করিয়া এখানে ঈশ্বর চিন্তায় কালযাপন করিতেন। তাঁহারা মূর্খকে জ্ঞান বিতরণ করিতেন, পাপীকে ঈশ্বর প্রেমে দীক্ষিত করিতেন, ভ্রান্তকে ন্যায় ও সৎপথে চলিতে পরামর্শ দিতেন। এই যোগীজনের নিভৃত যোগাশ্রম দর্শন করিবার জন্য
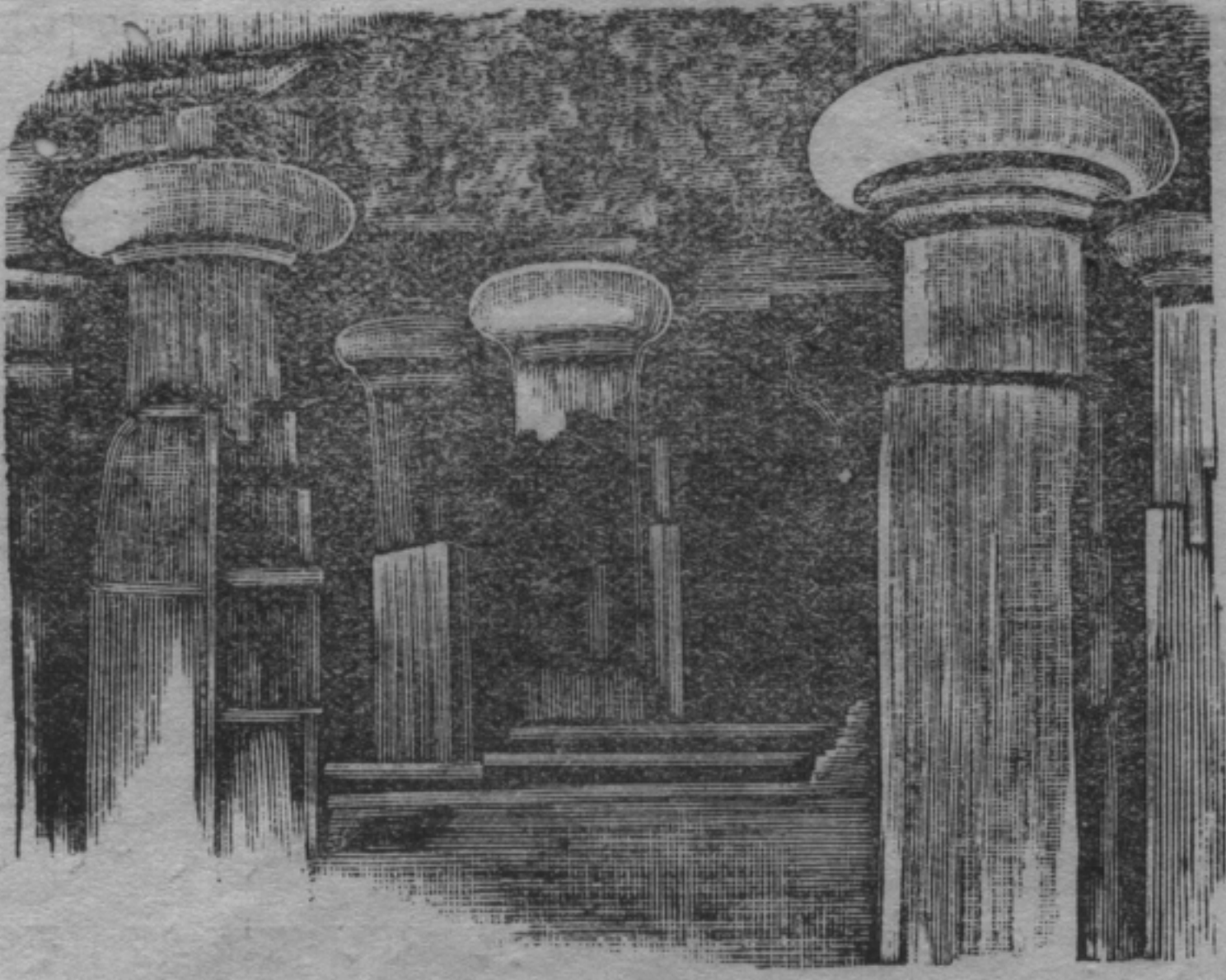
এলিফণ্টো গুহার মধ্যভাগ।

ভারতবর্ষের সকল দেশের লোক এস্থলে আগমন করিয়া থাকেন। যিনি এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সৌন্দর্য্য-স্মৃতি হৃদয় হইতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ হয়, আর এই অনন্তের সৃষ্টিকর্ত্তা মহান জগদীশ্বরের সত্তা হৃদয়ে উদিত হয়।

এই সকল গুহা সন্দর্শন করিতে করিতে কত পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে ও হৃদয় কেমন এক বিষাদে পূর্ণ হয়। তখন মনে পড়ে, পুরাকালের যোগীদিগের কঠোর সাধনা ও তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব ত্যাগ। কত মহাযোগী পৃথিবীর মায়াজাল কাটাইবার ও মোক্ষ পাইবার জন্য কত কঠোর সাধনা করিয়াছেন। উচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ কর্ত্তন করিয়া, বহু স্তম্ভযুক্ত এক একটী গুহা খোদিত করিয়া কত বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ধন্য সেই সকল যোগী তাঁহাদের দেবতুল্য চরিত্রের, অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরও মহৎ ত্যাগের বিষয় ভাবিলেই হৃদয় বিস্ময় শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ধন্য তাঁহারা যাহাদের ভক্তি, প্রেম, ও সাধন এই স্থানটীকে অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু।
গ্রাণ্ট রোড, বম্বে।

এক পোষা পাখীর গল্প।

(জাপানী)

এক বুড়ির এক পাখী ছিল। পাখীটা এমনি পোষা যে তাকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিলেও সে উড়ে পালাত না। বুড়ি তাকে দিন রাত খাঁচা বন্ধ না রেখে সকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলা একবার করে ছেড়ে দিত। সে উড়ে গিয়ে বন থেকে ফল খেয়ে বুড়ির জন্য ঠোঁটে করে একটি ফল নিয়ে ফিরে আসত। বুড়ি রাতের বেলা কেবল তাকে খাঁচা বন্ধ করে রেখে দিত।

সেই পাড়ায় এক ধোপানী ছিল। সে ভারি রাগী। এক দিন সে কাপড় কাচবার ক্ষার শুকাতে দিয়েছে, পাখীটা কোথা থেকে উড়ে এসে সেই ক্ষার টুপ্ টুপ্ করে খেতে আরম্ভ করলে। ধোপানী ঘরের ভিতর ছিল, সে বাইরে এসে দেখে এই ব্যাপার! চটে আগুন। খপ্ করে গিয়ে পাখীর গলাটা ধরে একটা চক্‌চকে ছুরি নিয়ে ঠোঁটটা দিলে কেটে!

পাখীর মনে ভারি দুঃখ হল। তার ঠোঁট কেটে দিলে? মনের দুঃখে সে বনের মধ্যে উড়ে চলে গেল, বুড়ির কাছে আর ফিরল না।

বুড়ি বাড়ীতে বসে বসে ভাবছে এই পাখী এল! এই পাখী এল! পাখী কিন্তু আর আসে না। সন্ধ্যা গিয়ে রাত হল, বুড়ি ভাবলে কি হল পাখী কেন আসে না? খুট্ করে একটু শব্দ হয়, বুড়ি মনে করে ঐ এল! মুখে বলে, "কৈরে এলি?" হুস্ করে একটু বাতাস বয়ে গেল বুড়ি ভাবলে, এইবার ঠিক এসেছে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দেখে কই পাখী! এমনি করে সমস্ত রাত ধরে বুড়ি ঘর আর বার করলে চোখে ঘুম নেই। সকাল হয়ে এল, এখনও পাখীর দেখা নেই। বুড়ি বুড়োকে ডেকে বল্লে, "চলো গো, একবার বনের মধ্যে পাখীটার খোঁজ করি!

বুড়ো ভাল করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, লাঠির উপর ভর দিয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বেরুল। বুড়ি তার পিছু পিছু চল্লো। গ্রাম ছাড়িয়ে

মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে নদী, নদী পেরিয়ে বন। তারা দুজনে হেঁটে হেঁটে সেই বনের মধ্যে এসে পৌঁছিল।

বনের মধ্যে কত বড় বড় গাছ, গাছের আগ ডালে পাখীর কত বাসা। কোন্ খোপে তাদের পাখীটি লুকিয়ে আছে কে জানে? বনের মধ্যে যাকে দেখতে পেলে তাকেই বুড়ি জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁগা বলতে পার আমার পাখীটা এ দিকে এসেছে।" সকলে বল্লে, "দেখিনি বাপু।"

বুড়ো বুড়ি খুঁজে খুঁজে হায়রান হল। পাখীর কোন খপর পাওয়া গেল না। দুজনে তখন এক গাছ তলায় গিয়ে বসল। সেই গাছের মাথায় পাখীদের একটা প্রকাণ্ড বাসা ছিল, সে যেন একখানা বাড়ি! আর ভিতর হাজার হাজার পাখী কল্‌কল্ করছে। বুড়ো বুড়িকে বল্লে, "এত বড় প্রকাণ্ড বন লাখো লাখো পাখী এর ভিতর রয়েছে, তারি মধ্যে থেকে তোমার পাখীটি খুজে বার করা কখনো যায়? চল ঘরে ফিরি। বুড়ি বল্লে, "পাখী না নিয়ে ফিরচি না!" বুড়ো তখন কি করে? সে বড় মুস্কিলে প'ড়ল। বুড়িকে বল্লে, "তুমি তবে বসো আমি একটু খুঁজে আসি!"

এই বলে বুড়ো লাঠি নিয়ে সেখান থেকে উঠলো। মনে ভাবলে, এ মনের মাঝে এত তো পাখী, আর একটা পাখী কোন রকম করে ধরে বুড়িকে গিয়ে বলবো এই নাও তোমার পাখী! বুড়ি চোখে তো ভালো দেখে না, সে নিশ্চয় ঠাহর করতে পারিবে না সেটা সত্যিই তার পাখী কি, না।

এক জায়গায় কতক গুলো ছানা পাখী মাটি থেকে খুঁটে কি খাচ্ছিল। বুড়ো খপ্ করে গিয়ে তাদের একটাকে ধরে ফেল্লে। অন্য পাখীরা উড়ে গেল, একটা পাখী কেবল বুড়োর হাতের ভিতর ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাতে লাগলো।

সেই ছানা পাখীর মা সে সেই সময় সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল বাচ্ছাকে মানুষের মুঠোর মধ্যে থেকে চেঁচাচ্ছে দেখে সে আর থাকতে পারলে না। বুড়োর কাছে তাড়াতাড়ি উড়ে এসে বল্লে "বাছাকে আমার ছেড়ে দাও যা চাইবে তাই দেবো।"

বুড়ো বল্লে হ্যাঁ। আচ্ছা, আমাদের পোষা পাখীর বাসাটা দেখিয়ে দাও দি কি?"

পাখী বল্লে—"চলো।"

বুড়ো পথের মধ্যে থেকে বুড়িকে ডেকে নিয়ে বল্লে, "চলো, পাখীর খোঁজ পেয়েছি!"

বুড়ো বুড়ি চল্লো। পাখী পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। যেতে যেতে যেতে যেতে তারা শেষে তাদের পাখীর বাসায় এসে হাজির হল।

বুড়ো বুড়ি দেখলে বাসাটা বেশ—ঝর্‌ঝর্ তক্‌তক্ করচে! কত রকম লতা, তাতে কত রং এর ফুল ফুটে আছে, তাই দিয়ে বাসাটি বাঁধা! সবুজ পাতায় ছাউনি! বুড়ো বুড়িকে পাখীটার আনন্দ ধরে না। বন থেকে ঠোঁটে করে বয়ে এক রাশ মিষ্টি ফল এনে দিলে, ডানায় করে জল আন্‌লে। সেই ফল আর জল খেয়ে, বুড়ো বুড়ির প্রাণ ঠাণ্ডা হল! পাখীর ছেলেপুলে নাতি নাত্নিরা বুড়ো বুড়িকে ফিরে কেউ নাচতে লাগলো কেউ গাইতে লাগলো। তাদের সে আহ্লাদ দেখে কে! বুড়ি তাদের সকলকে আদর করে ধরে চুমু খেলে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে। তারা আনন্দে ডানা গুলো ঝুট্‌পুট্ করে নাড়তে লাগলো।

বুড়ি পাখীকে বল্লে—"চল এইবার আমাদের সঙ্গে।"

পাখী বল্লে—"আর না মা! মানুষের দেশে আর যাবো না। একটা সামান্য জিনিসের জন্যে তারা গলা কাটে!"

বুড়ি তো সব কথা জানে না। সে বল্লে "কি হয়েছে? কি হয়েছে?" পাখী তাকে তখন সব খুলে বল্লে। বুড়ি তাই শুনে বল্লে "ওমা! এমন কথা তাতো জানতুম না। ধোপানীর এই কাজ! তার জন্যে আমরা গিয়ে এত করি সে তোমার এই দশা করেচে! না বাছা তুমি এই খানে বেশ আছ। আমি আর তোমাকে নিয়ে যাবো না কোন দিন কে তোমায় কি ভালমন্দ করবে!"

তার পর বুড়ি বল্লে "এখন তবে আসি!"

পাখী বল্লে "সে কি কথা, এরি মধ্যে যাবে? আর একটু বোসো জিরিয়ে নাও!"

তার পর বুড়ো বুড়ি যখন বাড়ি ফেরবার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখন পাখী বল্লে শুধু হাতে তোমাদের ফিরতে দেবো না। আমার বাড়ি যখন পায়ের ধুলো দিলে তখন আমার কাছ থেকে কিছু প্রণামী ত নিতে হবে।"

এই বলে পাখী বুড়ো বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে অজগর বনের মধ্যে প্রবেশ করলে।

বন ভারি অন্ধকার, সূর্য্যের আলো পর্য্যন্ত তার ভিতর যায় না, দিনের বেলা রাতের মত বোধ হয়। সে বনের মধ্যে জন মানুষ নেই, পশু পাখী, সাপখোপ কোনো জানোয়ারের চিহ্ন নেই। সূর্য্যের আলো যায়না বাতাস বয় না, খুট্ করে শব্দটি পর্য্যন্ত উঠে না নিস্তব্ধ! সারি সারি ঝাঁকড়া গাছ, যেন বড় বড় দৈত্য পাথরের মত অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটু কাঁপে না, হেলে না, নড়ে না!

সেই বনের মধ্যে গাছ পালার ভিতর পাথরে গড়া একটা প্রকাণ্ড রাজবাড়ী। বাড়িটা ভেঙে পড়েছে। পাখীটা তারই মধ্যে বুড়ো বুড়িকে নিয়ে গেল। একটা ঘরের ভিতর ঘরঠাসা তোরঙ্গ নানা রকমের! কোনোটা চারকোণা, কোনটা আটকোনা, কোনটা পঁচিশকোণা! কোনটা গোল, কোনটা চৌকা; কোনটা চ্যাপ্টা। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। কোনটা লোহার, কোনটা কাঠের। কোনটা বাঁশের, কোনটা বেতের। কোনটা লাল, কোনটা নীল!

পাখী বল্লে "যেটা খুসি নাও।"

বুড়ো বুড়ি বল্লে, "আমরা বুড়ো মানুষ, বড় বোঝা ভারি বোঝা বইতে পারবো না।" এই বলে দুজনে দুটো ছোট বেতের বাক্স পিঠে করে নিলে।

বাড়ি এসে দেখে বাক্স ভরা মোহর! যত তোলে, ফুরায় না, বাক্স ভর্ত্তিই থাকে!

পাখীর বাসা থেকে বুড়োবুড়ি বাক্স বন্দী মোহর এনেছে এই কথা যখন ধোপানী শুনলে, তখন তার ভারি হিংসা হল। সে তখনি বুড়ির কাছে গেল, গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁগা পাখীর বাসাটা কোথা?"

বুড়ি বল্লে, "ঐ বনের ভিতর উত্তর মুখে বরাবর গিয়ে ডান হাতি!"

ধোপানী তখনই চল্লো। গিয়ে গিয়ে পাখীর বাসায় হাজির! যেমন তাকে দেখা, অমনি পাখীরা উড়ে গিয়ে একেবারে গাছের আগডালে বসল। ধোপানী যত বলে, নেমে আয়, নেমে আয়, কেউ সে কথা শোনে না। ধান ছড়ালে, চাল ছড়ালে, তবুও একটাও পাখী নেমে এল না। ধোপানী তখন বিনিয়ে বিনিয়ে কত কথা বলতে লাগলো। বল্লে "বাছা, রাগের মাথায় একটা কাজ করে ফেলেছি, তার কি ক্ষমা নেই! আহা! বাছার ঠোঁটে কতই লেগেছে! আমি হতভাগী পোড়া রাগ আমায় খেলে। এস বাছা, তোমার ঠোঁটে একটু হাত বুলিয়ে দি, এস তোমার ঠোঁটে ওষুধ লাগিয়ে দি, আহা বাছা আমার কত কষ্ট পাচ্ছে!"

ধোপানীর কথায় পাখীর মন গলে গেল। সে আগ ডাল থেকে নেমে এসে ধোপানীকে বসালে, খেতে দিলে। ধোপানী ভাল করে পাখীকে কত আদর করলে। তার পর ফিরে যাবার সময় তাকে বল্লে, "আমায় কিছু দেবে না?"

পাখী বল্লে, "চল দিচ্ছি!"

এই বলে তাকে সেই বনের মধ্যে সেই বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে বল্লে "এই এত তোরঙ্গ আছে, যেটা খুসি নাও!"

ধোপানী বেছে বেছে একটা প্রকাণ্ড ভারি দেখে তোরঙ্গ তুলে নিলে। মনে ভাবলে, এত বড় তোরঙ্গটার ভিতর অনেক জিনিস পাবো।

মাথায় করে বয়ে ধোপানী অনেক কষ্টে সেই ভারি তোরঙ্গ বাড়ি নিয়ে এল। যেমন তার ডালা খোলা অমনি বড় বড় বিকটাকার কতকগুলো দৈত্য লাফিয়ে তার ভিতর থেকে বেড়িয়ে পড়ল। ধোপানীর চুলের মুঠি ধরে তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে আর কি এমন সময় বুড়োবুড়ি ধোপানীর বাড়ি এসে হাজির। তাদের দেখে দৈত্যগুলো সুড়্ সুড়্ করে তোরঙ্গের ভিতর ঢুকে পড়ল! বুড়োবুড়ি ডালা বন্ধ করে দিলে। ধোপানীর প্রাণ বাঁচল, সেই সঙ্গে ঘাড় থেকে তার রাগও নেমে গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আভাস।

এমন সুন্দর, শোভার সাগর,
সুজলা সুফলা ধরা,
এমন সুন্দর, আকাশ ভূধর,
অনন্ত মহিমা ভরা;
রবি শশী তারা, নির্ঝরের ধারা,
লতাপাতা ফলফুল,
দূর পারাবার, প্রশান্ত উদার,
জীব জন্তু নরকুল;
উষার মাধুরী, জ্যোৎস্না লহরী,
বিহঙ্গের কলস্বন,
গোধূলির ঘটা, পূর্ণিমার ছটা,
অপরূপ দরশন;
এ সব গৌরব, কাহাতে সম্ভব,
ভগবান বই আর।
সবে সমস্বরে, তাঁরি নাম ক'রে,
ডাকে তাঁরে অনিবার।
জগৎ জুড়িয়া, উঠিছে কাঁপিয়া,
তাঁহার অতুল নাম;
জয় জয় রবে, জীব জন্তু সবে,
বন্দে তাঁরে অবিরাম!

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল,

১। ঘুম।

২। প্রদীপ।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী, N. N. Dey, Esqr., T.W. Ahmad, Esqr. শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতুষাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবনীকান্ত বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী, শ্রীসুধা শর্ম্মা, শ্রীমতী রাণীমায়া, দেবী।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীপঞ্চানন সিংহ রায়, ফজল করিম চৌধুরী, শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ, Students of the 5th class, Jamirta H. E. School, শ্রীমতী লীলাবতী দেবী, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, শ্রীনলিনকুমার বসু, শ্রীভূপতিকান্ত মজুমদার, শ্রীগিরীন্দ্রকুমার দাস, শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র নাথ, শ্রীতছিমঅদ্দিন আহাম্মদ, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীমহম্মদ হানিফ মিঞা, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুনারায়ণ মুন্সি, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীমন্মথমথন সরকার, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীতরুলতা দাস, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমতী সুপ্রভা দেবী।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল প্রেরিত।)

১। "চারি আনা সের চিনি বাজারে বিকায়,
দুই আনা সের চিড়া সবে কিনে খায়।
বড়ই সুলভ দধি সেই বাজারের,
একটী পয়সায় তথা মিলে একসের।
লইয়া আড়াই আনা তুমি যদি যাও
আর যদি চিনি চিড়া দধি ল'তে চাও;
সবে মিলি দশ পোয়া কেমনে কিনিবে?
ইহার হিসাব দিলে বুদ্ধিমান হবে॥

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী প্রেরিত।)

২। অপরূপ জীব সনে পথে দেখা হ'ল
বাম ভাগে দুগ্ধ মিলে দক্ষিণে গরল।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।